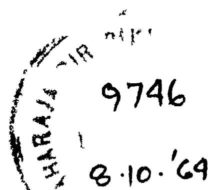
নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

[রাহুল সাংকৃত্যায়ন]

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১১০০ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৮৮৬ শকাব্দ

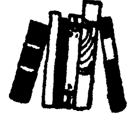
প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ,
১৮৮০ শকাব্দ

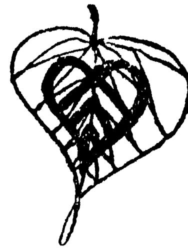
ছয় টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬







ভূমিকা

"নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর" রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের প্রথম তিব্বত যাত্রার বিবরণী। ইহার হিন্দী হইতে অনুবাদ প্রথমে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সময় মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের কোনরূপ পরিচিতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার পন্দহাগ্রামে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, সরযূপারীণ ব্রাহ্মণকুলের সাংকৃত্যায়ন বংশের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম হয় মাতামহের গৃহে এবং বাল্যকালও সেইখানেই অতিবাহিত হয়। ইঁহার পিতার নাম গোবর্ধন পাণ্ডে এবং মাতামহের নাম রামশরণ পাঠক। মাতামহ যৌবনকালে বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, এবং গ্রাম হইতে সুদূর হায়দরাবাদ যাইয়া সেখানকার সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিলেন। সেখানে দশ-বার বৎসর কাজ করার পর পল্টন ছাড়িয়া দেশে ফিবিলে পরে রাহুলের মাতা কুলবন্তী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহের ঐ বলিষ্ঠ দেহমনের পূর্ণ উত্তরাধিকার দৌহিত্র রাহুল যে পাইয়াছেন তাহার পরিচয় আমরা পাই, তাঁহার বিচিত্র-ঘটনাবহুল ও অদম্য উদ্যোগপূর্ণ জীবনযাত্রার নানা অধ্যায়ে। তাহার পরিচয় পাঠক এই পুস্তকের মধ্যেই পাইবেন। বস্তুতঃ রাহুলের "জীবন-যাত্রা" নামক আত্মচরিত বহু আশ্চর্য কাহিনীতে পূর্ণ।

ষোল বৎসর বয়সে তিনি বেনারসে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য গিয়াছিলেন। বিশ বৎসর বয়স কালে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক মোহন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মোহন্তের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার এই বিদ্যার্জনে পরম উৎসাহী ও সংসারে বীতরাগ শিষ্য তাঁহার পর ছাপরা জেলার (বিহার) পরসা মঠের মোহন্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবে এবং তাঁহার সেই ইচ্ছা রাহুল তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরেও বহুদিন ছিল। শিষ্যত্ব লইবার পরে রাহুলের নাম রামউদার দাস, অথবা সংক্ষেপে রামউদার, রাখা হয়। বিহার প্রান্তের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার এইভাবে আরম্ভ হয়, যাহার পরিণতিতে পাটনার মিউজিয়ম ও গবেষণাকেন্দ্র অমূল্যগ্রন্থ ও চিত্রাবলীতে পূর্ণ হইয়াছে। পরসায় কিছুদিন থাকার পর তাঁহার আবার দেশে যাওয়া এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন হয়। নানা প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া বিদ্যার্জনের প্রয়াস চলিতে থাকে যাহার সম্পর্কে পরসা ছাড়িয়া বহুস্থলে ঘুরিতেও হয়। সেই সঙ্গে নানা

ধর্মমতের সহিত পরিচয় ও তীর্থপর্যটন এসবও চলিতে থাকে। ভারতের নানা অঞ্চলে ঘুরিবার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে রাওলাট এক্টের প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন, পঞ্জাবে মর্শাল ল-এর প্রবর্তন ও অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড হইয়া যায়। এই সকলের পরে সত্যাগ্রহের যে দেশব্যাপী আন্দোলন চলে, তাহাতে অংশ লইবার জন্য তিনি বিহারে তাহার প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। সত্যাগ্রহের ফলে বক্সার জেলে তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন। কারামুক্ত হইবার পরও তিনি কংগ্রেসের কার্যক্রম চালাইতে থাকেন। ঐ সময়ে পাটনায় এক বক্তৃতা দেওয়ার ফলে তাঁহাকে পুনর্বার কারাবাস করিতে হয়। এইভাবে তাঁহার রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রের সহিত পরিচয় ও সম্বন্ধ হয়।

কিছুদিন পরে তাঁহার এই প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রমের উপর আস্থা চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে অন্যরূপ সংকল্পও মনে আসে যাহার ফলে ১৯২৭ সালে তিনি সংস্কৃত শিক্ষকরূপে সিংহল যাত্রা করেন। ইতিপূর্বেই মাদ্রাজের নানা কেন্দ্রে বৈষ্ণব আগমআদি শিক্ষা, সংস্কৃতে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আর্য সমাজেব জাতীয়তাবাদের সহিত পরিচয় হওয়ার ফলে তাঁহার অন্তরে দেশাত্মবাদ ও দার্শনিক চর্চাব স্পৃহা প্রবল হয়। সিংহলের প্রসিদ্ধ বিদ্যালঙ্কার বিহারে তিনি ত্রিপিটক (বৌদ্ধশাস্ত্রাবলী) পূর্ণরূপে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেন। তাহার পরই তিনি স্থির করেন যে বৌদ্ধধর্মেই তাঁহার পথ আছে। সেই সংকল্পের বশে তিনি তিব্বতে প্রথমবার গিয়া ফিরিবার পর রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই প্রথম তিব্বত যাত্রার বিবরণই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মহাপণ্ডিত পদবী কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী প্রদত্ত এবং উহা সর্বতোভাবে যথার্থ। তিনি বহুভাষাবিদ্। হিন্দী, উর্দু, বাংলা, পালি, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও ইংরাজীতে তিনি দক্ষ, তিব্বতী ও অন্য ঐ গোষ্ঠীর ভাষায় তাঁহার অধিকার অসামান্য। রুশ ভাষাও তাঁহার আয়ত্ত। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছডাইয়া গিয়াছে। তিব্বতী প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদের আবিষ্কার তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা জগৎবিখ্যাত।

প্রথমবারের তিব্বত যাত্রায় তিনি বাইশটি অশ্বতর বোঝাই তিব্বতী পুঁথি, চিত্রাবলী ইত্যাদি আনয়ন করেন। দ্বিতীয়বারের (১৯৩৪) যাত্রায় তিনি চল্লিশখণ্ড প্রামাণ্য পুস্তকাদিও আনয়ন করেন। তৃতীয়বারে (১৯৩৫-৩৬) তিনি তিব্বতের শাক্য, ঞোর এবং শালু বিহারে ১৫৬টি নূতন গ্রন্থের আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার তাঁহাকে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তিমান করিয়াছে। যে সকল অমূল্য

গ্রন্থরাজি তাঁহার এই সাহস ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে আমরা পাইয়াছি তাহার পরিচয় দেওয়া ও একটি বড় প্রবন্ধের কমে হয় না।

তিব্বত দেশের যে বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে তাহা ২৭ বৎসর পূর্ব্বেকার। তাহার পর ঐ দেশে বহু পরিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছে, যেমন উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে দুই মোটরবাহী রাজপথে উহার চীনরাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যে তিব্বতের পরিচয় পাঠক এই পুস্তকে পাইবেন, মূলতঃ তাহার জনগণের পরিবর্তন অন্ততঃ সমাজ ও লোকাচার হিসাবে, এখনও খুব বেশী অগ্রসর হয় নাই। দেশে বিংশ-শতাব্দীর বায়ু চলাচলের জন্য জানালা খোলা হইয়াছে। তবে এতদিন উহা সর্ব্বতোভাবে "নিষিদ্ধ দেশ"—অর্থাৎ অচলায়তন ছিল, সম্প্রতি সেখানে কিছু বাহিরের সাড়া পৌঁছাইয়াছে মাত্র।

কলিকাতা
৩৮. ৩. ৫৮.

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

উদ্যোগ পর্ব্ব

১৯২৬ সালে আমি কাশ্মীর হইতে লদাখ যাত্রা করি। ফিরিবার পথে দলাই লামার ডংরী-খোর্স্তম প্রদেশে কিছুদিন ছিলাম, কিন্তু কয়েকটি কারণে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৭-২৮ সাল আমার সিংহলপ্রবাসে কাটে। সেই সময় আমি পুনর্ব্বার তিব্বত যাওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করি। আমি দেখিলাম যে, ভারতের অতীত যুগের দার্শনিকদের অনেক গ্রন্থের অনুবাদ এবং বৌদ্ধ-ভারতের ধর্ম্ম ও ইতিহাসের অনেক বহুমূল্য সামগ্রী তিব্বতে গেলে আমি পাইতে পারি। ফলে, আমি পালি বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করিবার পর তিব্বত যাত্রা করা স্থির করিলাম।

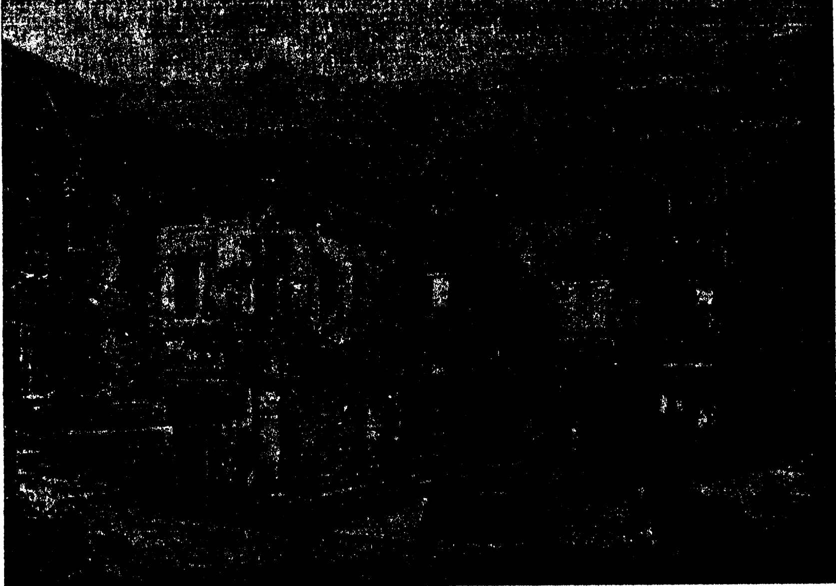
সিংহলের কার্য্য শেষ হইলে ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর আমার যাত্রারম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব হইতেই পথ ও উপায়ের কথা আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। জানা ছিল যে সোজা-পথে ব্রিটিশ সীমানা পার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। পাস্‌পোর্টের ঝঞ্ঝাট ও কর্ত্তাদের কৃপার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা আমার সহ্য হইবে না। ঐ কারণে কালিম্পং-লাসার (লহাসা) সোজা পথ ছাড়িয়া—কেন-না ঐ পথে গ্যাংচী পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রখর দৃষ্টির আড়াল হইবার উপায় নাই—নেপালের পথে যাওয়া স্থির করিলাম। নেপাল প্রবেশও সোজা নহে, কেন-না নেপাল রাজসরকার ব্রিটিশ প্রজা মাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন। ভোটিয়া (তিব্বতী) দিগেরও ঐ অবস্থা। সুতরাং আমার কার্য্যোদ্ধার-পথে তিনটি গভর্ণমেণ্টের চোখে ধূলা দেওয়া নিতান্তই দরকার হইয়া পড়িল। অস্তু। যাত্রা-প্রকরণ আয়ত্ত করার জন্য শ্রীযুক্ত কাওয়াগুচি (জাপানী শ্রমণ) এবং মাদাম নীল—এই দুজনের পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ভোটিয়াদিগের আচার-ব্যবহার বাদে পথের পরিচয় বিশেষ কিছু পাই নাই। শেষে নেপাল-কাঠমাণ্ডু হইতে তিব্বতে যাইবার পথ ভারতীয় সরকারী সার্ভে ম্যাপ হইতে লিখিয়া লইলাম। ম্যাপ-নক্সা ইত্যাদি সন্দেহজনক বস্তু সঙ্গে রাখাও বিপজ্জনক। ঠিক করিলাম, নেপাল প্রবেশের পক্ষে শিবরাত্রিই শ্রেষ্ঠ কাল। পূর্ব্বে, ১৯২৩ সালের শিবরাত্রিতে, আমি নেপাল গিয়াছিলাম এবং দেড় মাস সেখানে ছিলাম। আমি দেখিলাম, এখনও শিবরাত্রির তিন মাস বাকী। সুতরাং স্থির করিলাম যে, ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বৌদ্ধ-তীর্থ এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিব।

কলম্বো হইতে ট্রেনে তলেমন্নার আসিলাম। এখানে ষ্টীমার-ঘাট। সিংহল হইতে ভারত মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। তাহাও কয়েক মিনিট মাত্র 'অকূল পাথার', তাহার পরেই তট দৃষ্টিগোচর হয়। ধনুষ্কোডীতে নামিয়া কাষ্টম-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমার প্রায় পাঁচ মণ পুস্তক—অধিকাংশই ত্রিপিটক ও তাহার 'অট্টকথা', অর্থাৎ ভাষ্য—উদ্ধার করিয়া রেলযোগে পাটনা রওয়ানা করিলাম। তাহার পর মাদুরা, শ্রীরঙ্গম ও পুনা দেখিয়া কার্লে পৌছিলাম। কার্লে গিরিগুহা মলবাড়ী ষ্টেশন হইতে প্রায় আড়াই মাইল মোটরের পথ। পর্ব্বত-দেহ কাটিয়া গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছে। চৈত্যশালা বিশাল ও সুন্দর। শেষের দিকে প্রস্তর কাটিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। চৈত্যশালার বিশাল স্তম্ভগুলিতে কোথাও কোথাও নির্ম্মাণকারীদিগের নাম খোদিত আছে। চৈত্যাগারের পাশে ভিক্ষুদিগের থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষও আছে। উপরে সুন্দর জলাশয়। এই সবই আধ মাইল চড়াইপথের মধ্যে।

কার্লে হইতে নাসিক গেলাম। এই স্থানের আশেপাশে অনেক লেনি (গুম্ফা) আছে। সেগুলি দেখা সম্ভব নয়, এই ভাবিয়া ১২ই ডিসেম্বর পাঁচ মাইল দূরস্থিত পাণ্ডব গুম্ফা দেখিতে গেলাম। এখানে কার্লের মত অতটা চড়াই নাই। গুম্ফাপার্শ্বে অসংখ্য মহাযান দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বড় চৈত্যশালায় বিশাল বুদ্ধ-প্রতিমা আছে। অন্য এক চৈত্যশালার চৈত্য কাটিয়া ব্রাহ্মণ্য দেবতার প্রতিমা রচনা করা হইয়াছে। শিলা-লিপিতে ব্রাহ্মণ ভক্ত শক রাজকুমার উষবদাত এবং তাঁহার কুটুম্বিনীর লেখও আছে। এই শকবংশই খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে নিজ দেশ শকস্থান (সীস্তান) হইতে আসিয়া সিন্ধু-গুজরাত প্রদেশ এবং তথা হইতে উজ্জয়িনী ও মহারাষ্ট্র অধিকার করেন। উজ্জয়িনীর শকরাজ নহপান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নৃপতি। উষবদাত ইঁহারই জামাতা। পৈঠনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি খ্রীঃ পূঃ ৫৩ সালে নহপান বা তাঁহার কোনও বংশজকে সংহার করিয়া উজ্জয়িনী উদ্ধার করেন। এই গৌতমীপুত্র সাতকর্ণিই বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ।

নাসিক হইতে আমার বেরূল যাইবার ইচ্ছা ছিল। বেরূল এখন "এলোরা" রূপ বিকৃত নামেই পরিচিত। ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেশনে নামিবামাত্রই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিবামাত্রই পুলিসের সামনে হাজির হইতে হইল। নাম বলিতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না, সেখানে পুলিস সিপাই অপমানসূচক ভাষায় বাপ-আদির নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি কিছু বলিতে অস্বীকার করিলাম। ফলে, আমাকে টানিয়া প্রথমে থানায় পরে তহশীলদারের কাছে লইয়া হয়রান করা হইল। হায়দরাবাদের নবাবের উচিত বাহিরের লোকের জন্য পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা। যাহা হউক, তহশীলদার মহাশয় ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি, মান্দ্রাজ-গভর্ণরের ঐদিনে

বেরুল দর্শন এইরূপ ব্যবহারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমায় ছুটি দিলেন। পরদিন মোটরযোগে নয়টার সময় বেরুলে পৌছিলাম। ঐ মোটর-বাসে এক আমেরিকান সঙ্গী হইলেন। পথে বুঝিলাম ইনিও আমারই অবস্থাপ্রাপ্ত। শ্রীযুক্ত সুথর (ইঁহার নাম) ওহায়ো ওয়েস্‌লীয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের (আমেরিকা) ধর্ম্মপ্রচার বিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি অঙ্কোরবাট-আদির ভারতীয় ভব্য প্রাচীন বিভূতিসকল দর্শন করিয়া ভারতে আসিয়াছেন। ইঁহার হৃদয় মানবোচিত সহানুভূতিপূর্ণ।



কৈলাস (এলোরা)

আমরা কৈলাস মন্দির হইতে দর্শন আরম্ভ করিলাম। এক বিশাল শিবালয় —অঙ্গন, দ্বার, কক্ষ, আগার, হস্তিবাহন, নানা মূর্ত্তি, চিত্র ইত্যাদি সমস্তই— মহাপর্ব্বতগাত্র ছেদন করিয়া নির্ম্মিত ও গঠিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমেরিকান মিত্র বলিলেন, "ইহার সম্মুখে অঙ্কোরবাট দাঁড়াইবার উপযুক্ত নহে। ইহা অতীত ভারতের সম্পত্তি; দৃঢ় মনোবল, হস্তকৌশল, সকলেরই সজীব স্বরূপ-পরিচায়ক।"

বেরুলে ডাকবাংলা বা দোকান-পাট কিছুই নাই। গুহার নিকটে পুলিস চৌকী আছে। পুলিস সিপাহীরা মুসলমান এবং অতি সৎলোক। বলিবামাত্র যথাসাধ্য যাত্রীদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত। এই সজ্জনদিগের প্রদত্ত রুটি ও কৈলাসগুহার

ঝরণার জলে আমাদের প্রাতরাশ সম্পন্ন হইল। তাহার পর বৌদ্ধগুহার অংশ ধরিয়া সমস্ত দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কৈলাসের বাম ভাগে বারোটি বৌদ্ধগুহা। পরে ব্রাহ্মণগুহাবলী আছে, তাহার মধ্যস্থলে কৈলাস। অন্তর্দ্দেশে চারিটি জৈনগুহা আছে। বস্তুতঃ এই সকল গুহাকে পর্ব্বতে কর্ত্তিত প্রাসাদরাজি বলা উচিত। আমাদের সৌভাগ্য, পূর্ব্বদিন মান্দ্রাজের গভর্নর আসায় গুহাবলী পরিষ্কার করা হইয়াছিল। [illegible] চামচিকার দুর্গন্ধ হই[illegible]ার পাইয়াছিলাম।



রামেশ্বর (এলোরা)

সূর্য্য অস্ত গেল। আমরা তখন শেষ জৈনগুহা দর্শন সমাপ্ত করিয়াছি। ফিরিবার সময় আমার মনে কেবলই আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের কথা মনে আসিতেছিল যাঁহারা এইরূপে পর্ব্বত কাটিয়া নিজেদের শ্রদ্ধা ও কীর্ত্তির অক্ষয় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের বিচিত্র রূপকলাকৌশল, বহুশতাব্দীব্যাপী অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, কৃতিত্ব ও হৃদয়ের শক্তির পরিচায়ক এই নিদর্শন সত্যই কি অপূর্ব্ব নহে?

১৪ই ডিসেম্বর আমরা দুই জনে ঐ পুলিসদের দেওয়া চারপায়ায় বিশ্রাম করিলাম। সত্যই এই সজ্জন সিপাহীরা না থাকিলে এইরূপ মনুষ্যবসতিবিহীন গহনে যাত্রীদিগের অনেক কষ্ট হইত। রাত্রে ইহাদের গরম গরম রুটিতে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ হইল। সূথর মহাশয় ভাগ্যবান্, তাঁহার জন্য গরম চা-ও জুটিয়া গেল।

১৫ই ডিসেম্বর আমরা পদব্রজে দৌলতাবাদ চলিলাম। পথে খুল্‌দাবাদে সম্রাট ঔরংজেবের সমাধি দেখিলাম। ইহার সম্মুখে পীর জৈনুদ্দিনের কবর রহিয়াছে। দেবগিরির (দৌলতাবাদ) সুদূরবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, একান্তে দণ্ডায়মান শৈলসানুদেশে স্থিত বহু সরোবর, দ্বার, প্রাকার, গোলক-ধাঁধা, জলাশয়, মন্দির-ধ্বংসাংশ, মিনার-গম্বুজ-বিশ্রামাগার যুক্ত বিকট দুর্গ এখনও মানুষের মনে বিস্ময় আনয়ন করে। এই দেবগিরিবাসীদিগের শ্রদ্ধা-বিভূতির অক্ষয় স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপর্যুক্ত কৈলাস ও অন্যান্য গুহামন্দির এখনও বর্ত্তমান। সে সকল দেখিলেও হৃদয় গর্ব্বে স্ফীত হয়। কি করিয়া ইহার অধিস্বামী পরাজিত হইতে পারিলেন তাহা চিন্তার অতীত; পরাজিত কিন্তু সত্যই যে হইয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

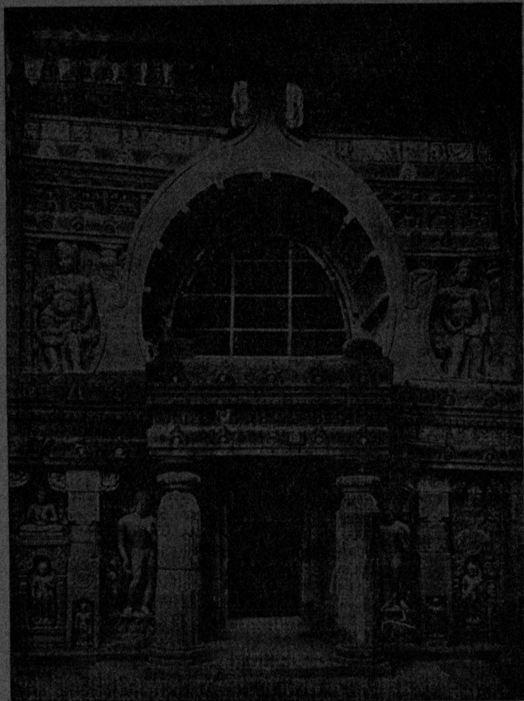
তৃতীয় প্রহরে আমরা ঔরঙ্গাবাদ অভিমুখে চলিলাম। সুথর মহাশয় আগেই ডাকবাংলায় থাকবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরদিন আমিও অজণ্টা যাইব, সুতরাং আমার জিনিষপত্রও ঐখানেই আনিলাম।

শুনিয়াছিলাম ফর্দ্দাপুরের বাস্ সকালেই ছাড়ে। কার্য্যকালে বেলা নয়টায় ছাড়িল। নিজাম-সরকার সমস্ত বাসের ঠিকা একজনকে মাত্র দেওয়ায় যাত্রীদের সময় অর্থ ইত্যাদি সব দিকেই লোকসান হইতেছে। আমরা কোনপ্রকারে ফর্দ্দাপুরের ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম। গভর্নর-বাহাদুর তখন অজণ্টা দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, শুধু তাঁবু ও অন্য লট্‌বহর পড়িয়া আছে।

খাওয়ার পাট সাঙ্গ করিয়া আমরা অজণ্টার দিকে ছুটিলাম। প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বহু দিনের অভিলাষ পূর্ণ হইল। বিভিন্ন কালে নির্ম্মিত নানা গুহার অভ্যন্তরে অতি সুন্দর চিত্রপ্রতিমা, কক্ষশালাবিন্যাস ইত্যাদি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলাম। নির্জ্জন স্থানে জলের সান্নিধ্য, পর্ব্বতের শ্যামশোভা। অজণ্টার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও এইরূপ অনুপম। ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই "বন্ধ হইবার সময় হইয়াছে" ঘোষণা শুনিলাম, কোন প্রকারে দেখা শেষ করিতে হইল।

ফিরিবার পথে সুথর মহাশয় প্রাচীন কীর্ত্তির কথাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের অবস্থারও চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তিনি বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত অবসন্ন ভাবের উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম, "উদ্দেশ্যের কথায় বলা যাইতে পারে, আমাদের উদ্দেশ্য তাহাই যাহা উদীয়মান জাতির হওয়া উচিত এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে বাধাবিঘ্ন ঘটিলেও জাতির উদ্দিষ্ট পথে অগ্রগতি অনিবার্য্য। চিত্তবিক্ষেপ ও মানসিক অবসাদ আমাদের বিশেষ দুর্ব্বলতার

পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। জাতীয়তা ও ধর্ম্ম দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। একের প্রভাব অন্যের উপর আসেই এবং তাহা অনুচিতও নহে। তথাপি যদি কোন ধর্ম্ম কোন জাতির সুদূর অতীত হইতে আবহমান জাতীয়তা ও সংস্কৃতির প্রবাহকে স্থানচ্যুত করিয়া সেই স্থানে অন্য কিছু স্থাপন করিতে চাহে, তবে বলিতে হইবেই যে উহা তাহার পক্ষে বিশেষ ধৃষ্টতা ও একান্ত অস্বাভাবিক কার্য্য। হিন্দুস্থানে ইস্‌লাম এই ভুল করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টান-দিগেরও অনেকেই করিতেছেন।" সূথর মহাশয় বলিলেন, "আমরাও ইহা পছন্দ করি না।"



অজণ্টা (১৯নং গুহা)

আমি বলিলাম, "ছুৎমার্গ'ও আগের মত কোথায়? যাহা আছে তাহাই বা কয়দিনের জন্য? তবে কেন হিন্দুস্থানী নাম, হিন্দুস্থানী বেশ, হিন্দুস্থানী ভাষা ও সংস্কৃতি রাখিয়া সাচ্চা খ্রীষ্টান হওয়া যায় না? আমি অবশ্য স্বীকার করি যে, অধিকাংশ আমেরিকান পাদরীও ঐরূপ জাতিভ্রষ্ট হওয়া পছন্দ করেন না।"

তিনি বলিলেন, "এই বার আমাদের যাবতীয় ভারতীয় মিশনে সাক্ষাৎভাবে এই বিষয়ের আলোচনা অবশ্যই করিব।"

আমি বলিলাম, "যদি এই প্রকারে ভারতীয় মুসলমানেরাও ঐ পন্থা ধরিতেন তবে বিচ্ছেদ ঘটিত না। তবে সে সময়ও দূর নহে যখন এ সকল ভুলভ্রান্তি তিরোহিত হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সন্দেহ নাই।"

১৭ই ডিসেম্বর আমি প্রথমে গো-যানে পরে মোটর বাসে ফর্দ্দাপুর হইতে জলগাঁও আসিয়া সেইদিনই সাঁচী রওয়ানা হইলাম। শ্রীযুক্ত সূথর পরদিন আসিবেন স্থির করিলেন।

প্রত্যুষে সাঁচী পোঁছিলাম। মনে হইল এই সেই স্থান যেখানে মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চিরপ্রস্থান করিবার পূর্ব্বে কত দিন ছিলেন। এই সেই স্থান যেখানে বুদ্ধদেবের শুদ্ধতম ধর্ম্ম (স্থবিরবাদ) মগধ ছাড়িয়া বহু শতাব্দী বর্ত্তমান ছিল। সেই সময় মহান্ সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়ন—তথাগতের এই তুই প্রধান শিষ্যের দেহাস্থি বিশাল ও সুন্দর স্তূপের মধ্যে রাখা হইয়াছিল ; ইহা এখন লণ্ডন মিউজিয়ম হইতে ভারতে আনা হইয়াছে।

সাঁচী স্তূপ মুগ্ধ হইয়া দেখিলাম। ভুপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়াও বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ১৯ হইতে ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত কোঁচ-এ এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে থাকিলাম। “দশার্ণ” দেশ শুষ্ক হইলেও এখনও কত মধুর !



দৌলতাবাদ (তুর্গ প্রাকার ও চাঁদ মিনার)

আমাকে শিবরাত্রির পূর্ব্বেই মধ্যদেশের (কুরুক্ষেত্র হইতে বিহার প্রদেশ অঞ্চলের প্রাচীন নাম) বুদ্ধচরণ পরিপূত বহুস্থান আবার দর্শন করিতে হইবে। এই ভাবিয়া ২৭শে ডিসেম্বর আমি ফের বাবা রামউদারের “কালী কমলী” পড়িলাম। সঙ্গে একটি ছোট ঝোলা এবং ভিক্ষু আনন্দের সিংহল ফেরত বাল্তি। ২৭শে তারিখেই কনৌজ পোঁছিলাম। ‘বে-ঘর’ কখনও ঘরের চিন্তা করে? এক্কাওয়ালাকে বলিলাম, শহর হইতে বেশী দূর না হয় এমন কোন বাগানে পৌঁছাইয়া দাও। ছোট বাগানও পাওয়া গেল, সেখানকার পূজারী মহাশয় অকিঞ্চন সাধুর উপযুক্ত স্থান

নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দুই বৎসর পরে* শীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু সে সাক্ষাৎ মধুর লাগিল না।

কনৌজ? নূতন কনৌজ তো গোলাপজল না ছিটাইয়াই 'সুগন্ধে' ভরপূর! তবে আমি তো মৃতের ভক্ত † সুতরাং ইহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না। ২৮শে অল্প কিছু জলপান করিয়াই স্তূপের ধূলারাশি ঘাঁটিতে চলিলাম। এমনই তো দেশব্যাপী দারিদ্র্যের পীড়ন, প্রাচীন নগরগুলির ভাগ্য যেন ততোধিক ক্লিষ্ট। কত শতাব্দী ধরিয়া পতন আরম্ভ হইয়াছে, জানি না আরও কতদূর পড়িবে। বিশেষতঃ শ্রমজীবীদের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত। আমি চামার শ্রেণীর একজনকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গী করিলাম। সারাদিন ঘুরিবার মজুরী চার আনা—সে তাহাই যথেষ্ট ভাবিল।

কনৌজ কি একদিনে দেখা চলে, না তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের মধ্যে লেখা সম্ভব? কনৌজ বর্ণনার মুখবন্ধই এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপযুক্ত। আমি অজয়পাল, রৌজা, টিলামুহল্লা, জামামস্‌জিদ (সীতা রসোই), বড়াপীর, ক্ষেমকলাদেবী, মখদুম-জহানিয়া, কালেশ্বর মহাদেব, ফুলমতী দেবী ও মকরন্দনগর, এই পর্য্যন্ত কোনক্রমে দেখিলাম। সর্ব্বত্রই পুরাতন বস্তুর ভগ্নাবশেষের ছড়াছড়ি, অর্দ্ধসত্য কাহিনীর প্রচার, পুরাতন, সুন্দর কিন্তু খণ্ডিত-ছেদিত মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য, এ সকলই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভব্য কান্যকুব্জের ক্ষীণ ছায়া দেখাইতেছিল। ফুলমতী দেবীর তো চারিধারে বুদ্ধ-প্রতিমার আধিক্য দেখিলাম।

লোকটিকে চার আনা পয়সা দিলাম, সে আপনার প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে কিছু প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিল, তাহারও দাম দিলাম। ফিরিবার জন্য একা খুঁজিলাম, কিন্তু সেখানে ভাগ্য অপ্রসন্ন। কাছেই কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আসুন শাহ্‌ সাহেব ‡, কোথা হইতে আগমন করিলেন?"

আমি বলিলাম, "ভাই, যাহারা দুনিয়ার ধূলা ঘাঁটিয়া বেড়ায় তাহাদের কি এ প্রশ্ন করা চলে?"

"জুমার নমাজ কি জামামস্‌জিদে সম্পন্ন করিলেন? পান গ্রহণ করুন।"

"ধন্যবাদ। পান খাওয়া অভ্যাস নাই, ফরূরুখাবাদ (=ফরক্কাবাদ) যাইতে হইবে।"

---

* সিংহলে দুই বৎসর শীতভোগ হয় নাই।

† অর্থাৎ অতীতস্মৃতির।

‡ ভদ্র মুসলমান উচ্চশ্রেণীর ফকিরকে শাহ্‌ বলিয়া সম্বোধন করেন।



সাঁচী (বৌদ্ধস্তূপ)

ইঁহারা আমার লম্বা কালো আলখাল্লা দেখিয়াই এই ভ্রম করিলেন। ভ্রম কেন বলি, সনাতনী হিন্দুও তো আমাকে নাস্তিকই বলেন। যাহা হউক, অন্য প্রশ্ন এড়াইয়া চম্পট দিলাম। ষ্টেশনের কাছে লরীতে চড়িয়া কনৌজ হইতে পাঁচটার সময় বিদায় লইলাম।

পথে 'পুনীত পঞ্চালে'র সবুজ ক্ষেত, আমের বাগান, গ্রামের হাট, কৃশ শরীর জীর্ণবস্ত্র ভবিষ্যতের আশারূপ গ্রাম্য ছাত্রদল, এমনই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ফর‍্রুখাবাদে গাড়ী বদল করিয়া ফতেগড়ের গাড়িতে ঐ দিনই মোটা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রে ষ্টেশনেই মুক্ত বাতাসের সঙ্গে প্রচণ্ড শীতের আনন্দে দেহমন পুলকিত হইল! অদ্য, সকালে সংকিসা-বসন্তপুরের পথ ধরিলাম।

২৯শে ডিসেম্বর প্রত্যূষেই কালী নদীর নৌকা আমাদের পার করিয়া দিল। ক্ষেতের মাঠে ঘুরিয়া-ফিরিয়া, ভুলভ্রান্তি করিয়া কোন প্রকারে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিসারী দেবীর কাছে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, অতীত-ভারতগৌরব সম্রাট অশোকের অক্ষয়কীর্ত্তিরূপ স্তম্ভরাজির মধ্যে একটির শিখর-হস্তীর পাশেই কয়েকটি মলিনবেশ ভারতসন্তান রৌদ্র সেবন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে পুষ্করগিরি আমাকে পরিচিত বন্ধুর মত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। মুখ হাত ধুইবার পর প্রাচীন অশোকস্তূপ-অধিকারিণী অজ্ঞাতনামা বিসারী দেবীকে দর্শন করিলাম। পুষ্করগিরি ভোজনের আয়োজন আরম্ভ করিলেন, আমি সংকিসগড দেখিতে চলিলাম। পাঞ্চাল-দিগের প্রাচীন মহানগর সাংকাশ্যেব ধ্বংসাবশেষও মহান্। গ্রামের অধিকাংশ ঘরই পুরাতন ইটের তৈয়ারী। শুনিলাম, অতিগভীর কূপ খননকালে এখনও বহুদূর পর্যন্ত কাঠের বিশাল তক্তা পাওয়া যায়। পাওয়াই সম্ভব, কেননা এককালে দুর্গ, প্রাসাদ, চত্বর সবই কাষ্ঠময় হইত। সংকিসা ফর‍্রুখাবাদ জেলায়, নিকটেই এটায় সরাই-অহাগত আছে। সেখানে এখনও বহু জৈন (সরাবগী) পরিবার বাস করে। সেখানে কিছুদিন পূর্ব্বের পুরাতন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। সংকিসা প্রাচীন নগরের উচ্চ ভিটার উপর স্থাপিত বসতি।

ঐদিন সন্ধ্যায় পুষ্করগিরির প্রস্তুত সুমধুর ভোজন গ্রহণ করিয়া তিন জেলার প্রান্ত ঘুরিয়া মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত মোটায় পৌঁছিলাম।

এখন আমার উদ্দেশ্য ছিল কুরুকুলদীপের অন্তিম শিখা বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী কৌশাম্বী দর্শন। মোটা হইতে রাত্রে শিকোহাবাদের ট্রেনে রওয়ানা হইয়া সকালে ভরওয়ারী পৌঁছিলাম। নামিবামাত্র মুখ হাত ধুইয়া উদর-পূজার ব্যবস্থা করিলাম। আমার পভোসা হইয়া কৌশাম্বী যাইবার ইচ্ছা ছিল। শুনিলাম করারী পর্য্যন্ত এক্কায় যাওয়া যায়, পরে পদব্রজেই উপায়। এক্কা যোগাড় করা হইল। পথ কাঁচা

কিন্তু একার ঘোড়া সতেজ, সুতরাং নয় মাইল পথ আর কতই বা সময় লাগে? করারীরও অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান। অনেক চেষ্টার পর দুইটি মুসলমান বালক পথ দেখাইয়া যাইতে রাজী হইল। তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য কিছু পেয়ারা কিনিয়া দিলাম।

গ্রাম হইতে বাহির হইবামাত্র মধ্যবয়স্ক এক সজ্জনের সঙ্গে দেখা হইল। ছিপছিপে-গড়ন, প্রসন্নমুখ ভদ্রলোক যেন প্রেম ও বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি। ইনি গ্রামের



কৌশাম্বীর প্রাচীন স্তম্ভ

সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের লোক। দেখা হইবামাত্র বলিলেন, "শাহ্ সাহেব এত বেলায় কোথায় চলিয়াছেন? আজ আমার গরিবখানায় বিরাজ করুন।"

"ভাই আজ আমায় পভোসা পৌঁছাইতে হইবে।"

"ফকিরের কাছে আজ ও কালের মধ্যে প্রভেদ কি? আজ এ দীনের গৃহ পবিত্র করুন। আমাদের মত ভাগ্যহীনদের এরূপ সৌভাগ্য কতবার হয়?"

এরূপ প্রেমের বন্ধন এড়ানো মুস্কিল, কোন প্রকারে সেখান হইতে মুক্ত হইলাম। এদিকে সঙ্গী ছোকরা দুইটিও ইতস্ততঃ করিতেছিল। অবস্থা বুঝিয়া কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিলাম। তাহারা ফিরিয়া নিশ্চয়ই শাহ্ সাহেবের গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়াছিল।

করারী হইতে পভোসা পাঁচ ক্রোশ পথ শুনিয়াছিলাম। বেলা একটা বাজিয়া

গেল। ডিসেম্বরের দিনও ছোট। সুতরাং জোরে চলিতে লাগিলাম। চারি দিকের শ্যামল ক্ষেত্র সদ্যবর্ষণের ফলে আরও শ্যামল দেখাইতেছিল। অদূরে বাবুল গাছের সারির পাশে ভেড়া-ছাগল চরাইয়া কুমার-কুমারীর দল ফিরিতেছিল। আঙুলপ্রমাণ শস্যের ক্ষেতে ভেড়া চরাইবার যুগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাখালের দল আজও বহু শতাব্দীর পুরাতন সেই প্রাচীন গীতি গাহিতেছে। ক্ষেতের মধ্যে রাস্তা হারাইয়া উহাদের কাছে খোঁজ করিতে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য একজন সাথী জুটিল। তাহার ঘর গঙ্গার নহরের (সেচখালের) পাশের একটি বড় গ্রামে। ঐ গ্রামে আমার কোনই প্রয়োজন নাই, পভোসা আজই পৌঁছান দরকার—শুনিয়া বেচারা বলিল, মনিবের জন্য সে গাঁজা কিনিতে আসিয়াছে, যদি তিনি অনুমতি দেন তবে সে আমায় পভোসা পৌঁছাইয়া দিবে। সময় আসিলে অনেকক্ষণ গ্রামের পাশে নহরের ধারে বৃথা অপেক্ষা করিয়া বুঝিলাম, মনিবের ইচ্ছা অনুকূল হয় নাই। যাহাই হউক, রাস্তার নির্দ্দেশ এবং পথে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘর আছে কিনা সেই ঠিকানা লইয়া চলিলাম। নহরের গায়েই এক ব্রাহ্মণ-বাড়ীর খোঁজ পাইয়া দ্রুত সেখানে পৌঁছিলাম। বেলা তখন প্রায় শেষ, যদিও পভোসা পৌঁছিবার ইচ্ছা তখনও মনে রহিয়াছে।

পণ্ডিতজীর খোঁজ করিলাম। তিনি বাড়ী ছিলেন। আমাকে বাহিরে দেখিতে পাইয়া তিনি আসিয়া আমায় দেখা দিলেন। ফলে, এ অভাগা দেশে সাধনসঙ্গতিহীন গৃহস্থের দ্বারে অপরিচিত সাধু দেখিলে যে মনোভাব হয়, তাহাই হইল। আরও আগাইয়া উত্তম বিশ্রামস্থান পাওয়া যাইবে এই নির্দ্দেশ পাইলাম। আমারও অন্তরাত্মা তো পভোসামুখী, সুতরাং আগেই চলিলাম। পথ কিছুদূরের পর নহর ছাড়িয়া ক্ষেতের মধ্যে চলিল। ক্ষেতের পাশে আখমাড়া কল। পথ ভুল হইলে সেখানে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইতেছিল। সূর্য্যদেবের রক্তিম কিরণ আকাশপ্রান্তে প্রায় মিলাইয়া গিয়াছিল। রাস্তা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইলেও বন্ধুর। হেথা-হোথা উঁচুনীচু নালার পাড়। আঁকাবাঁকা মেঠো-পথের যেখানে-সেখানে চৌমাথা। সুতরাং সে পথের নিশ্চয়তা কিছুই ছিল না। মনে হইল, এ তো যমুনার উত্তরে বৎসদেশের সমতল ভূমি, তবে এখানকার জমি চেদি-দেশের ন্যায় এব্ড়ো-খেবড়ো খানাখন্দে পূর্ণ কেন। তখনও অগ্রসর হইতেছিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে আশার বাণী ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার। কোন দীপের আলোও চোখে পড়িল না যে সেদিকে তাকাই। এমন সময় এক পুষ্করিণীর পাড় চোখে পড়িল। সেদিকে গিয়া প্রথমে এক বটগাছ, পরে ছোট একটি শূন্য দেবালয় দেখিলাম। ভাবিয়া স্থির করিলাম, এত রাত্রে এইভাবে অপরিচিত গ্রামে যাওয়া অপেক্ষা শূন্য দেবালয়ে আশ্রয় লওয়াই

শ্রেয়। বাহিরের চত্বর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বিজলী-মশালের সাহায্যে ছোট-বড় ভাঙা মূর্ত্তি-ঘেরা ছোট দালান দেখা গেল। রাত্রিযাপন সেখানেই করিব স্থির করিয়াছি, এমন সময় নিকটেই মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিলাম।

আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, গাছের নীচে দুইখানি গরুর গাড়ী। শুনিলাম, কয়েকটি জৈন পরিবার তীর্থদর্শনের জন্য এই গাড়ীতে আসিয়া নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছে। পভোসা পৌঁছিয়াছি শুনিয়া মন প্রসন্ন হইল। ধর্ম্মশালার কূপ হইতে জল লইয়া আসিলাম এবং গাড়োয়ানদের পাশেই শয্যাসন বিছাইলাম। তাহারা ধুনীও জ্বালাইয়া দিল। গরিবের নিকট এরূপ সৌজন্য পাওয়া যায়। প্রাতে গ্রামের ভিতর দিয়া যমুনাস্নানে চলিলাম। গ্রামে কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য দেবালয় দেখিলাম। স্নান করিয়া ফিরিবার পথে মনে হইল, যাহার জন্য এত পথের ধূলা উড়াইলাম, এবার সেই পাহাড় দেখা উচিত। পালিসূত্রে আনন্দের* ঘোষিতারাম † হইতে দেবকট সৌব্‌ভ নামক স্থানের ছোট পাহাড়ে যাত্রার প্রসঙ্গ পড়িয়া সন্দেহ হইয়াছিল যে যমুনার উত্তরে পাহাড় কোথায়। কিন্তু আয়ুষ্মান্ আনন্দ ‡



কৌশাম্বী (শিব পার্ব্বতী)

---

* ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য।

† বুদ্ধদেবের সময় কৌশাম্বীর এক বিহারের নাম ঘোষিতারাম।

‡ সিংহলে ভিক্ষু রাহুলের আচার্য্য।

যখন এই সকল তীর্থদর্শন করিয়া সিংহলে ফিরিলেন, তখন সে প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। এই একান্তে স্থিত পাহাড়টি দুই অংশে বিভক্ত। উত্তরের অংশের নাম বড়া পাহাড়। ইহার নীচে পদ্ম-প্রভুর মন্দির আছে। জৈন গৃহস্থ বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে গেলে দ্বার খোলাইয়া দর্শন করাইবেন। আমি কিছু আগেই চলিলাম।

পাহাড়ের উপরের মসৃণ গাত্রে বহুপ্রাচীন, ছোট ছোট মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে —অনেকগুলি দুর্গম স্থানে দেখিয়া মনে হইল বেশীর ভাগই জৈনমূর্ত্তি। বোধ হয় কৌশাম্বীর প্রাচীন সমৃদ্ধির কালে বহু শতাব্দী ধরিয়া এখানে জৈন সাধুজন থাকিতেন। সে সময় কৌশাম্বীর ধনকুবেরেরা না-জানি কতশত বার এখানে ধর্ম্ম শ্রবণের জন্য আসিতেন।

কিছুক্ষণ পর জৈন গৃহস্থেরা আসিলেন। তাঁহারা নিজেরা দর্শন করিলেন এবং আমাকেও পরম সমাদরে দর্শন করাইলেন। বাহিরে সে সময় অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। দেবালয়ের প্রশস্ত বাঁধান অঙ্গনের স্থানে স্থানে হরিদ্রাভ বিন্দুর মত কোন পদার্থ দেখা যাইতেছিল। গৃহস্থ পরম শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিলেন, "পূর্ব্বকালে এখানে কেশর-বৃষ্টি হইত, তখন লোকেরা সাধু ছিল। কালের প্রভাবে লোকে সত্যভ্রষ্ট হওয়ায় এখন আর কেশর-বৃষ্টি হয় না, কেশরের মত দ্রব্য মাটি হইতে ফুটিয়া বাহির হয়।"

আমি ভাবিলাম, অতীতের স্মৃতি কি মধুর। ইঁহাদের ধর্ম্মই এখন ভারতের জীবিত-ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীনতম, ইহার ধারা অবিচ্ছিন্ন রূপে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধরাও এদেশে থাকিলে প্রাচীনত্বের দাবি করিতে পারিতেন। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতবাদ তো এই দুই ধর্ম্মের তুলনায় সেদিনের মাত্র। আড়াই হাজার বৎসর বিগত, কৌশাম্বী জনশূন্য, গৃহশূন্য ; ভূমির অধিকারী কতশত বার বদল হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইঁহাদের কাছে কেশর-বৃষ্টি সম্পূর্ণ সত্য। গৃহস্থ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া পাহাড় পরিক্রমা করিতে চলিলাম। পুনর্ব্বার উপরে গিয়া পুরাতন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এবং অপেক্ষাকৃত নূতন একটি ছোট স্তূপ দেখিলাম। উপর হইতে অদূরে এক পাশে কলিন্দনন্দিনীর মন্দগতি নীলধারা দেখা গেল। তাহার পরপারে অভিমানী শিশুপালের দেশ বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ দিকেই কোনদূরের জঙ্গলে হস্তী-বিলাসী উদয়ন প্রদ্যোতের কবলে বন্দী হইয়াছিলেন। মনে পড়িল, ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক কৌশাম্বীরাজ উদয়ন 'হাতী-খেদা' করিতে গিয়া কেমন করিয়া উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের লুক্কায়িত সেনার ফাঁদে পড়িলেন। বন্দী অবস্থায় প্রদ্যোত-দুহিতা বাসবদত্তার সহিত তাঁহার প্রণয়সঞ্চার এবং উভয়ের ষড়যন্ত্র ও পলায়নের কথা

স্মৃতিপটে উদিত হইবামাত্র মনে হইল, এই দেশই ঐ নাট্যের অভিনয়-মঞ্চ। বৎস তখনও স্বাধীন, কৌশাম্বীও স্বাধীন। কৌশাম্বী না জানি কতদিন উদ্‌গ্রীব হইয়া কুরুকুলের শেষ প্রদীপের প্রতীক্ষায় যমুনার পরপারে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিল! শেষে দ্রুতগামিনী হস্তিনীর পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রতাপশালী অবন্তীরাজের কন্যা ত্রিভুবনবিখ্যাত সুন্দরী বাসবদত্তার সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত উদয়নের প্রত্যাগমনে না জানি বৈভবসম্পন্ন কৌশাম্বীতে কি উৎসবের আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু আজ সে কৌশাম্বীর কি আশা-ভরসা আছে! তাহার সন্তানগণের অন্তরে অতীত গৌরবের ক্ষীণতম স্মৃতিটিও আজ বর্ত্তমান নাই!

বড়া পাহাড় হইতে নামিয়া দক্ষিণের শিখরে উঠিলাম। ইহার উপরিভাগ সমতল। সেখানে বড় বড় ইটের স্তূপাবশেষ রহিয়াছে। পর্ব্বতমূলে যমুনা প্রবাহিত। আজ এই পাহাড় শুষ্ক ও নীরস কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখানকার কোন স্বাভাবিক জলাশয় দেব-কট সোব্‌ভ নামে খ্যাত ছিল।

ভোজনের বিলম্ব আছে শুনিয়া রাত্রের সেই দালানের দিকে চলিলাম। শুনিলাম, প্রভাসক্ষেত্রের * ব্রাহ্মণেরা পুষ্করিণীকে দেবকুণ্ড নামে অভিহিত এবং মন্দিরকে অনন্দী মহারাণী—এই পবিত্র নামে ভূষিত করিয়াছেন। মস্তক দেহের অনুপাতে বিপুল, দেহমধ্যভাগে ধ্যানী জৈনমূর্ত্তির অংশ এবং নীচে অন্য কোন মূর্ত্তির নিম্নাংশ, এই তিন খণ্ডের যোগে অনন্দীমাই আবির্ভূতা হইয়াছেন!

তরুণ ব্রাহ্মণ পূজারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, সেও মলইয়াঁ পাঁড়ে†। এতদূরে আসিয়া পড়ার কারণ হিসাবে পুরাতন কাহিনীই শুনিলাম। বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বারা কৌলীন্যপ্রার্থী কোন ব্রাহ্মণের পাল্লায় পড়িয়া তরুণ ব্রাহ্মণ চিরদিনের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছেন। পথে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমার জৈন মন্দির দর্শন ও জৈনের হাতের রুটি ভোজন সম্বন্ধে টিপ্পনী করিলেন। রক্ষা এই যে, সংকিসার মত এখানে সরৌকাদিগকে ‡ জল-অচল ভাবা হয় না।

প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত প্রস্তুত মধুর রন্ধন, সঙ্গে পূর্ব্বের চব্বিশ ঘণ্টার শ্রান্তি-ক্লান্তি, এরূপ ভোজন অমৃতের তুল্য। খাইবার পর একাকী কৌশাম্বীর পথে অগ্রসর হইলাম। জৈন গৃহস্থেরাও যাইবেন, কিন্তু নৌ-পথে। তাঁহাদের সঙ্গে যে-সব স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা আমার দৃষ্টিগোচর নহেন।

---

* পভোসার পুরাতন নাম।

† লেখকও মলইয়াঁ পাঁড়ে বংশজ।

‡ সরাবাগী শ্রাবক জৈন।

এক ক্রোশ পথ চলিবার পর সিংহবল গ্রাম, তাহার পর পালী। পালীতে পুরানো ইটে প্রস্তুত ঘর দেখা যায়। পালীর অল্প দূরেই কোসম*। গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ী মুসলমানী আমলের ইটের প্রস্তুত। ইহাতে মনে হয় কৌশাম্বী মুসলমানের হাতে আসিবামাত্র বিধ্বস্ত হয় নাই; হইলে ধ্বংসস্তূপের ইটেই ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইত।

কোসম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে যমুনার তটে প্রাচীন কৌশাম্বীর গড়ের অবশেষ গঢ়বা নামে খ্যাত। দুর্গ-প্রাকার আজও দূর হইতে ছোট পাহাড়ের মত দেখা যায়। নিকটেই এক জৈন মন্দির। তাহার পাশেই অতি সুন্দর পদ্ম-প্রভুর ভগ্নমূর্ত্তি আছে। জৈন মন্দিরেব উত্তরে অল্প দূরে বিশাল অশোকস্তম্ভ। এই স্তম্ভ কোন্ স্থানের প্রসিদ্ধির জন্য স্থাপিত বলা যায় না। ঘোষিতারাম, বদরিকারাম আদি বৌদ্ধ-সঙ্ঘ প্রদত্ত তিনটি আরামই তো নগরী হইতে দূরে ছিল। বোধ হয় ইহা সেই স্থানের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে যেখানে ভগবান বুদ্ধের শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা উদয়ন-রাজমহিষী শ্যামাবতী তাঁহার সপত্নী মাগন্দীর চক্রান্তে সখীজনসহ অগ্নিসমর্পিতা হইয়াছিলেন। শ্যামাবতী বুদ্ধের অশীতিজন প্রসিদ্ধ শিষ্য-শিষ্যার অন্যতমা। অগ্নিদগ্ধ হইবার সময় তাঁহার ধৈর্য্য অপূর্ব্ব ও অটুট ছিল বলিয়া কথিত। প্রাসাদ মধ্যেই তিনি বহ্নি-নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলেন। সুতরাং সম্ভবতঃ এইস্থানে রাজকুল-বাসস্থান ছিল।

কনৌজের মত এখানেও এক মুসলমান আমার শাহ্‌সাহেব সম্বোধন করিলেন। পরে সন্ধ্যার সময় সরায়-আকিলে আর একজন সেলামালেকুম্ নিবেদন করেন। সরায়-আকিলের ধর্ম্মশালা অপেক্ষা মন্দির-দালান পরিষ্কার দেখিয়া সেখানে রাত্রি যাপনের জন্য শয্যা বিছাইয়া দিলাম। আরতির পর দেবতাকে দণ্ডবৎ করি নাই, এই অপরাধে পূজারী ক্রুদ্ধ হইয়া নাস্তিক বলিলেন। তাতে আর দুঃখ কি? যাহা হোক, আকিলের সরাইয়ে ১৯২৮ অব্দ সমাপ্ত হইল।

১লা জানুয়ারি, ১৯২৯, সকালেই বাস্‌যোগে মনৌরী হইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। বাসে সহযাত্রী সরকারী কর্ম্মচারী হিন্দু বাবুও আমায় মুসলমান ঠাওরাইলেন। আমি ভাবিয়া পাইলাম না যে পনের হইতে কুড়ি দিনের দীর্ঘ কেশ ভিন্ন আমাতে মুসলমানী বৈশিষ্ট্য কি আছে। যাহা হউক, এই সজ্জনেরা কেহই জানিতেন না, আমি রাম বা খুদাহ্ দুই হইতেই কত যোজন দূরে আছি।

---

* কৌশাম্বীব আধুনিক নাম।

দুই

প্রয়াগে কাজও কিছু ছিলই না, যদি বন্ধুও বা কেহ থাকিতেন তবে না হয় ডালরুটির ব্যবস্থাটা হইত। তাহাও এই হোটেলের যুগে ভাবিয়া লাভ নাই। সুতরাং সোজা ছোট লাইনের পথে বারাণসী যাত্রা করিলাম এবং সেখানে পৌঁছিয়াই সারনাথ রওয়ানা হইলাম। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম ভিক্ষু শ্রীনিবাস ঘুমাইতেছেন। যাহা হউক, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমিও ঘুমাইবার স্থান পাইলাম।

কাশীতে আমার টীকাযুক্ত "অভিধর্ম্মকোষ" ছাপাইবার, এবং যদি সম্ভব হয় তাহার বিনিময়ে তিব্বত-যাত্রার খরচের সংস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল। পাণ্ডুলিপিখানি সে সময় সঙ্গে না থাকায় কিছুই করা সম্ভব হইবে না জানিয়া তথাগতের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের স্থান এই পুণ্যময় ঋষিপতন দর্শন করিতে লাগিলাম। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ঋষিপতন নামে খ্যাত এই সারনাথ-বারাণসীই বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারের আরম্ভ দেখিয়াছিল। এখন তাহার সে গৌরবের কি আছে? যাহা হউক, মনে হয় ভবিষ্যৎ প্রসন্ন এবং বর্ত্তমানেও কিছু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।



রাজগৃহ (গৃধকূট)

এবার শিবরাত্রি ১৬ই মার্চ্চ, সুতরাং হাতে দুই মাস সময় ছিল। দিন কয়েক ছাপরায় বিশ্রাম করিয়া পাটনা-বক্তিয়ারপুর লাইনে রাজগিরিতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কৌণ্ডিন্য বাবার ধর্ম্মশালা তো আমার ঘর-বাড়ীরই মত।

সেই দিনই বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রথিত—বেণুবন, সপ্তপর্ণী গুহা, পিপ্পলী গুহা, তপোদা, বৈভার প্রভৃতি স্থানগুলি দেখিবার জন্য চলিলাম। তখন মনেও ভাবি নাই যে অতীতের খ্যাতি বর্ত্তমানে কতটুকুই বা আছে। যে বেণুবন বুদ্ধদেবের সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য প্রাপ্ত 'আরাম' সকলের মধ্যে প্রথম, যেখানে তথাগত বহুবার মাসাবধি থাকিয়া কত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার এখন সন্ধান পাওয়াই দায়। যাহা হউক, কোন প্রকারে যদি বা বেণুবন খুঁজিয়া পাইলাম, সপ্তপর্ণার খোঁজ পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বেণুবনের পার্শ্বস্থ নদীর তীরে পূর্ব্বপরিচিত মোহন্তবাবার কুঠীতে গিয়া শুনিলাম, তিনি আর ইহলোকে নাই, সুতরাং একাকীই বৈভারের চারিপাশে সপ্তপর্ণার তল্লাসে ঘুরিলাম। বৈভারের উপর হইতে নামিবার সময় পিপ্পলী গুহা দেখিলাম। বিনা-মসলায়-জোড়া পাথর সাজানো এই গুহায় বুদ্ধের প্রিয় প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ বহুদিন ছিলেন। আরও নিচে তপোদা—সপ্তঋষির তপ্তকুণ্ড দেখিলাম। সেদিনকার মত এইসব পুণ্যস্থান দর্শন স্থগিত করিলাম; গৃধকূট পরদিনের জন্য রহিল।

পরদিন স্বামী প্রেমানন্দজী সাথী হইলেন। পাথেয় তাঁহারই প্রস্তুত তরকারী ও পরটা এবং পথ-প্রদর্শক শ্রীকৌণ্ডিন্য স্থবিরের ভৃত্য। গৃধকূটের দীর্ঘ চারি মাইল পথে, পুরানো নগরের পরে, জঙ্গলের মধ্যে "সুমাগধা"র শুষ্ক ঘাটে পৌঁছিলাম। এই সুমাগধার জলরাশি এককালে রাজগৃহ ও আশেপাশের বহু গ্রামকে তৃপ্ত করিত, আজ এমন বর্ষাতেও তাহা জলশূন্য। লক্ষ লোকের বসতি এই ভূমি এখন বন্যপশুর আবাসস্থল। কিন্তু তথাগতের সেবায় যাইবার জন্য মগধ সাম্রাজ্যস্থাপক নৃপতি বিম্বিসার নির্ম্মিত রাজপথ এখনও পথ-নামের যোগ্য আছে।

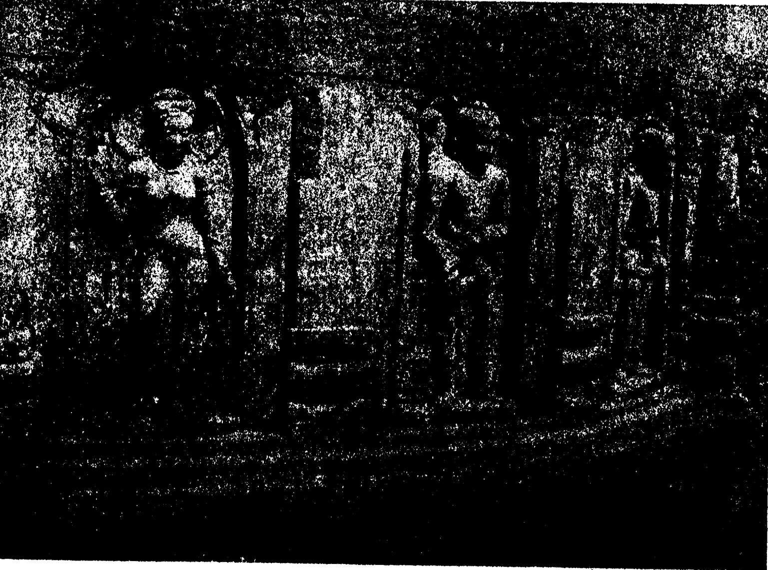
গৃধকূট পৌঁছিলাম। মনুষ্যচিহ্ন সবই লুপ্তপ্রায়, কিন্তু প্রস্তরময় চত্বর এখনও অটুট। যে-চত্বরের উপর পীতবস্ত্র পরিহিত তথাগতের দর্শনে পুত্রের হস্তে বন্দী বিম্বিসারের হৃদয় আশা ও সন্তোষে পরিপূর্ণ হইত, সে-চত্বরের কাছে সহস্র বৎসর একদণ্ড কাল মাত্র। আমরা দর্শনের পর পরটার সেবা করিলাম। দ্বিপ্রহর কৌণ্ডিন্য বাবার ধর্ম্মশালায় কাটিল।

ঐ দিনই (১০ই জানুয়ারি) সিলাব গ্রামে পৌঁছিলাম। যাঁহার উদ্দেশে গিয়াছিলাম, তাঁহারও সাক্ষাৎ মিলিল না। তবে মৌখরিদিগের* গন্ধশালি-উৎপন্ন ভাত চিঁড়া বা খাজা তুচ্ছ করা চলে না। সিলাব গ্রাম, ব্রহ্মজাল সুত্তের উপদেশ-স্থান অম্বলট্টিকা কিম্বা মহাকাশ্যপের প্রব্রজ্যা-স্থান বহুপুত্রক চৈত্য, এই দুইয়ের কোন এক

* মধ্যদেশে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পর মৌখরি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর বিবাহ-সম্পর্ক মৌখরি কুলেই হয়। 'মৌখরিদের এক শাখা' বিহারে রাজত্ব করিত। সিলাব গ্রামে এখনও কয়েকটি "মাহরী" পরিবার আছে।

স্থান। এখানে বাবু ভগবান দাস মৌখরির বাড়ীর এলাকার মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর এক শিলালেখ দেখিলাম। পরদিন ঐ লিপির নকল লইতে ও খাওয়াদাওয়া শেষ করিতে দ্বিপ্রহর কাটিয়া গেল। সেইদিনই অপরাহ্ণে নালন্দা রওয়ানা হইলাম।

দুই বৎসর পরে নালন্দার চিতা দর্শনে আসিলাম। এই নালন্দাই আমার স্বপ্নাবাসভূমি। ইহারই কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর চরণপূত পথে আমার তিব্বতযাত্রা করিতে হইবে। ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যতে এখানে আশ্রম করিবার জন্য কিছু জমি সংগ্রহ করি, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্ভব হইল না। এবারকার মত ভিতর-বাহির পরিক্রমা করিয়া, স্তূপ হইতে প্রাপ্ত মূর্ত্তি, মুদ্রা, তৈজসপত্র এবং বিহারের কুঠরি, দ্বার, স্তূপ, কূপ ইত্যাদি দেখিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম।



রাজগৃহ (মনিয়র মঠ—ভিতরের দেয়ালের মূর্ত্তিসজ্জা)

ইতিমধ্যে পাটনায় অভিধর্ম্মকোষের পার্শেল পৌঁছিয়া গিয়াছিল! তাহার উপরই পাথেয় সংগ্রহের ভরসা। সুতরাং পাটনা হইয়া ১৩ই জানুয়ারি পুনর্ব্বার বারাণসী পৌঁছিলাম। প্রকাশক মহাশয় নিজে দেখিয়া পরে যাচাই করার জন্য পাণ্ডুলিপি অন্য বিদ্বানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি ঐ বিষয়ক ফরাসী মূলগ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সারনাথে গিয়া চীনা ভিক্ষু বোধিধর্ম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজগৃহের জঙ্গলে। পরে সিংহলের

বিদ্যালঙ্কার বিহারে আমরা কয়েক মাস একসঙ্গেই ছিলাম। অত্যধিক ধীর স্থির ছিলেন বলিয়া অপরিচিত লোকে ইঁহাকে পাগল বলিতে ছাড়িত না, এবং প্রথম পরিচয়ে ঐ মলিন শীর্ণ নমিত দেহের ভিতর কতটা সংস্কৃতি আছে তাহা অনুমানও করা যাইত না। বোধিধর্ম্ম যে কেবলমাত্র চীনা ভাষায়, বৌদ্ধধর্ম্মে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক পদে ঐ মতের অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা ছিল। তিনি আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার নেপাল যাত্রার সবিশেষ বিবরণ দিয়াছিলেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের কার্য্য সম্বন্ধেও এই পত্রে অনেক কথা ছিল। আমি জানিতাম না যে ইহাই তাঁহার অন্তিম-পত্র হইবে।



নালন্দায় প্রাপ্ত
বোধিসত্ত্বের প্রস্তরমূর্ত্তি

২৯শে জানুয়ারি পাণ্ডুলিপি-সম্পর্কে উক্ত বিদ্বান মহোদয়ের অনুকূল মত পাওয়া গেল। কিন্তু প্রকাশক বলিলেন, তিনি কোনও আর্থিক পারিতোষিক দিতে অসমর্থ। এদিকে তিব্বত-যাত্রার জন্য আমার কিছু টাকার প্রয়োজন, সুতরাং আমিও তাঁহাকে পুস্তক দিতে অসামর্থ্য জানাইলাম। প্রায় সবই নিষ্ফল হইয়া যায়—এমন সময় আচার্য্য নরেন্দ্রদেব—তিনি পুস্তকের কোন কোন অংশ দেখিয়াছিলেন—কাশী বিদ্যাপীঠের তরফে ইহা প্রকাশের কথা বলিলেন। দুই দিন পরে বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ উহা প্রকাশ করিতে এবং আমাকে এক শত টাকা দিতে রাজী হইলেন।

আমি এখন অন্যান্য ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত, সুতরাং বুদ্ধগয়ায় গেলাম। সেখানে মঙ্গোলীয় ভিক্ষু লোব্-সঙ-শে-রবের সহিত আলাপ হইল। এই আলাপে পরে আমার কত উপকার হইবে তাহা তখন মনেও ভাবি নাই। আমি ভোটিয়া (তিব্বতী) ভাষার দুই-একখানি পুস্তক পড়িয়াছিলাম, সুতরাং দুই-চারিটা ভোটিয়া কথা বলিতে পারিতাম। ইনি তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া পরম আগ্রহের সহিত আমাকে

চা খাওয়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে লাসার ডেপুঙ্-মঠে নিজের প্রবাসের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাবোধিতে এক লক্ষ দণ্ডবৎ প্রণামের সংকল্প ছিল, সুতরাং এখানে আরও মাস দুই থাকিতে হইবে।

লিচ্ছবিদিগের প্রাচীন বৈশালী দেখিবার ইচ্ছা ছিল। প্রাচীন মিথিলার এই পরাক্রান্ত জাতির "পঞ্চায়তী" রাজধানী বৈশালী এখন মজঃফরপুর জেলার বসাঢ গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

মজঃফরপুরে শুনিলাম বসাঢ়ের কাছে বখরা পর্য্যন্ত বাস যায়। আমি পথে প্রথমে বখরায় অশোকস্তম্ভ দেখিতে গেলাম, তথায় তথাগত বহুবার বাস করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভ সেই মহাবনের কুটাগারশালার স্থান নির্দ্দেশ করে। কত বিখ্যাত সুত্ত এখানে রচিত হইয়াছে, এইখানেই তথাগতের পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষপরে আনন্দের শিষ্য সর্ব্বকামীর নেতৃত্বে সমস্ত ভিক্ষু-সঙ্ঘ একত্র হইয়া শঙ্কা-সমাধান করিয়া ভগবান বুদ্ধের সুত্ত গান করিয়াছিলেন। এখন ইহার এমন অবস্থা যে নিশ্চিত ভাবে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করাও দুঃসাধ্য।

বখরার পথে বনিয়া পৌঁছিলাম। "বজ্জি"দিগের* রাজধানী বৈশালী এখন "বনিয়া-বসাঢ়" নামে পরিচিত; "বনিয়া"ই জৈনসূত্রের "বানিয় গাম নয়র" অর্থাৎ বৈশালীর ব্যবসায়িক মহল্লা। বজ্জিদিগের মহা শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রের রাজধানীর এই ব্যবসায়িক কেন্দ্র সেকালে বিপুল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিল। একথা বৌদ্ধ জৈন উভয় সাহিত্যেই স্পষ্ট লেখা আছে। ভগবান মহাবীরের প্রধান গৃহস্থ শিষ্য আনন্দ এইখানেই থাকিতেন এবং ভগবান বুদ্ধের প্রধান একাদশ গৃহস্থ শিষ্যের অন্যতম উগ্র গৃহপতির নিবাসও এইখানে ছিল। এখন আছে ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, তবে এখনও প্রাচীনকালের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মৃন্ময় মেখলা বাঁধা ক্ষুদ্র কূপ যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়।

বনিয়ার এক গৃহস্থ আগ্রহের সহিত অতিথি-সৎকার করিলেন। তার পরে বসাঢ়ে আসিলাম। দীঘির পাড়ের মন্দির—মন্দিরে বৌদ্ধ জৈন মূর্ত্তিগুলি হিন্দু দেবদেবীর নামে পূজা পায়—রৌজা, গড়, গ্রাম সবই ঘুরিয়া দেখিলাম। এইখানেই কোথাও পূর্ব্বকালের বজ্জিদিগের সংস্থাগার (প্রজাতন্ত্রভবন—পার্লেমেন্ট) ছিল। সেখানে একদিন ৭৭০৭ জন রাজোপাধিধারী লিচ্ছবি পুরুষসিংহ একত্র হইয়া সপ্ত "অপরিহানিধর্ম্ম" মতে বজ্জি দেশের প্রবল প্রজাতন্ত্র পরিচালন করিতেন। সেই প্রজাতন্ত্রের প্রতাপে একদা মগধ ও কোশলের হৃদয় কম্পিত হইত। মগধরাজ অজাতশত্রু এই প্রজাতন্ত্র আক্রমণে উদ্যত হইয়া জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর দেন, (১) যতদিন বজ্জিগণ নিজদের

*বৃজি বা বজ্জি, লিচ্ছবিদিগের অন্য নাম।

পরিষদে বহুবার বহু সংখ্যায় একত্র হইয়া পরামর্শ করিবেন, (২) যতদিন প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাদের এই একতা থাকিবে, (৩) যতদিন বিনা-নিয়মে তাঁহারা কোন কার্য্য না করিবেন, এবং নিজেদের স্থিরীকৃত নিয়ম প্রতি অক্ষরে পালন করিবেন, (৪) যতদিন তাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রধানগণের সমাদর এবং তাঁহাদের উচিত বাক্য শ্রবণ করিবেন, (৫) যতদিন তাঁহারা আপনাদের কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীদিগের উপর অত্যাচার না করিবেন, (৬) যতদিন তাঁহারা নিজেদের চৈত্য-মন্দিরের সম্মান রক্ষা করিবেন, (৭) যতদিন তাঁহারা বিদ্বান আর্য্যগণের শ্রদ্ধা ও শুশ্রূষা করিবেন, শত্রুসেনা যতই প্রবল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হউক না কেন, ততদিন উহাদের পরাজয় সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের এই সাতটি সর্ত্তই "অপরিহানিধর্ম্ম"।

। বসাঢ় এবং আশেপাশের গ্রামে জথরিয়া (ভূমিহার) জাতিই অধিকতর প্রভাবশালী। আজকাল তো ইঁহারা ষোল আনা ব্রাহ্মণ, যদিও একদিন 'জথরিয়া পুত্র' (জ্ঞাতি পুত্র) বর্দ্ধমান মহাবীর এই ব্রাহ্মণদেরই ভিক্ষুক জাতি এবং তীর্থঙ্কর উৎপাদনের অনুপযুক্ত বলিয়া হীনশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। বসাঢ়ে একদিন এক বৃদ্ধ জথরিয়াকে বলিলাম, "আপনারা ব্রাহ্মণ নহেন, আপনারা ক্ষত্রিয়।" তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিমসার হইতে আগত জেথরংডিহের অধিবাসী তাঁহার ব্রাহ্মণ পূর্ব্বপুরুষদের কাহিনী শুনাইলেন। তাঁহার নিকট সমৃদ্ধ, প্রতিভাশালী, স্বাধীন জ্ঞাতৃজাতির বীর-রক্তের সমাদর ততটা ছিল না, যতটা ছিল এক ধনহীন, বলহীন, মূর্খ, মিথ্যাভিমানী, কূপমণ্ডুক জাতির পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার! অথচ এখনও ঐ রক্তেরই প্রভাবে প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে ইহাদের সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে।

সব জাত মেঁ বুর্ব্বক জথরিয়া
মারৈ লাঠী জিনৈ চদরিয়া।

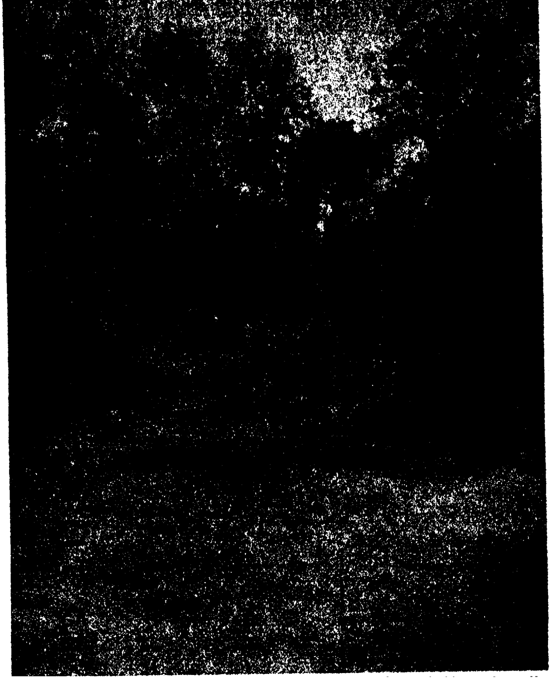
এই নির্ব্বোধের কথা আর কেন বলি, জথরিয়া-বংশোদ্ভব সুশিক্ষিত মৌলানা শফী দাউদীই কি নিজকুলের গুরুত্ব বুঝেন?

বৈশালী হইতে মজঃফরপুর ফিরিলাম। সেখানকার কংগ্রেস-নায়ক জনকবাবু পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাখ্যানের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন, এক "জ্ঞাতৃ-পুত্রের" সভাপতিত্বে তাহা রক্ষা করিলাম। পরে দেবরিয়ার পথে কুশীনার (কসিয়া) যাত্রা করিলাম।

দুই-তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বার কুশীনার দর্শন হইল। সৌভাগ্য এই যে, এতদিনে দেশের লোকে আত্মপরিচয় পাইতেছে, তাই আজ মহাপরিনির্ব্বাণ-স্তূপ মেরামত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে পদব্রজে এই পথে আসিবার সময় এক গৃহস্থ বলিয়াছিলেন, "কি হে বাপু? বর্ম্মা দেশের (!) দেবতার গন্ধ পেয়ে এসেছ?" বুদ্ধদেবের নাম বা কসিয়ার

সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা কেহই জানিত না, জানিত শুধু যে বর্ম্মা হইতে আগত স্থবির মহাবীর ঐ স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

স্থবির মহাবীরের আসল পরিচয় অল্পলোকেই জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহারাও নিঃসন্দেহ নহেন। সিপাহী বিদ্রোহে বিহারের প্রসিদ্ধ কুঁবর সিংহ বীরত্বের সহিত লড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরাজয়ের পর তাঁহারই এক শ্যালক ইংরাজের প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রহ্মদেশে ছদ্মবেশে ছিলেন। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া ভিক্ষুভাবে বহুকাল যাপন করিয়া স্থবির অবস্থায় কসিয়ায় আসেন। এই স্থবির মহাবীরের আশ্রম স্থাপনের ফলেই এত দিন পরে লোকে "বর্ম্মা দেশের দেবতা"র প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে এবং হাজার হাজার নরনারী তথাগতের অন্তিমলীলা-সম্বরণ-স্থানকে পরম শ্রদ্ধায় ফুলমালায় সাজাইতেছে।



লুম্বিনী (বুদ্ধদেবের জন্মস্থান)

মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া মনে হইল* ২৪১২ বৎসর পূর্ব্বে, বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাতে এই স্থানেই যুগল শালবৃক্ষের মধ্যে এই ভাবেই উত্তরে শির, দক্ষিণে পদ ও পশ্চিমে মুখ রাখিয়া শায়িত অবস্থায়, সহস্র সহস্র অশ্রুমুখ জনতার পরিবেষ্টনীর মধ্যে, "যাহা সৃষ্ট সবই নশ্বর" এই কথা বলিয়াই লোকজ্যোতি চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইয়াছিলেন।

কুশীনারায় দু-চার দিন বিশ্রাম করিলাম। পরে লুম্বিনী দর্শনের ইচ্ছায় গোরখপুর হইতে নৌতনওয়া গেলাম। শুনিলাম লুম্বিনী এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ। সেখানে টাট্টুতে চড়িয়া যাওয়াই প্রশস্ত। কিন্তু যাহাকে হিমালয়ের দুর্গম পথে বহু

* ইং ১৯২৯ সালের হিসাবে লিখিত।

শত ক্রোশ পার হইতে হইবে, তাহার টাট্টুর প্রয়োজন কিসে? সকালে মিঠাইয়ের দোকানে দেহের পাথেয় সংগ্রহ করিলাম এবং পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শাক্য ও কোলিয়দিগের সীমানার রোহিণী* ইত্যাদি অনেক নদীনালা পার হইয়া চলিলাম।

দশ-বৎসর পরে পুনর্ব্বার লুম্বিনীতে আসিয়া অনেক নূতন জিনিষ দেখিলাম। কূপ ও মন্দির মেরামত হইয়াছে, ছোট ধর্ম্মশালাও নির্ম্মিত হইয়াছে। কঁকরহবা পর্য্যন্ত পথও প্রায় তৈয়ারী শেষ। এ সকলই নেপাল-নরেশ চন্দ্র সমসেরজঙ্গের নির্দ্দেশে হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল "রুম্মিনদেই"কে পুনরায় "লুম্বিনী বনে" পরিণত করা, কিন্তু সে সংকল্প মনে রাখিয়াই তিনি চির-প্রস্থান করিয়াছেন। জানি না সে পুণ্যময় ইচ্ছা পূরণ করা কাহার সৌভাগ্যে ঘটিবে। তবে নেপাল সরকারের কার্য্য চলিতেছে।

মনুষ্যজাতির এক-তৃতীয়াংশের একান্ত মনস্কামনা এই স্থান দর্শন। ২৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমায় এইখানেই কুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন, ২১৮২ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট অশোক এইখানেই পূজা দান করেন। যেখানে লোকগুরু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেইখানে এক নীচু কুঠরিতে এখনও জননী মহামায়ার বিনষ্টপ্রায় মূর্ত্তি দক্ষিণ হস্তে শালবৃক্ষ শাখা ধাবণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুশীনারার মহাস্থবির চন্দ্রমণির ইচ্ছানুসারে, তাঁহার প্রদত্ত ধূপকাঠি ও মোমবাতি আমি ঐ মূর্ত্তির সম্মুখেই জ্বালিয়া দিলাম।

রাত্রেও ঐ কুঠরিতে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূজারী বলিলেন, এখানে, রাত্রে চোরের উপদ্রব, সুতরাং থাকা নিরাপদ নহে। ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় খুনগাঁই গ্রামের চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র আসিয়া আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে বিশ্রাম ও ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের দ্বার লুম্বিনী যাত্রীদের জন্য অবারিত, এমন কি অ-হিন্দুদিগের ভোজনের জন্য চীনামাটির বাসন ইত্যাদিও তিনি রাখিয়াছেন। রাত্রে আমার ভোজনের প্রয়োজন না হওয়ায় সেইগুলি ব্যবহার করা হয় নাই।

পরদিন সহৃদয় চৌধুরী-সাহেবের ব্যবস্থায় তাঁহার গাড়ীতেই নৌগড় রোড ষ্টেশন রওয়ানা হওয়া গেল। খুনগাঁই হইতে কঁকরহবা দেড় কি দুই ক্রোশ মাত্র এবং ইহা নেপাল সীমান্ত হইতে অল্পই দূর। এখন নৌগড় রোড হইতে এই পর্য্যন্ত মোটর বা গরুর গাড়ীতে আসা যায়, আর কিছুদিন পরে লুম্বিনী পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ার হইলে যাত্রীরা মহাসুখে নৌগড় রোড হইতে বরাবর মোটরে যাইতে পারিবেন।

* বুদ্ধ শাক্য-বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার মাতা প্রতিবেশী কোলিয-বংশের। এই দুই বংশের আদি দেশের মধ্যের সীমা রোহিণী নদী।

সেই দিনই রাত্রে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখন কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তাতে জেতবন দেখিবার পালা। কিন্তু ষ্টেশনে শুনিলাম সেদিন আর ট্রেন নাই, কাজেই হালুয়াইয়ের দোকানে আশ্রয় লইয়া ভোজনের চেষ্টা দেখিলাম। হালুয়াই পুরী তৈয়ারী আরম্ভ করিল। রোজার দিন, খানিক পরে তাহারই দোকানে ঐ গ্রামের এক মুসলমান গৃহস্থ আসিয়া বসিতেই হালুয়াই তাঁহাকে পান খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাঁ-সাহেব, রোজায় বড কষ্ট হচ্ছে না?"

"না ভাই! এবার শীতের দিনে পড়েছে, রাত্রে খাওয়া ভালই হয়, গ্রীষ্মে রমজান পড়লেই কষ্ট হয়।"

দু-জনে দিব্য গল্প চলিল, হালুয়াই তাহার কাজও করিতে লাগিল। আমি ইহাদের সদালাপ শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিলাম যে, কোন্ শক্রতে ইহাদের এককে অপরের বিষম বৈরীতে পরিণত করিতেছে। এই দেশে কি এই দু-জনের নিজ নিজ আচার-ব্যবহার বজায় রাখিয়া গা ছড়াইবার মত ভূমির অভাব আছে? যদি কেহ বলে যে এই শক্রতার কারণ ধর্ম্ম, তবে আমি বলি ধিক্ সেই ধর্ম্মে যাহাতে এইরূপ বন্ধু শক্রতে পরিণত হয়।

পরদিন (১৯শে ফেব্রুয়ারি) নৌগড় হইতে বলবামপুর পৌছিলাম। ভিক্ষু আসয়ার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইলাম, ভিক্ষু মহাশয় ব্রহ্মদেশীয় ধনী পিতার শিক্ষিত সন্তান। দশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলাম, তখন বর-সম্বোধি নামক ভিক্ষু এই ধর্ম্মশালার সূচনা, এবং সবেমাত্র অল্প অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখন বিশ্রাম ভোজন ইত্যাদির স্থান ছাড়াও কূপ, মন্দির ও পুস্তকালয়ও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে দেখিলাম।

২১শে ফেব্রুয়ারি আয়ুষ্মান্ আনন্দকে আমরা জেতবন-ভ্রমণ সম্বন্ধে এই পত্র লিখিয়াছিলাম—

"কাল সকালে পদব্রজে অবিরত আড়াই ঘণ্টা চলিয়া এখানে আসিয়া মহিন্দ বাবার কুঠিতে উঠিয়াছি। আমার হাঁটার অভ্যাস আরও বাড়ানো প্রয়োজন। মহিন্দ বাবা এখন ব্রহ্মদেশে। আসিবার সময় ধনুস্কোডিতে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। কাল পূর্ব্বাহ্নে জেতবন ঘুরিয়া গন্ধকুঠি, কোসম্বকুঠি, কাবেরীকুঠি, সললাগার দেখিলাম। এ সকলের অবস্থান-নির্ণয়ে সন্দেহের অবসর নাই। এই গন্ধকুঠির সম্মুখের নিম্নভূমিই "জেতবন-পোকৃখ্রণী" সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহিন্দ বাবার কুঠি ফাহিয়ান-বর্ণিত তৈর্থির দেবালয়ের ভিটার উপর স্থাপিত।

"অপরাহ্নে শ্রাবস্তী গেলাম। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও চারিদিক দেখা শেষ হয় নাই। শ্রাবস্তীর পূর্ব্বদ্বার গঙ্গাপুর দরওয়াজার (বড়কা দরবাজা) স্থানে ছিল বোধ

হয়, কিন্তু তাহার কাছে পূর্ব্বারামের কোনও চিহ্ন পাইলাম না। মনে হয় পূর্ব্বারামেরই ধ্বংসাবশেষ এখন হনুমানবাঁ নামে পরিচিত।

"এবার গোঁড়া-বাহরাইচ জেলায় দুর্ভিক্ষ। পুকুর সবই শুষ্ক, বর্ষার ফসল জন্মায় নাই, রবিশস্যেরও জলের অভাবে বিশেষ চাষ হয় নাই, সুতরাং আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত ইহাদের কষ্টের অবস্থা চলিবে। এ অঞ্চলের লোক বিশেষ ক্লিষ্ট মনে হয়, সরকারের তরফে রাস্তা মেরামতাদির কাজ আরম্ভ হইয়াছে, মজুরীর হার পুরুষের দশ পয়সা, অন্যদের দুই আনা, তাই লোকে দু-ক্রোশ তিন-ক্রোশ দূর হইতে আসা-যাওয়া করে। ভুট্টার দানা চার আনা সের। লুম্বিনীর পথে লোকের এইরূপ কষ্ট দেখি নাই।

"শেষ পত্র চম্পারণ জেলা হইতে লিখিব। নেপাল পর্য্যন্ত দু-এক জন সঙ্গী পাওয়া যাইবে, সুতরাং নেপাল হইতেও তাঁহাদের মারফত একটি চিঠি পাঠাইব। তাহাতে ভবিষ্যতের জন্য কি উপায় স্থির হইয়াছে তাহা জানিবে। নেপাল পৌঁছিবার পর হাতে দেড়শত টাকা থাকিবে বোধ হয়। যাত্রার জন্য বুদ্ধগয়ার ত্রিশ চল্লিশটি পাতা কুশীনারার কুশ ইত্যাদি লইয়াছি।

"আজ অন্ধবন দেখিবার ইচ্ছা আছে।"

২২শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে চম্পারণ যাত্রা করিলাম। গোরখপুরে গাড়ী বদলের পর দশটার সময় ছিবৌণী ঘাটে পৌঁছিলাম। গণ্ডকের পুল ভাঙিয়া যাওয়ায় অনেক দূর পর্য্যন্ত নদীর বালির উপর চলিতে হইল। দেখিলাম, পশুপতিনাথের বহু যাত্রী এখনই নৌকাপথে চলিয়াছে, কিন্তু আমার হিসাবে এখনও যাত্রার আট দিন বাকী। নরকটিয়াগঞ্জের নিকট বিপিনবাবুর বাড়ীর কথা মনে পড়ায় স্থির করিলাম সেখানেই যাওয়া যাক। বিপিনবাবু ছিলেন না, তবে তাঁর ছোট ভাইকে বাড়ীতেই পাওয়া গেল। বে-ঘরের পক্ষে ঘরের সন্ধান পাওয়া কতই সহজ! কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল যে আট দিন কি করা যায়। কি করিলাম তাহা ২৮শে ফেব্রুয়ারি আনন্দকে লিখিত পত্রে আছে—

"বলরামপুর হইতে চিঠি পাঠাইয়াছিলাম। এখানে আসা উচিত ছিল ৩রা মার্চ্চ, আসিয়াছি ২৩শে ফেব্রুয়ারি, সুতরাং এই প্রকারে সময় কাটাইতেছি।

"পিপরিয়া-গাঁওয়ের কাছে রমপুরবায় গিয়াছিলাম। সেখানে কাছাকাছি দুটি অশোক-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে যাহার একটিতে শিলালিপি আছে। পুরাতত্ত্ব-বিভাগের খননে, একটি বৃষমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা একটি স্তম্ভের শীর্ষে ছিল, অন্যটির উপর কি ছিল তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। লোকপরম্পরায় এরূপ শোনা যায় যে, ঐ স্তম্ভে ময়ূর ছিল। ময়ূর মৌর্য্যদের রাজচিহ্ন এবং পিপরিয়া গ্রাম কাছেই আছে, তবে কি মৌর্য্যদের প্রজাতন্ত্র রাজ্যের পিপ্পলীবনই এই পিপরিয়া গাঁও? পিপ্পলাবন

মৌর্যদের মূলস্থান, উহার অধিবাসিগণ বুদ্ধকে সম্মান করিত এবং কুশীনারায় পিপ্পলীবনস্থ মৌর্য্যগণ চিতাভস্মের অংশ পাইয়াছিলেন, বিলম্বে আসায় অস্থি বা পুষ্প পান নাই। এখানে একই স্থানে দুইটি অশোক-স্তম্ভ স্থানের মাহাত্ম্যপ্রকাশ করিতেছে। মনে হয়, নিজের বুদ্ধভক্ত পূর্ব্বপুরুষদিগের আদিস্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত করিবার জন্যই সম্রাট অশোক এইখানে দুইটি স্তম্ভ প্রোথিত করেন।

"পিপ্পলীবনের মত ছোট গণতন্ত্রের রাজধানী বিশেষ বড় শহর হওয়া সম্ভব নহে। অজাতশত্রুর সময় ইহা নিশ্চয়ই মগধ-সাম্রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর ক্ষুদ্র নগরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ স্পষ্ট না হইবারই কথা, বিশেষতঃ যখন সে-সময়কার অধিকাংশ পুরী প্রাসাদ কাষ্ঠময় ছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন বিশ-বাইশ ফুট মাটির নীচে জলতলের সমীভূত।

"রমপুরবা হইতে সাত-আট মাইল উত্তরে ঠোরী গিয়াছিলাম। উহা নেপালের ভিতর এবং তিব্বতের অন্য এক পথের মুখে। ঠোরী হইতে তিন মাইল দক্ষিণে মহাযোগিনীর গড আছে, নীচে ইটের গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহা মুসলিম আমলের পূর্ব্বেকার জিনিষ! পুরানো মন্দির সুদৃঢ়ভাবে প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল, মুসলমানেরা নষ্ট করিবার পর এক-শ কি দেড়-শ বৎসর পূর্ব্বে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা এখন তরাইয়ের জঙ্গলের মধ্যে।

"এখানে 'থারু' নামে এক বিচিত্র জাতির সঙ্গে পরিচয় হইল। বহু বিদ্বান ব্যক্তি ইহাদের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। ইহাদের বৈশিষ্ট্য—(১) আকৃতি মঙ্গোলীয়, (২) এখানকার থারুদিগের ভাষার সহিত গয়া জেলার 'মগহী' ভাষা সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়, (৩) দক্ষিণের অ-থারু জাতিদিগকে ইহারা 'বাজী' (অর্থাৎ বৃজি-লিচ্ছবি) এবং তাহাদের দেশকে বজিয়ান বলে, (৪) ইহারা মুরগী ও শূকর দুই-ই খায়। যদিও এখানকার হিন্দুরা মুরগী খাওয়া অত্যন্ত খারাপ মনে করে, (৫) চিতবনিয়া থারুরা বলে তাহারা চিতোরগড় হইতে আসিয়াছে, পশ্চিমভাগের (লুম্বিনীর নিকটে) থারুদের কিংবদন্তী যে তাহারা বনবাসী অযোধ্যার রাজবংশের সন্তান।

"কাল চানকী-গড় দেখিতে যাইব। সেখানে মৌর্য্য বা প্রাক্-মৌর্য্য কালের এক গড় আছে। পরশু রাত্রের গাড়ীতে এখান হইতে নরকটিয়াগঞ্জের পথে রক্সৌল যাত্রা করিব। নেপাল হইতে পত্র দিবার সুযোগ বোধ হয় হইবে না।

"প্রিয় আনন্দ! শেষ নমস্কার করিয়া বিদায় লই। 'কার্য্যং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পতয়েয়ং'—জীবন বড়ই মূল্যবান, সময়ের মূল্য কিছুমাত্র নাই।"

* * * * *

তিন তারিখে শিকারপুর হইতে রক্সৌল, এবং সেই দিনই নেপালের সরকারী রেলে বীরগঞ্জ পৌঁছিলাম।

* * * * *

সূর্য্যোদয়ের সময় রক্সৌল পৌঁছিলাম। ছয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন দেখিয়াছিলাম দলে দলে যাত্রী পদব্রজে বীরগঞ্জ চলিয়াছে। সেখানে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া ডাক্তারকে নাড়ী দেখানো এবং সীমান্তের উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিকট ছাড়পত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি চলিতেছে। এখন ও. টি. রেলের রক্সৌল ষ্টেশনের পাশেই নেপাল রাজ্যের রেলষ্টেশন। যাত্রীদের সেখানে গিয়া ট্রেনে উঠিলেই হয়; ছাড়পত্রের জন্য বহু কর্ম্মচারী মোতায়েন থাকে, সুতরাং কোন ঝঞ্ঝাট নাই এবং ডাক্তারী "নাড়ীটেপানো"র কোন ব্যবস্থাই নাই। বাস্তবিকপক্ষে ঐ ডাক্তারী পরীক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক,।আসল পরীক্ষা হয় চীমাপানী-চন্দাগঢ়ীর চড়াইয়ে—যেখানে সুস্থ সবল লোকেরও হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

আমার এখানে পৌঁছিবার তারিখ বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ জানিতেন। তখনও আমার তিব্বত-প্রবাস আট-দশ বৎসরব্যাপী হইবে বলিয়া ঠিক ছিল—চৌদ্দ মাস পরে যে ফিরিয়া আসিতে হইবে একথা ভাবিও নাই, সুতরাং বন্ধুদের অনেকেই বিদায় গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। রক্সৌল ষ্টেশনে নামিতেই দেখিলাম এক বন্ধু আসিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া নেপালী ষ্টেশনে চলিলাম। ছাডপত্র আগেই লইয়াছিলাম। কিন্তু সোজা অমলেখগঞ্জ যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কেননা জানিতাম বারগঞ্জেও অনেক বন্ধু বিদায়ের জন্য প্রতাক্ষা করিবে এবং ঐখানে যে নেপাল-যাত্রার সঙ্গীও কিছু মিলিবে, তাহাও জানিতাম।

ট্রেনে যাত্রীগাড়ীর অভাবে মালগাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারই একটিতে অতি কষ্টে ঢুকিলাম—এতই ভীড়। বস্তুতঃ রেলযাত্রায় ভ্রমণের অনেক আনন্দ নষ্ট হয়। যখন ভারত সামানার ছোট নদীতে জল লইবার জন্য ইঞ্জিন দাঁড়াইল, তখন ঐ নদীর কূলেই কিছু দূরে রাস্তার উপরের সেই ছোট কুটির দেখিলাম, যেখানে দশ বৎসর পূর্ব্বে এক বৈশাখে ছাড়পত্রের অভাবে যাত্রা স্থগিত করিয়া আমায় কিছুদিন থাকিতে হইয়াছিল। সে-সময় সাধারণ লোকের পক্ষে, শিবরাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে বীরগঞ্জে পৌঁছানও দুরূহ ব্যাপার ছিল। ঐখানে এক তরুণ সাধুর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়িল, তিনি রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক জ্বালামুখী তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু রুশদেশেও যে হিন্দুর "জ্বালা-মাই" তীর্থ থাকিতে পারে বিশ্বাস হয় নাই। পরে জানিলাম যে, রুশ-দেশের বাকু অঞ্চলে সত্য সত্যই ঐরূপ স্থান আছে।

রক্সৌল হইতে বীরগঞ্জ তিন-চার মাইল মাত্র। রেল বীরগঞ্জ বাজারের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ রাস্তাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। ষ্টেশনে নামিয়া অদূরে ধর্ম্মশালা দেখিয়া আকৃতিতেই চিনিয়াছিলাম—অগ্রসর হইলাম। আগেকার দিনে এ-সময়ে এখানে স্থান পাওয়া দায় হইত, কিন্তু রেলের কৃপায় এখানে আর যাত্রী-সমাগম বিশেষ নাই, সুতরাং সহজেই উপরের তলায় একলা থাকিবার মত এক কুঠরী পাইলাম। আজ ফাল্গুনের শুক্লা অষ্টমী (৬ই মার্চ্চ, ১৯২৯) মাত্র, সুতরাং নেপাল পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় হাতে ছিল। ধর্ম্মশালাটি ভাল, কোনও মাড়বাড়ী শেঠের দান—পাকা ঘরবাড়ী, কূপ, রন্ধনশালা, দ্বারের কাছে হালুয়াই, চাল-ডালের দোকান, এমনি সব ব্যবস্থাই আছে, সুতরাং দু-এক দিন এখানে থাকা মনস্থ করিলাম। মুখ-হাত ধুইয়া পুরী ভোজনে মনোনিবেশ করা গেল। ফিরিয়া দেখিলাম, কুঠরিটি এক বরযাত্রী দলের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে। কাজেই অন্য ঘর দেখিতে হইল।

একলা দিন কাটানো ভার। রাত্রি কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। পরদিন মথুরাবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। শুনিলাম, তিনি রাত্রেই আসিয়াছেন। আমার অল্প জ্বর হইয়াছিল। এখানে ভাতের ব্যবস্থা নাই, মথুরাবাবু তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে প্রাত্যহিক ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা ও গল্পের পর দশটার সময় মথুরাবাবু ফিরিয়া গেলেন। এখন আমাকে নেপালযাত্রার সঙ্গী বন্ধুদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

বিকালে একজন আসিলেন, অন্য সঙ্গীদের সম্বন্ধে শুনিলাম একজন অসুস্থ এবং অন্য আর একজন যাত্রা স্থগিত করিয়াছেন। যিনি আসিয়াছেন তাঁহার দৌড় এইখান পর্য্যন্তই। সুতরাং আর প্রতীক্ষা করায় কোন লাভ নাই, একাকীই অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা হউক, ইহাতে নিরাশ হইবার কোনও কারণ দেখিলাম না, কেননা একাকী পথ চলাই তো আমার অভ্যাস। যে বন্ধু আসিয়াছেন তাঁহার এতটুকুর জন্য ছাপরা হইতে এতদূর আসার কষ্ট ভোগ করিতে হইল, কিন্তু উপায় ছিল না, কেননা আমার পাথেয় এবং যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্রই তাঁহার কাছে ছিল।

বন্ধুবরের ইচ্ছা বিকালের গাড়ীতে রক্সৌল ফিরিয়া যাওয়া। আমিও এখানে অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সঙ্গে আবার রক্সৌল চলিলাম, কেননা তাঁহার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকাও হইবে এবং রক্সৌলে গাড়ী চড়াও সহজ হইবে, যাত্রীর যেরূপ ভিড় তাহাতে মাঝ পথে বীরগঞ্জে ওঠা সম্ভব হইবে না। এই ভাবে বন্ধুর সঙ্গে পুনর্ব্বার ভারত-সীমানার এপারে আসিলাম, এবং সেখানে তাঁহার নিকট দীর্ঘকালের বিদায় লইয়া অমলেখগঞ্জের গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ীতে যাত্রা আরামেই হইল, কিন্তু পদব্রজে যাওয়ার আনন্দ তাহাতে ছিল না। সন্ধ্যার সময় গাড়ী ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিল এবং একটু বেশী রাত্রেই অমলেখগঞ্জ পৌঁছিলাম।

তিন

নেপাল রেলওয়ে শেষ লইয়াছে অমলেখগঞ্জে, কালে ভীমফেদী পর্য্যন্ত ইহা পৌঁছিতে পারে, এখন লরী মারফৎ মালপত্র ঐ পর্য্যন্ত যায়। অমলেখগঞ্জ শহরটি নূতন, কিন্তু রেলের কৃপায় দিন দিন ইহার উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটিতেছে। ষ্টেশনে নামিয়া ঠিক করিলাম কোন লরীওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া তাহারই আড্ডায় রাত্রে শুইয়া থাকিব যাহাতে প্রত্যূষে ভীমফেদী রওয়ানা হইয়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চীসাপাণী গঢ়ীর চড়াই অতিক্রম করিতে পারি। ইহা ভাবিয়া এক বাস্‌ওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলাম এবং সে খুব সকালে রওনা হইবে কথা দেওয়ায় তাহার বাস্ গাড়ীতেই শয়ন করিলাম। সকালে দেখিলাম বিপরীত ব্যাপার, চারি দিকে একটির পর একটি লরী হুহু শব্দে চলিয়াছে, কিন্তু আমার বাস্ স্থির ও অচল! কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, যাত্রী বোঝাই না হইলে গাড়ী ছাড়িবে না। কথাটা ঠিক, কিন্তু আমার তাহাতে অসুবিধা। কাজেই মালবাহী এক লরীর শরণাপন্ন হইতে হইল, তাতে ভাড়া কম—মাত্র এক টাকা, সুতরাং যাত্রীও প্রচুর এবং সে কারণে গাড়ী ছাড়িতে দেরি হইল না।

আমার ধারণা ছিল যে এখন লরী হওয়ায় কেহই এই পথে পদব্রজে যাওয়ার নামও করিবে না, কিন্তু পথে দলে দলে যাত্রী দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইল। ইহারা যে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যই হাঁটিয়া চলিয়াছে তাহা নয়, আসল কারণ ঘোর দারিদ্র্য, লরীতে পয়সা খরচ করা ইহাদের নিকট বিলাসিতা। পশুপতিনাথের যাত্রীদের মধ্যে যাহাদের পয়সা আছে এমন অনেকে দূর দেশ হইতে আসে, কিন্তু নিকটস্থ চম্পারণ-আদি জেলার বহু লোক ছাতু মাত্র সম্বল করিয়া রওয়ানা হয়।

লরী কখন্ চুরিয়ামাটির চড়াই উঠিতে আরম্ভ করে তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে এক সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছিতে বুঝিলাম চুরিয়ার চড়াইপর্ব্ব

এই সুড়ঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে। সুড়ঙ্গের পর তরাইয়ের জঙ্গলের পারের পর্ব্বত শ্রেণীর দিকে পথ চলিয়া গিয়াছে। দু-পাশে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সারি, তাহার মাঝে মাঝে কোথাও বা বন কাটিয়া নূতন বসতি নির্ম্মাণ চলিয়াছে, কোথাও বা নূতন স্থাপিত গ্রামের পাশে ছোট ছোট পাহাড়ী গাভী চরিয়া বেড়াইতেছে। পথিকের দল পশুপতিনাথ এবং ভৈরবের গান গাহিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে "একবার বোলো পস্‌পস্‌-নাথ বাবা কী জয়," "গুঞ্জেশ্বরী (গুহ্যেশ্বরী) মাই কী জয়" শব্দে পথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। দেখাদেখি আমার লরীর সহযাত্রীদের মধ্যে ঐ ব্যারাম সংক্রামিত হইল। ফলে আমি কখন যে তিন ঘণ্টার পথ পার হইয়া ভীমফেদীতে উপস্থিত হইলাম তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

ভীমফেদী বাজারের পাশেই "রোপলাইনে"র আড্ডা। মালপত্র অমলেখগঞ্জ হইতে এখানে লরীতে আসে এবং এখানকার রোপলাইনের তারযোগে বিজলীর জোরে কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছায়। ভীমফেদী প্রবেশ করার পূর্ব্বেই সিপাহীর দল ছাড়পত্র দেখিতে আসিল। কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রেহাই পাওয়া গেল। এইবার পায়ে চলিবার পালা। যদিও সঙ্গে বোঝা বিশেষ কিছু ছিল না, তবু দেড় টাকায় এক "ভরিয়া" (ভারি=মুটে) ঠিক করা গেল, পথে রন্ধন-ভোজনের পাটও ইহারা পার করে। আমার জাতিবিচারের কোনই প্রয়োজন নাই, কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে জাতিতে লামা। আমাদের দেশে যেমন বৈরাগী বা সন্ন্যাসী কোন কারণে গৃহী হইলে তাহার সন্তানেরাও নিজেদের বৈরাগী নামে চালায়, সেইরূপ এই দেশে বৌদ্ধভিক্ষু গৃহস্থ হইলে তাহার সন্তানসন্ততি লামা পদবী গ্রহণ করে। লামা, গুরুঙ্গ, তমঙ্গ, আদি জাতিরা নেপাল দূন অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক। ইহাদের ভাষা তিব্বতীয় ভাষারই শাখা, কিন্তু গোর্খা রাজভাষা হওয়ায় তাহারই ব্যবহার প্রচলিত।

চীসাপাণীর চড়াই সামনেই, ভীমফেদাতে ভোজন শেষ করিয়া রওয়ানা হইলাম। চড়াইয়ের আরম্ভের কাছে কুলিদের নাম-ধাম প্রভৃতি সরকারী বিভাগ হইতে লিখিয়া লওয়া হয়। ইহার কারণ অনভিজ্ঞ যাত্রীদের রক্ষা, যাহাতে তাহাদের ঠকাইয়া কুলিরা আশপাশের পাহাড়ে চম্পট না দিতে পারে। চীসাপাণীর চড়াই আর আগেকার মত ভীষণ নাই, নূতন সরকারী রাস্তা বেশ চওড়া আর চড়াইয়ের ঢালও ঢের কম। এইভাবে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে চড়াইয়ের ঢাল ওঠায় এ পথের পূর্ব্ব গৌরবের অর্দ্ধেক লুপ্ত হইয়াছে এবং যদি কালে মোটর চলিতে থাকে তবে বাকী অংশও লুপ্ত হইবে। জিনিষপত্র তো এখনই রোপলাইনে বাহিত হইতেছে, পথে কতবার মাথার উপর লৌহরজ্জুযোগে মালপত্র বহন চলিতেছে দেখিলাম। চীসাপাণী গঢ়ীর উপর পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর হইল,

সেখানে মালপত্র তল্লাসী হয় ; কিন্তু আমার সামান্য জিনিষ যাহা ছিল তাহা তুচ্ছজ্ঞানে কর্ম্মচারী মহাশয় খুলিয়াও দেখিলেন না। একমাত্র দেখিলাম যে আমার বৌদ্ধ ভিক্ষুর পীত বস্ত্র পরিধান ভুল হইয়াছে, এই অঞ্চলে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, উপরন্তু উহা দেখিবামাত্র লোকের সন্দেহ হওয়া সম্ভব।

'ভরিয়া, বলিল আজই চন্দ্রাগঢ়ী পার হওয়া ভাল, আমারও কথাটা ভাল লাগায় অগ্রসর হওয়া গেল। এই প্রদেশে পথের দু-পাশে অনেক গ্রাম, জঙ্গল সে রকম নাই। দেখিতে দেখিতে বেলা তিনটা নাগাদ আগের বারে যে মহিষদহে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম তাহাও ছাড়াইয়া গেলাম। কিন্তু আর ঘণ্টাখানেক পরেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। কোন প্রকারে মনে জোর করিয়া চলিতে লাগিলাম, কুলি তো প্রতি পদেই আগাইয়া যাইতে লাগিল। পথে সারণ জেলার দুই-তিন জন পরিচিত ব্যক্তির দেখা পাইলাম, তাহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়। যাহা হউক, কোনক্রমে 'ম'রেপিটে' চিতলাং পৌঁছিলাম। এইরূপ যাত্রায় সন্ধ্যার আগে চটিতে পৌঁছান উচিত। আমাদের দেরি হওয়ায় স্থান পাওয়া দায় হইল, বহু কষ্টে ছোট একটি কুঠরি পাওয়া গেল, তাহাতেই আমরা পাঁচ জনে আশ্রয় লইলাম। দারুণ পথশ্রান্তির পর শয়নই চরম সুখ, কিন্তু না খাইলে কল্যকার চড়াই অতিক্রম করা যাইবে না, সুতরাং সঙ্গী পাণ্ডেজী ভাত রাঁধিলেন—আমরা ভোজন শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অতি প্রত্যূষেই যাত্রারম্ভ করিলাম। এখন আমার পূর্ব্ব-দিনের সাথীদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, কেননা যদিও তাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তবুও তাঁহারা জানিতেন না আমার এ যাত্রার আসল উদ্দেশ্য কি এবং সেই জন্য তাঁহাদের সঙ্গ বিপজ্জনক। যাহা হউক, চন্দ্রাগঢ়ীর চড়াইয়ে তাঁহারা নিজেরাই বহু পিছনে পড়িলেন, সুতরাং সমস্যা সমাধান সহজেই হইল। চড়াইয়ের পর অতি কঠিন উৎরাই প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু কাছে আসিতেই দেখিলাম এখানেও নূতন রাস্তায় উৎরাইয়ের কায়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সহজেই নীচে পৌঁছিলাম। পথের শেষে মহাপ্রাণীর পোষণের প্রশ্ন। সকলেই নীচের সদাব্রতের মালপোয়ার কথা বলায় আমিও তথাস্তু বলিয়া চলিলাম। দেখিলাম সেখানে অনেক মহাত্মাই আশ্রয় লইয়াছেন, গাঁজার কলিকায় দমের পর দম চলিয়াছে। আমারও সাদর আমন্ত্রণ হইল "আও সন্তজী"। কোন রকমে পাশ কাটাইয়া মালপোয়া লইয়া গন্তব্য পথে চলিলাম। থানকোটে দুধকলাও জুটিল, সুতরাং আজ ভোজনের ব্যবস্থা পরিপাটি। পথে দেখিলাম রোপলাইনের শেষে লরীর সার ষ্টেশন হইতে মাল লইয়া আগে চলিয়াছে। এই রোপলাইনের কথায় আমার 'ভরিয়া' তাহাদের দুঃখের কথা বলিল,

9746

আমার 'ভরিয়া' তাহাদের দুঃখের কথা বলিল, রোপলাইন হওয়ার পূর্ব্বে ভীমফেদী হইতে কাঠমাণ্ডব পর্য্যন্ত মাল বহিয়া তাহার মত হাজার হাজার কুলি-পরিবারের বৎসরকাল অন্নসংস্থান হইত। এখন রোপলাইনে মণ-প্রতি ছয় আনা ভাড়া, কাহার দায় পড়িয়াছে আট গুণ বেশী দিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করে! বস্তুতঃ এই বেচারাদের দিন গুজরানের ব্যবস্থা না করিয়া রোপলাইন নির্ম্মাণ করা বড়ই অবিচার হইয়াছে।

কাঠমাণ্ডব শহর হইয়া দশটার সময় আমি থাপাথলীর বৈরাগীমঠে পৌঁছিলাম। যদিও আগের বারে সপ্তাহকাল থাকার দরুণ মহন্তজীর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, এবং তিনি তাঁহার জন্মস্থান ছাপরার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথাও অবগত হইয়াছিলেন, তবুও ভীড়ের মধ্যে পরিচিত লোকের কথা কত দিন আর মনে থাকে? যাহা হউক তিনি আমার থাকিবার জন্য পরিষ্কার জায়গার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

* * * * *

৬ই মার্চ্চ নেপাল পৌঁছিলাম। সেদিন কোথাও যাওয়া হয় নাই। শিবরাত্রির কয়দিন নেপাল-মহারাজের তরফে থাপাথলীর সমস্ত মঠে যাবতীয় সাধুর জন্য আহার, গাঁজা, তামাক, ধুনীর কাঠ, সব জিনিষই দেওয়া হয়। সাধারণ দিনেও প্রতি মঠে কয়েক হাঁড়ি প্রসাদের—এক হাঁড়ি অর্থে এক জনের ভোজন—বাঁধা ব্যবস্থা আছে। এই দৈনিক হাঁড়ি ও বার্ষিক ভোজের খরচের পয়সা বাঁচাইয়া এখানে মহন্তের দল বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, যদিও বাহিরের চালচলনে তাঁহাদের অতি দরিদ্রই দেখায়। নেপাল দূনের মহন্ত কেন, রাজপরিবার ভিন্ন কেহই নিজ অবস্থানুযায়ী চালচলন রাখে না। এইরূপ আত্মগোপনের কারণ ছদ্ম-শত্রুর ভয়, পাছে কেহ রাজকর্ণে প্রজার ঐশ্বর্য্যের কথা বলে—রাজা বা উচ্চকর্ম্মচারীরা সর্ব্বজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাহাতে গুপ্তধন রক্ষা পায়। আমি নিজে দেখিয়াছি যে বহু নেপালী সাহুকার দেশে নিতান্ত সাধারণভাবে আছেন, অথচ তাঁহাদেরই লাসার বিরাট প্রাসাদ-তুল্য পুরী বহুলক্ষ টাকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ। মহন্তদের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন, তাঁহারা তো নিজেদের বারুদের গাদায় অবস্থিত মনে করেন—কখন কাহার কথায় সর্ব্বনাশ হয়। যাঁহাদের ভয়ের কারণ ভাবেন তাঁহাদের পূজা-অর্ঘ্য দিতে হয়, আবার যে টাকা আত্মসাৎ করেন, তাহাও লুকাইয়া নেপালের বাহিরে রাখা হয়—যাহাতে পদচ্যুতি বা ততোধিক বিপদে প্রাণ বাঁচাইয়া আশ্রয়ের চেষ্টা দেখিতে পারেন। শিবরাত্রির ভোজের তদারকের জন্য রাজকর্ম্মচারীর দল থাকেন, তাঁহাদের দরুণ আসল কাজের কিছুই হয় না, তবে তাঁহারা ঐ সময়ে কিছু গুছাইয়া লইতে পারেন। বস্তুতঃ এই দোষ সে-সব শাসন-প্রথাতেই আছে, যেখানে জনমতের কোনও মূল্য নাই এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই শাসকবর্গ ক্রমেই পার্শ্বচর রক্ষক-ভক্ষকদিগের করতলগত হইয়া পড়েন।

পরদিন বিচার করিয়া দেখিলাম আমার পক্ষে বসিয়া কালক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পথের ব্যবস্থা খোঁজ করায় জানিলাম তিব্বত-সীমান্তের নিকটস্থ মুক্তিনাথ ও গোঁসাইকুণ্ড এই দুই তীর্থস্থানে যাওয়ার অনুমতি চাহিলেই পাওয়া যায়, কিন্তু সরকারী খরচে এবং তদারকে সাধুদিগের যাওয়া-আসার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। এই উপায়ে গেলে আমার কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা কম, সুতরাং স্থির করিলাম সে কার্য্যের জন্য কোন ভোটীয় (তিব্বতী) সাথী সংগ্রহ করিতে হইবে। পশুপতিনাথ-মন্দিরের অল্প দূরেই বোধাস্থান। ইহাকে নেপালের অন্তর্গত তিব্বতের টুকরা বলিলেই চলে। ঠিক কাশীর বাঙালী, মারাঠী বা তৈলঙ্গ মহল্লার মতই ইহার জাতিবৈশিষ্ট্য আছে। সেখানে ভোটীয় সঙ্গীর সন্ধান পাওয়া সম্ভব ভাবিয়া ৭ই মার্চ্চ পশুপতি ও গুহ্যেশ্বরী দর্শন করার পর নদী পার হইয়া বোধায় গেলাম।

বোধা-স্তূপের তিব্বতী নাম ছোর্তন-রিম্পোছে (চৈত্যরত্ন) বা ব-য়ুন ছোর্তন (নেপাল-চৈত্য)। শোনা যায়, প্রথমে ইহা সম্রাট্ অশোক নির্ম্মাণ করেন। এই বিশাল স্তূপের কেন্দ্রে স্বর্ণমণ্ডিত শিখর এবং ইহার পরিক্রমার চারিধারে লোকের বসতি। বাসিন্দা প্রায় সবই ভোটীয়; সে কারণে—বিশেষভাবে শীতকালে—ইহা একেবারে তিব্বতের সামিল বলিয়া বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে যখন এখানে আসিয়াছিলাম তখন এখানকার চীনা প্রধান লামার সহিত আলাপ হইয়াছিল, এবং সেইজন্য আশা করিয়াছিলাম এবার তাঁহার নিকট বিশেষ সাহায্য পাইব। কিন্তু ওখানে গিয়া অতি দুঃখের সহিত শুনিলাম, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্তূপের ভিতর প্রদক্ষিণ করিবার সময় দেখিলাম, বহু ভোটীয় ভিক্ষু পাতলা দেশী কাগজ একের উপর আর এক টুকরা জুড়িতে ব্যস্ত আছেন। আমার ভাঙা ভাঙা ভোটিয়ায় তাঁহাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, উঁহাদের মধ্যে তিব্বত, ভুটান, মায় কাংড়া-কুল্লু (পঞ্জাব) অঞ্চলের লোকও আছেন। কুল্লুর দুইজন ভিক্ষুর মুখে হিন্দী কথা শুনিয়া আমার মন প্রসন্ন হইল। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা একজন বড় লামার শিষ্য। তিনি উচ্চশ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ ও অবতারবিশেষ। এখানে প্রায় দুইমাস তিনি বিরাজ করিতেছেন এবং আরও এক মাস থাকিবেন। ইঁহার জন্ম ডুকৃপা (ভুটান) প্রদেশে, সেইজন্য লোকে ইঁহাকে ডুকৃপা লামা বলে। নেপালের সীমানার নিকট তিব্বতের কোরোং অঞ্চলে এবং অন্যান্য নানা স্থানে ইনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গুরুজী দিবারাত্র যোগাসনে থাকেন, আমরা ত্রিশ-চল্লিশজন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী শিষ্যরূপে তাঁহার সেবায় আছি। উনি বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকের ধর্ম্মার্থ বিতরণের জন্য ছাপাইতেছেন, আমরা তাহারই ছাপা ও কাগজ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি।"

শেষ যেবার লদাখ গিয়াছিলাম, তখন এবং তাহাব পরে লদাখের বড বড় লামাগণ আমায় কতকগুলি পত্র দিয়াছিলেন, সেগুলি আমার সঙ্গে ছিল। সেগুলিতে



আমাব সম্বন্ধে প্রশংসা ও আমার তিব্বতযাত্রাব উদ্দেশ্য বিচার ইত্যাদি অনেক কথা তো ছিলই, উপরন্তু তাহাতে আমাকে সহায়তা করার অনুরোধও স্পষ্ট ভাষায়

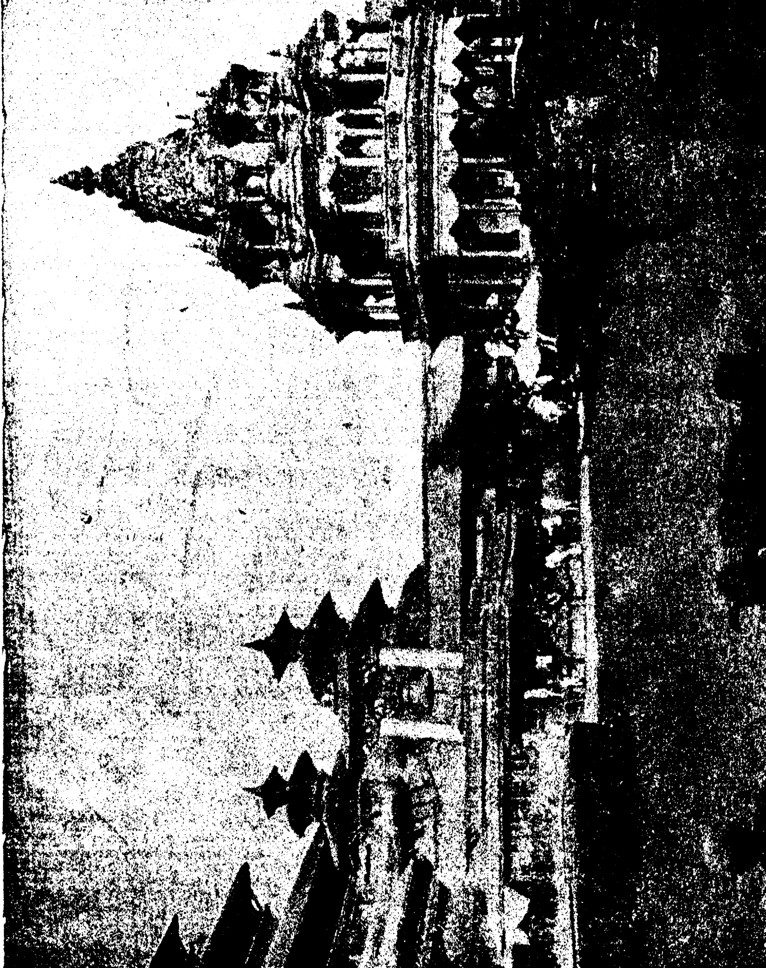
লিখিত ছিল। চিঠিগুলি দেখাইতে অনেক কাজ হইল। কেন না, কুল্লুবাসী ভিক্ষু উহা পড়িয়া আমায় ডুক্‌পা লামার নিকট লইয়া গেলেন এবং তিনি পড়িয়া বলিলেন যে, পত্রলেখকদিগের মধ্যে একজন তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং একই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বৌদ্ধধর্ম্ম আমার জন্মভূমিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমন কি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকও নাই। সেই পুস্তকের জন্য সিংহল গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেও দেখিলাম অনেক বড় বড় আচার্য্য-লিখিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিব্বতে সে সবই রহিয়াছে, সেইজন্য আমি তিব্বতের কোন উচ্চশ্রেণীর গুম্বায় (বিহার) থাকিয়া সে-সকল পুস্তক অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিয়া ভারতে লইয়া গিয়া সংস্কৃত বা অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে চাই। এইরূপে ভারতবাসীদিগের মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও পরিচয় করানো আমার বিশেষ ইচ্ছা, আপনি আমাকে তিব্বতে লইয়া চলুন।"

ডুক্‌পা লামা তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র স্বীকার করায় আমি বুঝিলাম যে, তিনি ভাবিতেছেন, তিব্বতে কোন ভোটীয়কে লইয়া যাওয়া এবং আমাকে লইয়া যাওয়া উভয়ই সমান, বিশেষ কোন বাধা নাই। যাহা হউক, আমি জিনিষপত্র লইয়া আসি বলিয়া থাপাথলী ফিরিলাম—বুঝিলাম, প্রথম অঙ্কে 'কেল্লা ফতে' হইয়াছে।

৮ই মার্চ্চ আমার এক পূর্ব্ব-পরিচিত বৈদ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পাটন গিয়া শুনিলাম, তিনিও এ সংসারে নাই। অন্য কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ সজ্জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম এবং তাঁহারাও আমার ব্যাখ্যা-বিচারে সন্তুষ্ট হইলেন। কোন ব্রাহ্মণের যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি এরূপ আকর্ষণ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কাছে আশ্চর্য্য মনে হইতেছিল। তিব্বত যাওয়া সম্বন্ধে ডুক্‌পা লামার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় তাঁহারাও দেখাইতে পারিলেন না।

পাটন নেপালের প্রধান রাজধানী। ইহার অন্য নাম ললিত-পট্টন বা অশোক-পট্টন। অধিবাসী প্রায় সবই বৌদ্ধ এবং নেবার। শহরের চারিধারে মন্দির-চৈত্যের ছড়াছড়ি। গলির পথে বিছানো ইট, প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচায়ক; পুরানো রাজপ্রাসাদ এখনও দর্শনীয় বস্তু। শহরে নূতন জলের কল বসান হইয়াছে, কিন্তু রাস্তা ও গলির অবস্থা জঘন্য। চারিধারে আবর্জ্জনার মধ্যে শূকরের পাল চরিয়া বেড়াইতেছে। পাটনের প্রাচীন বিহার এখনও পুরানো নামেই প্রসিদ্ধ, এবং এখনও সেখানে ভিক্ষুনামে পরিচিত বহু লোকের বাস। যদিও এই 'গৃহস্থ ভিক্ষু' শ্রেণীর ভিক্ষুভাব আমাদের গৃহস্থ গোঁসাইদের সন্ন্যাসের মত, নাম পর্য্যন্তই বজায় আছে, বিদ্যা বা ত্যাগের সহিত সম্বন্ধ নাই। ঐ দিন পাটনে এক বৌদ্ধ

গৃহস্থের অতিথি হইলাম। আগের বারে এখানকার এক সাহুকারের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। সেবার আমার তিব্বত যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি আমাকে তিব্বত লইয়া যাইতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। এবার আমি স্বয়ং যাইতে উৎসুক, কিন্তু কেহ একটি কথাও বলিলেন না।



পাটন—রাজদরবারস্থল

পাটন হইতে থাপাথলী ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল সেই দিনই ঐ স্থান ত্যাগ করি, কিন্তু বিপদ করিল আমার সিংহলী চীবরবস্ত্রের মোট। সেটি না থাকিলে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিতাম, কিন্তু এ অবস্থায় উহা কেহ দেখিয়া ফেলিলে সন্দেহ

করিবে, সেইজন্য উহা এক নেবার-সজ্জনের কাছে রাখার ব্যবস্থা করিলাম। তাঁহাকে দূরে দাঁড় করাইয়া জিনিষ আনিতে গিয়া দেখিলাম, সেখানে অন্য লোক রহিয়াছে, সুতরাং মালপত্র সরান সন্দেহজনক হইবে। এই কারণে সেদিন কিছু করা গেল না, এবং সেরাত্রি ওখানেই কাটাইতে হইল। এই চীবর আনা বিশেষ নির্ব্বদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল। আমার অবস্থায় যদি কেহ পড়েন, তবে তাঁহাকে আমি উপদেশ দিই যে, এই প্রকার কোন দ্রব্য যেন তিনি সঙ্গে না রাখেন।

৯ই মার্চ্চ শনিবার মহাশিবরাত্রি। সেদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সযত্নে কম্বল চীবর ইত্যাদির গাঁটরি এমনভাবে বাঁধিলাম যাহাতে কেহ সন্দেহ না করে যে বিদায়ের পূর্ব্বেই কেন আমি শয্যাদ্রব্য উঠাইয়াছি। বাহির হইয়া প্রথমে বাগমতীর পুলের নীচে থেকে উপরের দিকে চলিলাম, পরে হঠাৎ ঘুরিয়া পশুপতিনাথের দিকে মোড় ফিরিলাম। পশুপতিনাথ পৌঁছিতে সূর্যোদয় হইল। একে মাঘ-ফাল্গুন মাস, তাহার উপর নেপালের তীব্র শীত, তবুও হাজার হাজার শ্রদ্ধালু তীর্থকামী স্নান করিতেছে দেখিলাম। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ইহাদের অধিকাংশই উত্তর বিহারের অধিবাসী। অপেক্ষাকৃত অল্পাংশ পূর্ব্ব-সংযুক্ত প্রান্তের, অবশিষ্টাংশে ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলের লোকই আছে। আমার আজ স্নান কিম্বা বাবা পশুপতিনাথ-দর্শন কোনটারই সময় ছিল না। পুল পার হইয়া গুহ্যেশ্বরী গেলাম ও সেখানে নদী পার হইলাম।

সকাল থাকিতেই বোধায় পৌঁছিলাম। কুম্বুর ভিক্ষু রিঞ্চেনের সঙ্গে ডুকৃপা লামার কাছে গেলাম। তিনি আমার সিংহলী ভিক্ষু-বস্ত্র দেখিলেন, কি ভাবে পরিতে হয় জিজ্ঞাসা করায় তাহাও দেখাইলাম। পরে রিঞ্চেন ও তাহার সাথী ছবং যে গৃহে ছিল সেখানে গিয়া ভাত খাইয়া প্রাতরাশ সমাপ্ত করিলাম। রিঞ্চেনকে বলিলাম, অতঃপর আমার আহার-বিহার-বসন সমস্তই ভোটীয় আচারসঙ্গত করিতে হইবে, নহিলে পরে দুঃখ অনিবার্য। আমার পরণে এখনও সেই কালো চোগা ছিল, যাহা অন্যের সন্দেহ এবং আমার বিপদের কারণ হইতে পারে, তাহার বদলে ভোটীয় ছুপা (লম্বা কোট) ও তিব্বতী জুতা যোগাড় করার কথা রিঞ্চেনকে বলিলাম। ছুপা সাত-আট টাকা মূল্যে পাওয়া গেল, কিন্তু জুতা তখনই পাইলাম না। যাহা হউক, ছুপা পরিবার পরে সহজে কেহ আমাকে 'মধেসিয়া' (মধ্যদেশের লোক) বলিয়া চিনিতে পারিত না। রিঞ্চেনের ঘরেই থাকিলাম। তাহারা দুইজন সারাদিন ছাপার কাজে ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু মাঝে মাঝে আসিয়া আমার খবরাখবর লইত। পরদিন ছুপা পরিয়া ডুকৃপা লামার কাছে গেলাম। ইঁহার আসল নাম গেশে শেব্‌র-দোর্জে (অধ্যাপক প্রজ্ঞাবজ্র)। তিব্বতে গেশে (অধ্যাপক) উপাধি বিদ্বান্ ভিক্ষুমাত্রেরই প্রাপ্য। ইঁহার বয়ঃক্রম এখন ষাট বৎসর। তিব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব

সীমাপ্রান্তকে খাম বলে। ইঁহার বিদ্যাভ্যাস খাম এবং তিব্বতের অন্যান্য নানা স্থানে হয়। তাহার মধ্যে তান্ত্রিক-ক্রিয়া শিক্ষা তিব্বতের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক লামা শাক্যশ্রীর নিকট হইয়াছিল। শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ইনি নিজ দেশে (ভুটানে) ফিরিয়া রাজ-সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেখানে শান্তি না পাওয়ায় ইনি তিব্বতে ফিরিয়া নেপাল-সীমান্তের নিকট কে-রোং নামক স্থানে থাকিয়া বহুদিন পূজাপাঠ তন্ত্রমন্ত্রসাধন ইত্যাদিতে যাপন করেন। তিব্বতে ও নেপালে তন্ত্রমন্ত্র না জানিলে সম্মান পাওয়া যায় না। ইনি বিদ্বান্, উপরন্তু তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, ভূতপ্রেত বিতাড়ন ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং গেশে শেব র-দোর্জের চতুষ্পার্শ্বে ধীরে ধীরে বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর সমাবেশ হইল। ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দেব সহিত কিরূপে চলিতে হয় তাহা ইনি ভালই জানিতেন। ফলে কে-রোংস্থিত পুবাণো অবলোকিতেশ্বরের মন্দির মেরামত ও সশিষ্য লামাব থাকিবার জন্য মঠ নির্ম্মাণও হইল এবং চতুর্দ্দিকে ইঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বাড়িল। মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণে নেপালের বৌদ্ধগণ অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সে কারণে ডুকৃপা লামা নামে ইনি দুই দেশেই খ্যাতিলাভ করেন।

কুল্লুর ভিক্ষুদ্বয় তাঁহাদের গুরুর অনেক অলৌকিক শক্তির কথা আমাকে বলেন। তাঁহার ধ্যানসমাধি প্রথম কয়দিন আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল। দেখিতাম, তিনি ধর্ম্মপাঠ বা শিষ্যভক্তবৃন্দের সহিত ব্যাক্যালাপের মধ্যেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুকাল ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আমি প্রথমে ভাবিতাম এই জীবন্মুক্ত পুরুষ বুঝিবা এইভাবে মাঝে মাঝে বাহিরের জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্তর্লোকে প্রবেশ করেন। ভাবিলাম আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন, কোথায় চলিয়াছি শুষ্ক মসীলিপ্ত কাগজের সন্ধানে, পথে এইরূপ রত্নাকর লাভ! কিন্তু আমার মত দুর্ভাগা তার্কিকের শুষ্ক ন্যায়-বিচারে এ ভক্তিভাব বেশীদিন টিকিল না। অল্পদিন সঙ্গে থাকিতেই বুঝিলাম, ইহা সমাধি নহে—নিদ্রাবেশ মাত্র। ইঁহারা রাত্রে শয়ন ও নিদ্রায় অতি অল্প সময় যাপন করেন, সুতরাং এইরূপ বসিয়া বসিয়া ক্ষণিক তন্দ্রার অভ্যাস হইয়া যায়। পরে ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার মত জ্ঞানমার্গব্রতীও যদি তিন চার দিনে এইরূপে ইঁহার প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যায়, তবে সাধারণ ভক্ত না জানি কিরূপ বশ হয়। নেপালী ভক্তের ভিড় সর্ব্বদাই দেখিতাম। কেহ দণ্ডবৎ করিয়া সাধ্যমত মিছরি, ফল ও মুদ্রা নিবেদন করিত, কেহ-বা সুখ-দুঃখের কথা এবং ভবিষ্যতের বিষয় প্রশ্ন করিত। ইনি পাশাক্ষেপ করিয়া-ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করিতেন, কাহারও বিঘ্ননাশের জন্য মন্ত্রপূত যন্ত্র-কবচাদি দিতেন, কাহাকেও বা অল্প পূজাপাঠের ব্যবস্থা দিতেন।

তিব্বতী ভাষা অভ্যাসের জন্য অন্য শিষ্যবর্গের সঙ্গে এক জায়গায় থাকিবার ব্যবস্থা আমি দু-চার দিনের মধ্যেই করিয়াছিলাম, কিন্তু যতটা সুবিধা হইবে ভাবিয়া-

ছিলাম কার্য্যতঃ ততটা হইল না। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দল সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই উঠিয়া পুস্তক ছাপিবার স্থলে চলিয়া যাইতেন। ছাপিবার কোন প্রেস ছিল না, কাপড়-ছাপা তক্তির মত কাষ্ঠফলকের দুই পৃষ্ঠে পুস্তকের অংশ খোদিত থাকে, সেই ফলকে মসীলেপন করিয়া কাগজ আঁটিয়া ছোট বেলন চালাইয়া মুদ্রণকার্য্য সম্পাদিত হইত। ইহাই এদেশের প্রথা। ডুক্‌পা লামা ঐভাবে মুদ্রিত সহস্রাধিক খণ্ড 'বজ্রচ্ছেদিকা' বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন, এবং এখন দশ হাজার খণ্ড বিতরণের জন্য ছাপাইতেছেন।

তিব্বতী পোষাক-পরা বা অল্পস্বল্প ভোটিয়া ভাষায় কথা বলা অভ্যাস হওয়া সত্ত্বেও আমার আত্মবিশ্বাস জন্মিতে অনেক দিন লাগিল। তখন মনে হইত, এই বুঝি বা আমার চেহারার পার্থক্য দেখিয়া কেহ ধরিয়া ফেলে যে আমি ছদ্মবেশী ভারতীয়। বস্তুতঃ এইরূপ ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। আমার সঙ্গী কুলু অঞ্চলের ভিক্ষু রিঞ্চেনের চেহারাও মোটেই ভোটীয়সদৃশ ছিল না। কিন্তু আমার মত অবস্থায় লোকের মনে ভয় ও সন্দেহের আতিশয্য হইয়াই থাকে, এবং সেই কারণে এই পথের বিপদ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত শোনাকথা ধ্রুবসত্য বলিয়া মনে হয়। আসলে কিছু ভাষাজ্ঞান এবং তিব্বতী পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন মোটামুটি ঠিকমত হইলেই যথেষ্ট, কাহার এত দায় পড়িয়াছে যে সে অযথা সূক্ষ্মভাবে তোমার জাতি পরীক্ষা করিতে আসিবে? আমি কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে সারা মার্চ্চ মাস প্রায় কয়েদীর মতই ছিলাম। দিনে তো বাহির হইতামই না, রাত্রেও নিত্যকৃত্য ব্যাপার ভিন্ন এক-আধবার মাত্র চৈত্য-পরিক্রমায় যাইতাম। এই সময় হেণ্ডার্সনের 'তিবেতন্-ম্যানুয়েল' পড়িয়া তিব্বতী ভাষা অভ্যাস করিতেছিলাম, কিন্তু উচ্চারণ-শিক্ষায় টের পাইলাম যে, এই পুস্তকে লাসার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ব্যবহৃত হয় নাই, হইয়াছে টশীলুম্পোর নিকটস্থ চাং প্রদেশের। এই বিষয়ে সর্ চার্লস বেলের পুস্তক শ্রেষ্ঠ, কেন-না তাহাতে লাসার উচ্চারণ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ডুক্‌পা লামা উপদেশ ব্যাখ্যানে যোগ-সমাধির কথা বাদ দিয়া কেবলি মন্ত্রতন্ত্রের কথা বলিতেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের সীমা কতদূর তাহা অল্পদিনেই বুঝিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে তিব্বতের সীমানার মধ্যে যাইতে হইলে কাহারও সঙ্গ লইতেই হইবে এবং সে হিসাবে ইঁহার আশ্রয় পাওয়া আমার সৌভাগ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি! কিছুকাল পরে যখন কাশীর পণ্ডিতের খোঁজে অনেক নেপালী আমার আশেপাশে ঘুরিতে লাগিল, তখন আমি আবার চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। আমার ইচ্ছা যতশীঘ্র সম্ভব ঐ স্থান ত্যাগ করা, কিন্তু লামার পুস্তক ছাপা শেষ হয় নাই এবং গ্রীষ্মের আতিশয্যে শিষ্যবর্গ তখনও ক্লিষ্ট হয় নাই, সুতরাং তিনি যাইবার কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করিলেন না। অন্যদিকে আমার উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ছিল। যেদিন তিনি

আমাকে করুণাময়ের পূজাবিধি সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে স্বীকার: পাইলেন সেদিন রিঞ্চেন আমাকে বলিয়াছিল যে, গুরুজী আমার উপর বিশেষ প্রসন্ন, নহিলে এত শীঘ্র আমাকে এ রহস্যের পরিচয় প্রদান করিতেন না। রিঞ্চেন জানিত না যে, যে-ব্যক্তি করুণাময় (অবলোকিতেশ্বর) নাম পর্য্যন্ত কল্পিত বলিয়াই জানে, তাহার নিকট ঐ রত্নের মূল্য কি! নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় দিতেও আমার ভয় ছিল। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারে এবং যখন পাটন ও কাঠমাণ্ডব হইতে লোকে আমার উপদেশ শুনিতে আসিত, তখন আমি বিশেষ সঙ্কোচের মধ্যে পড়িতাম। কি করিয়া বলি যে আমি পুরুষোত্তম বুদ্ধের উপাসক, তোমাদের অলৌকিক বুদ্ধে আমার বিশ্বাস নাই।



কাঠমাণ্ডবের পথে

২৭শে মার্চ্চ পুস্তক ছাপা শেষ হইয়া গেল। এদিকে চৈত্রের গরমে ভোটীয়দিগের কয়েকজন কষ্ট পাইতে লাগিল। এই সকল কারণে গুরু স্থির করিলেন যে, দু-চারদিন স্বয়ম্ভূতে থাকিয়া যল্মো যাত্রা করিবেন। যল্মোর পর তাঁহার শেষ জীবন লব্‌চীকী গুহায় যাপন করা স্থির ছিল। আমি নেপাল-সীমা পার হইলেও ভোটীয়দের বসতি যল্মোতে যাইতে পারিব এই খবরেই খুশী হইলাম, কেন-না সেখানে ধরাপড়ার ভয় কম। আমি বোধা পৌঁছানর পর হইতেই পাকা ভোটীয় হইবার চেষ্টায় ছিলাম, স্নান করা পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল; কিন্তু তাহাতে প্রথমে পিসুস্থর উৎপাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

৩১শে মার্চ্চ আমাদের দল বোধা ছাড়িয়া কিন্দু চলিল, এতদিন পরে আমি আবার পথে বাহির হইলাম। কাঠমাণ্ডব পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভোটীয়া জুতায় পা কাটিয়া গেল, কিন্তু আমি ভয়ের চোটে তাহা খুলিতে পারিলাম না, পাছে আমার ভোটীয়ত্ব ঘুচিয়া যায়—যদিও সঙ্গী খাঁটি ভোটীয়দের অধিকাংশই নগ্নপদে ছিলেন—

মনে পাপ থাকার এতই বিপদ। কাঠমাণ্ডুবের লোকে তিব্বতী এতই দেখে যে তাহারা ভোটীয় দলের দিকে দৃক্‌পাতও করে কিনা সন্দেহ, অথচ আমার প্রতিপদেই সন্দেহ হইতেছিল যে, সকলেই আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। জনৈক পরিচিত নেপালী গৃহস্থ কয়েকবার আমাকে আগ্রহপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ১লা



কাঠমাণ্ডবেব পথে—কুলিব দল গুরুভাব যন্ত্র লইযা চলিযাছে

ও ২রা এপ্রিল তাঁহাব গৃহে কাটাইলাম। ইনি লোক বড ভাল ছিলেন। যদিও ইনি জানিতেন যে, তিনি ছদ্মবেশী ভাবতীয়কে আশ্রয় দিয়াছেন এ-কথা নেপালবাজের কর্ণগোচব হইলে তাঁহাব কঠোব দণ্ড অব্যর্থ—আমার উদ্দেশ্য সৎ বা তাঁহার আচরণ ধর্ম্মসঙ্গত ইহাব বিচাব হইবে না—তবুও আমাকে আমন্ত্রণ ও আশ্রয়দানে দ্বিধা করেন নাই। চতুর্থ দিনে আমি কাঠমাণ্ডব হইতে স্বয়ম্ভূ পৌঁছিলাম।

ভারতের সহিত প্রাচীন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নেপালের উর্ব্বর উপত্যকায় কাঠমাণ্ডব, পাটন ও ভাতগাঁও—এই তিনটি শহব ও বহু গ্রাম আছে। কিংবদন্তী আছে যে, পাটন—প্রাচীন ললিতপট্টন বা অশোকপট্টন—মহাবাজ অশোক স্থাপিত এবং তাঁহার সময়ে ইহা মৌর্য্য-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নেপালের অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'স্বয়ম্ভূপুরাণে' সম্রাট অশোকের নেপালযাত্রার বিবরণও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্বে

বীরগঞ্জের পথে নেপাল আসা প্রশস্ত ছিল না। ভারত হইতে ভিখনা টোরী-পোখরা হইয়াই লোকে নেপাল আসিত।

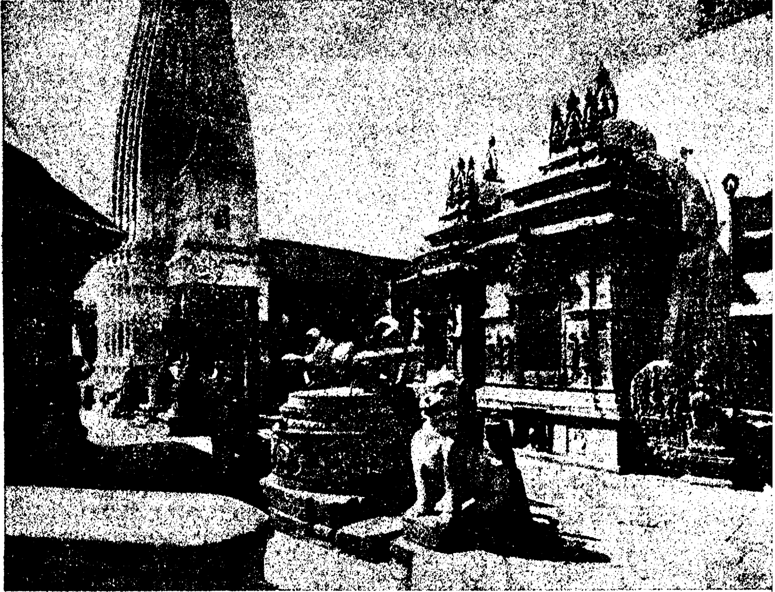


কাঠমাণ্ডব—সিংহ দরবার, মহারাজের প্রাসাদ

ভারত ও নেপালের সম্বন্ধ প্রাচীন হইলেও, নেপালের নেওয়ারী (নেবারী = নেপালী) ভাষা আর্য্যভাষা নয়, যদিও কালে ইহাতে বহু সংস্কৃত ও সংস্কৃত-অপভ্রংশ শব্দ গৃহীত হইয়াছে। ইহা বর্ম্মা ও তিব্বতী ভাষার বংশজ। প্রাচীনকাল হইতেই মধ্যদেশের সহিত এদেশের সংযোগ ছিল ও বিভিন্ন সময়ে বহু সহস্র মধ্যদেশীয় নিজ দেশ ছাড়িয়া এখানে বসতি করিয়াছে। কিন্তু মনে হয় না যে কখনও তাহারা একসঙ্গে অধিক সংখ্যায় আসিয়াছিল, কেন-না তাহা হইলে এদেশে তাহাদের ভাষার পৃথক অস্তিত্ব থাকিত। আজ যদিও নেবারদিগের মুখমণ্ডলে মঙ্গোলজাতির ছাপ বিশেষভাবে নাই, কিন্তু ইহাদের ভাষা দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তর দেশের সহিত অধিক সম্পর্ক প্রকাশ করে। সপ্তম শতাব্দীতে, যখন উত্তর-ভারতে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের শাসন ছিল, নেপাল তিব্বতীয় রাষ্ট্রপতি স্রোং-চেন-গেম্বোর আধিপত্য স্বীকার করিত। মুসলমান রাজত্বের সময় ভারত হইতে পলাতক রাজবংশধরগণ কখনো কখনো নেপাল শাসন করিয়াছেন।

নেপাল উপত্যকা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র প্রদেশ। তাহার উপর সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তে রাজা যক্ষমল যখন তাঁহার রাজ্য নিজ পুত্রগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিলেন, তখন নেপাল নিতান্তই হীনবল হইয়া পড়িল। ঐ সময় হইতে কাঠমাণ্ডব, পাটন ও ভাতগাঁও এই তিন নগরে তিনজন রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে পশ্চিম

অঞ্চলে শিশোদীয়া-বংশ নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়া গোর্খা প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গোর্খাদের ঐ বংশের দশম রাজা পৃথ্বীনারায়ণ বিশেষ মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নেপালের এই দুর্ব্বল অবস্থার সুযোগ লইয়া ২১শে ডিসেম্বর ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাঠমাণ্ডুর দখল করেন এবং সেই সময় হইতে নেপাল গোর্খা-বংশের করতলগত হয়। আশ্চর্য্য এই যে, নেপাল যদিও প্রথমে বহু শতাব্দী যাবৎ বৌদ্ধ শাসকের হস্তেই



স্বয়ম্ভূনাথ—বজ্রপ্রতীক

ছিল এবং গোর্খা-রাজা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মানুগত, তাহা হইলেও এদেশে কখনও ধর্ম্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার হয় নাই। মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ হইতে মহারাজ রাজেন্দ্র-বিক্রমশাহের সময় পর্য্যন্ত নেপালের শাসনসূত্র গোর্খা ঠকুরী ক্ষত্রিয় রাজবংশের হস্তেই ছিল, কিন্তু ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরের বিপ্লবে এক নূতন শাসনরীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা এখনও বর্ত্তমান। এই বিপ্লবের ফলে দেশের শাসনবল্গা মহারাজ জঙ্গবাহাদুর হস্তগত করেন। যদিও তিনি নিজেকে মহামন্ত্রী নামে অভিহিত করেন, তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পৃথ্বীনারায়ণ বংশ নামমাত্র নেপালের অধিরাজ (মহারাজাধিরাজ), বাস্তবপক্ষে মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের রাণা-বংশই রাষ্ট্রপতি।

মহারাজ জঙ্গবাহাদুর নিজের ভ্রাতাদের সাহায্যেই এই বিপ্লবে সাফল্যলাভ করেন, সুতরাং উত্তরাধিকার-বিষয়ে ভ্রাতাদিগের কথা তাঁহাকে ভাবিতে হয়। তিনি নিয়ম করেন যে, মহামন্ত্রীর (যাঁহাকে 'তিন সরকার'=শ্রী ৩, এবং মহারাজ আখ্যাও দেওয়া হয়) আসন শূন্য হইলে জীবিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই পদে আসীন হইবেন। ভায়েদের পালা শেষ হইলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের (পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র) মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই পদ পাইবেন। মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের পর তাঁহার ভ্রাতা উদীপসিংহ 'তিন সবকার' পদ লাভ করেন (১৮৭৭-৮৫ খ্রীঃ), কিন্তু জঙ্গবাহাদুরেব পুত্রগণের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে ভারতে পলায়ন করিতে হয়। উদীপসিংহের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বীরশমশেব পিতৃব্যকে গুলি করিয়া গদী দখল করেন (১৮৮৫-১৯০১ খ্রীঃ)। তাঁহার পর দেবশমশের কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া ভারতে পলায়ন করিলে মহারাজ চন্দ্রশমশের (১৯০১-১৯২৯ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তাহার পরের কথা তো আধুনিক ইতিহাস।



মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথ্বীনারায়ণেব বংশ এখন নেপালের অধিবাজ, কিন্তু বাজশক্তি সম্পূর্ণই প্রধান মন্ত্রাব আয়ত্তে, শাসনতন্ত্র ভাঙাগড়াব একবিন্দু অধিকারও অধিরাজেব হস্তে নাই। মন্ত্রিপদ শূন্য হইলে বাণাবংশের পববর্ত্তী জ্যেষ্ঠ-পুরুষ স্বভাবতঃই সেই পদে আসীন হয়েথাকেন। প্রধান মন্ত্রীর নীচে চীফ সাহেব (কমাণ্ডর-ইন-চীফ), পরে লাটসাহেব (ফৌজী লাট), তাহার নীচে রাজ্যের চারিজন জেনারেলের পদ এবং অন্যান্য উচ্চপদ সকলই ঐ বংশের অধিকারে আছে। মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের ভ্রাতৃবংশে জন্মিত প্রত্যেক শিশুরই নেপালের প্রধান মন্ত্রী হইবার আশা আছে, কিন্তু

ইহাদের সংখ্যা শতাধিক হওয়ায় সে আশা পূর্ণ হওয়া এখন কঠিন, এবং ইহাই ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি বিনাশের কারণ হইবে।

নেপালের শাসনপ্রথাকে সামরিক শাসন বলিলেই চলে। রাণাবংশে পুত্র জন্মিবামাত্রই 'জেনারেল' অর্থাৎ সেনাপতি হয়, (যদিও মহারাজ চন্দ্রশমশের এই প্রথায় অনেক বাধা দিয়াছিলেন) এবং পরে বয়ঃক্রম অনুসারে ও বংশ-সম্পর্কের সুপারিশে উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হইতে পারে, যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক। যুদ্ধবিদ্যার ক-খ জ্ঞানশূন্য হইয়াও এইরূপে সহস্র সৈনিকের অধ্যক্ষ 'জর্ণৈল' হইতে পারা যায়। এইজন্য উচ্চ আশা ও অভিলাষ পোষণ করায় ইহাদের চালচলন অবস্থা অনুসারে না হইয়া বংশগৌরব অনুযায়ী হয়; তাহাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি বা পরিশ্রম দ্বারা দেশের কোন উন্নতি করার যোগ্যতা না থাকিলেও রাজাকেও এই বিরাট পরিবারের সকল ব্যক্তিকেই পোষণ করিতে হয়। বহু বিবাহের কারণে এখনই এই বংশের পুরুষের সংখ্যা দুই শতের কাছাকাছি হইয়াছে, এবং ঐ প্রথা থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই সহস্রের কোঠায় পৌঁছিবে। যদিও মহারাজ চন্দ্রশমশের নিজের পুত্রগণের শিক্ষার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং যদিও তাঁহার অন্য কয়েকটি ভ্রাতাও অনুরূপ পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি এই শত শত 'জর্ণৈল'-দিগের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়।



রাণা জঙ্গবাহাদুর

নেপালের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার মূল কারণ না জানায় অনেক হিন্দু উহার সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে নেপালে সাধারণ প্রজার অধিকার ভারতের অপকৃষ্টতম দেশীয় রাজ্যের প্রজার অপেক্ষা কম, এবং ঐ কারণে রাষ্ট্রশক্তির

বা উন্নতির স্রোত তাহাদের নিকট রুদ্ধ। যে 'তিন-সরকারের' শাসনের উপর তাহাদের আশা-ভরসা সেই পদের অধিকারীবৃন্দের অধিকাংশই শিক্ষাদীক্ষায় ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদের অনুপযুক্ত এবং রাজসিক চালচলনের জন্য অমিতব্যয়ী হওয়ায় শোচনীয় রূপে আর্থিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আমি দুই-চার জনের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি ঐ বংশের সমষ্টির কথা, যাহার অন্তর্গত প্রত্যেক পুরুষেরই জীবিত থাকিলে একদিন ঐ উচ্চতম পদলাভের সম্ভাবনা আছে—সমষ্টির কথা বলার কারণ এই যে, এইরূপ ব্যাপারে গড়পড়তা যাচাই একমাত্র বিচারের পথ।

অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগতশাসনে শাসকের জীবন সর্ব্বদাই বিপদসঙ্কুল হয়, নেপালের সেই অবস্থা। প্রবাদ আছে, "নেপালের তিন-সরকারীর মূল্য এক গুলি, যাহাদ্বারা মহারাজ জঙ্গবাহাদুর উহা ক্রয় করেন।" গুলি হইতে রক্ষা পাইলেও সেইরূপ ষড়যন্ত্রের ভয় বরাবরই আছে, যাহার ফলে দেবশমশের কয়েক মাসের মধ্যেই দেশ হইতে বিতাড়িত হন। এইরূপ অবস্থায় তিন-সরকার পদ লাভ করিলেও ক্ষণেকের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নহে, সদাই কুচক্রীর ষডযন্ত্রের ভয় থাকে এবং সেইজন্য নিজ সন্তানসন্ততির জন্য যতদূর সম্ভব ধন-সংগ্রহ এবং তাহা দেশের বাহিরে সুরক্ষার জন্য বিদেশী ব্যাঙ্কে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহাতে চক্রান্তের ফলে পদচ্যুতির সঙ্গে পরিবারের সমস্ত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত না হয়। ইহার ফলে দেশের ধনবল ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় উন্নতির পথে বিষম বাধা জন্মায়।

চার

জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে 'তিন-সরকারী' আসনের উমেদারের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং এই কারণে সুদিনের আশাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। যদি রাণা-বংশের সন্তানদিগের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দেশ-বিদেশে পাঠানো হইত, যদি নেপাল-সরকার বিদেশে বিভিন্নস্থানে রাজদূত প্রেরণ করিত*, তবে হয়ত বেকার রাণাবংশজদিগের শিক্ষা ও কার্য্য দুয়েরই সংস্থান হওয়ায় দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও ইঁহাদের অধিকাংশই

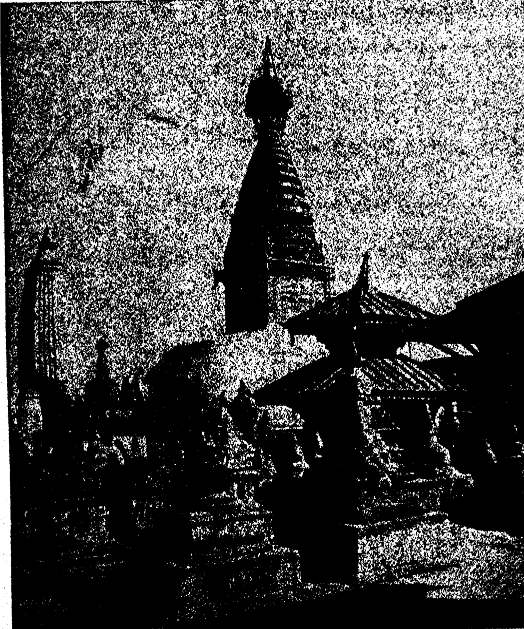
* এখন ইহার চেষ্টা হইতেছে।

বিদেশী বিলাস-ব্যসন গ্রহণে ইচ্ছুক, কিন্তু বিদ্যার্থে বিদেশযাত্রায় কাহারও বিশেষ অনুরাগ নাই। কবে যে ইঁহাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ছাড়িয়া সুবুদ্ধি আসিবে জানি না—হয়ত আসিবে তখন, যখন 'টুনটুনিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে'র অবস্থায় দাঁড়াইবে।

নেপালের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার বিরোধীপক্ষের সন্তোষপ্রদ হইতে পারে, মিত্র পক্ষের নহে। প্রজাগণ শক্তিশূন্য, সিংহাসনাধিপতি অধিরাজ রাজ্যাধিকারশূন্য এবং 'তিন সরকার' আত্মীয়স্বজনের চক্রান্তে দুর্ব্বল ; সুতরাং দেশ সমরপটু জনবৃন্দে পরিপূর্ণ হইলেও রাষ্ট্রের শক্তি কোথায় ? দেশে যদিও মুড়িমুড়কির ন্যায় 'কর্ণেল' 'জর্ণেল'-এর ছড়াছড়ি, কিন্তু দেশকে শক্তিমান করিবার শিক্ষাদীক্ষাই বা ইঁহাদের কোথায় ?

* * * * *

স্বয়ম্ভুর নিকটেই কিন্দুতে সম্প্রতি নূতন বিহার স্থাপিত হইয়াছে। ডুকৃপা লামা এখানে কিছুদিন থাকিবেন। আমি ৩রা এপ্রিলের রাত্রে এখান পৌঁছিলাম। লামা তাঁহার পাশেই আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু আমি সেই রাত্রেই বুঝিলাম যে, সেখানে যেরূপ সকল সময়েই শত শত লোকের যাতায়াত তাহাতে আমার স্থানান্তরে থাকাই শ্রেয়ঃ। ইহাও শুনিলাম যে, অন্য একজন তিব্বতযাত্রী সন্ন্যাসীও এখানে আসিয়াছেন এবং তিনি লামার কাছে আসিলে পরে তাঁহাকে আমার কথা বলা হইয়াছে।



স্বয়ম্ভুনাথ—ভিতরের দৃশ্য

পরে আরও জানিতে পারিলাম যে, তিনি আমার খোঁজে ফিরিয়া গিয়াছেন। আমি শুনিয়া প্রমাদ গণিলাম, তিনি তো রাজার অনুমতিতে, রাজসাহায্যে আসিয়াছেন,

তাঁহার ভয় কি, কিন্তু যদি তাঁহার মারফৎ আমার কথা বেশী দূর পৌঁছায় তবে এত চেষ্টা ও পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হইয়া আমার আবার রক্সৌল-পারেই যাত্রা শেষ হইবে।

সেই রাত্রেই স্থির করিলাম, আমি অন্য কোথাও কোন নির্জ্জন জায়গায় থাকিব। অদৃষ্ট প্রসন্ন, এক সজ্জনের সহায়তায় একটি খালি বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা হইল। সারাদিন সেখানে এক কুঠরিতে থাকিতাম, রাত্রে নিত্যকৃত্যের জন্য বাহিরে যাইতে হইত। হাজারিবাগে দুই বৎসর কারাবাসের ফলে কুঠরিতে আবদ্ধ থাকায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এই নির্জ্জনবাস যেন আরও কঠিন মনে হইত। উপরন্তু কেবলই ভয় হইত, এই অজ্ঞাতবাস প্রকাশ না হইয়া যায়।

এদিকে ডুক্‌পা লামা যাইবার নামও করেন না। কথা ছিল দু-চার দিন মাত্র থাকার, কিন্তু পূজা-ভেট যথেষ্ট পরিমাণে পড়ায় তিনি যাইবার কথা স্থগিত রাখিয়াছেন। আবার আমার নির্জ্জন আশ্রয়েও দু-চারজন লোক যাতায়াত আরম্ভ করায় আমার শঙ্কা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ডুক্‌পা লামার যল্মো গ্রামে গিয়া কিছুদিন থাকিবার কথা ছিল। স্থির করিলাম আমি আগে গিয়া সেইখানেই অপেক্ষা করিব।

আমার নূতন বন্ধু অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন যল্মোবাসী যোগাড় করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি নিজেই আমায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন, এবং সেই মত ৮ই এপ্রিল অন্ধকার থাকিতে আমাদের যাত্রারম্ভ হইল। স্বয়ম্ভুদর্শন পূর্ব্বেকার নেপাল- যাত্রাতেই হইয়াছিল। নেপালের ইহাই শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধতীর্থ, ইহার যুগল মন্দির চন্দ্রাগড়ী হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা কাঠমাণ্ডবের বাহিরে ক্ষুদ্র টিলার উপর স্থিত। বর্তমান মন্দির অট্টালিকা কোনটাই স্বয়ম্ভুপুরাণের বর্ণনার ন্যায় প্রাচীন নহে। কিন্তু স্থান রমণীয় এবং কিছুকাল পূর্ব্বে সম্পূর্ণ মেরামত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। আমি স্বয়ম্ভু পরিক্রমা করিয়া নগরের বাহিরের পথেই যল্মো যাত্রা করিলাম। কিছু দূর পর্য্যন্ত রোপলাইনের স্তম্ভরাজি সঙ্গে চলিল, সেগুলি দেখিয়া হাজার হাজার বেকার কুলীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। ইংরেজ রেসিডেন্সীর নীচের পথে আমরা চলিলাম, ইহা অনেক দিনের যত্নে বৃক্ষলতা শোভায় পরিপূর্ণ।

আমার সঙ্গে ছোট একটি গাঁটরি ছিল, মিত্র মহাশয় সেইটি লইয়া চলিলেন, কিন্তু তাঁহারও ভার বহার অভ্যাস ছিল না। কিছু দূর যাইবার পর একজন লোক পাওয়া গেল, তাহাকে সুন্দরীজল পর্য্যন্ত মোট-বহনের জন্য নিয়োগ করিতে চাহিলাম। ঘরে বলিয়া আসিবার ছুতায় গিয়া সে আর ফিরিল না, অনর্থক আমাদের ঠাণ্ডার সময়ের অর্দ্ধঘণ্টাকাল নষ্ট হইল।

আমার পোষাকের কথা বলা হয় নাই। যল্মো যাত্রার জন্য নেপালী পোষাক গ্রহণ করিয়াছিলাম। নেপালী 'বগলবন্দী' জামা, উপরে কালো কোট, নীচে নেপালী

পায়জামা, মাথায় নেপালী টুপী, পায়ে কাপড় ও রবারের 'ফলাহারী' নেপালী জুতা, এই সকলে বাহিরের অংশ নেপালী হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্তরে যে দুশ্চিন্তা সেই দুশ্চিন্তা ! প্রকৃতপক্ষে নেপালে ভোটীয়া পোষাকই প্রশস্ত। এ পথে পুলিস-চৌকী আছে শুনিলাম, কিন্তু সেদিন সিপাহীর দল কাঠমাণ্ডবে ঘোড় দৌড় দেখিতে যাওয়ায় আমি পরিত্রাণ পাইলাম।

নূতন জুতায় পা কাটিয়া গিয়াছিল এবং মাসাধিককাল চলাফেরা না-করায় চলিবার শক্তিও কমিয়া গিয়াছিল, তবুও এত দিনে আসল যাত্রারম্ভ হইয়াছে এই উৎসাহে ভর দিয়া চলিতেছিলাম। কাঠমাণ্ডব হইতে সুন্দরীজল পর্য্যন্ত মোটরের যাতায়াত আছে, কিন্তু সম্প্রতি একটি পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মোটর-চলাচল বন্ধ। নদার কাছে দেখিলাম পাথুরে কয়লায় ইট পোড়ান হইতেছে, অথচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই পাথুরে কয়লাই আমি জ্বালাইয়া দেখাইতে এক রাজবংশীয় পুরুষ অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। সে-সময় এদেশে ঐ কয়লাকে লোকে দৈব ধাতুর খাদ বলিয়া জানিত এবং ক্ষেতের সার হিসাবে ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন কাজে লাগাইত না। নেপালের ভূমি রত্নগর্ভা, নানাপ্রকার ধাতু ও খনিজে পরিপূর্ণ এবং জমিও উৎকৃষ্ট ফলের উপযুক্ত, কিন্তু সেদিকে নজর দেয় কে ?

চার-পাঁচটার সময় সুন্দরীজল পৌঁছিলাম। এখন এখান হইতে নলদ্বারা কাঠমাণ্ডবে জল-সরবরাহ হয়। জেনারল মোহনশমশেরের প্রাসাদের নিকট হইতেই আমি ঐ নলের পথ ধরিয়া এখানে আসিয়াছিলাম।

মহারাজ চন্দ্রশমশের তাঁহার প্রত্যেক পুত্রের জন্য পৃথক পৃথক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মহারাজের প্রাসাদ নির্ম্মাণের বিশেষ সখ ছিল, নিজের বিরাট প্রাসাদ অতি সুন্দরভাবেই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। লোকে বলে, ইহাতে ক্রোড়াধিক টাকা খরচ হইয়াছে। তিনি জীবিতকালেই তাঁহার প্রাসাদ 'তিন-সরকারী'তে দিয়া গিয়াছেন ও ছয় পুত্রের জন্য ছয়টি প্রাসাদ করাইয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপারে যে অর্থ ও ভূমি ব্যয় হইয়াছে ভবিষ্যতেও যদি তাহাই হয়, তবে বিংশ শতাব্দীর শেষে কাঠমাণ্ডবের ভূভাগের চতুর্দ্দিক প্রাসাদ ও অট্টালিকায় পূর্ণ হইবে এবং সমস্ত উপত্যকার উর্ব্বরক্ষেত্র 'পার্ক' ও উদ্যানে পরিণত হইবে। দেশের কোটি কোটি টাকা এইরূপে কারুকার্যবিহীন বিদেশী ঢঙের ইষ্টকস্তূপ-রচনায় খরচ হওয়ার ফল কি হইবে সে-কথা আলাদা।

সুন্দরীজলে চড়াই আরম্ভ হইল। এত দূর পর্য্যন্ত সমতল জমি ছিল। এইবার বুঝিলাম পাহাড় পার হওয়া সহজ হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় এক কাটখোট্টা যোয়ান 'তমঙ্গ'-জাতীয় মজুর পাওয়া গেল। লোকটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সাধারণ গোর্খা অপেক্ষা বিশালতর ও বিশেষ বলিষ্ঠ ছিল। তাহাকে চার দিনের জন্য নেপালী আট

মোহর (৬৲ টাকা) মজুরীতে নিযুক্ত করিলাম, স্থির হইল প্রয়োজন মত সে আমাকেও বহন করিয়া লইয়া চলিবে।

সুন্দরীজলের পথে উপরের দিকে চলিলাম, অল্পদূর যাইতেই শ্যামল ক্ষেত্র-পরিবৃত বনের মধ্য দিয়া পথ চলিল। নীচের রাস্তা ছাড়িয়া উপরের পথেই চলিলাম। পাহাড়ের পাকদণ্ডির চড়াই দুরূহ, কিন্তু আমার পক্ষে নিরাপদ—নীচের পথে চৌকী-পাহারার ব্যবস্থা আছে। ক্রমাগত চড়াইয়ের পর সন্ধ্যা নাগাদ উপরের একটি গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রাম অনেক উচ্চে অবস্থিত, সুতরাং শৈত্যের আধিক্য অনুভব করিলাম। নেপালের পথ-ঘাটে মাঝে মাঝে দোকান-চটি আছে, সেখানে আহার্য্য পাওয়া যায়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শয়ন ও নিদ্রাই আমার সুখকর মনে হইতেছিল, কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় পথের কষ্ট গ্রাহ্যই করিলেন না, তিনি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন, তিনজনে তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম।

এখনও চড়াইয়ের পথ অনেক বাকী, সুতরাং অতি প্রত্যূষেই আমরা রওয়ানা হইলাম। পাহাড়ের এই উপরের অংশ স্থানে স্থানে আবাদ হইতেছে, লোকে কোন কোন জায়গায় জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিতেছে এবং নিজেদের কুঁড়েঘরও তৈয়ার করিতেছে। নেপালের জনসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে, দার্জ্জিলিং ও আসামে লক্ষ লক্ষ নেপালীর বসতি হওয়া সত্ত্বেও যাহারা দেশে আছে তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমানে ক্ষেত হইতে জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব। ফলে, বহুস্থলে বেপরোয়াভাবে অরণ্য ধ্বংস করিয়া নূতন ক্ষেত সৃষ্টি করা হইতেছে এবং অনেক জায়গায় পাহাড় জঙ্গলশূন্য হইয়া গিয়াছে। বন-জঙ্গলের সঙ্গে বর্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; দেখা গিয়াছে বনভূমি-ধ্বংসের পর অনেক দেশ বর্ষার অভাবে জলস্রোতবিহীন অবস্থায় শুকাইয়া গিয়াছে। এখানে কি হয় বলা যায় না।

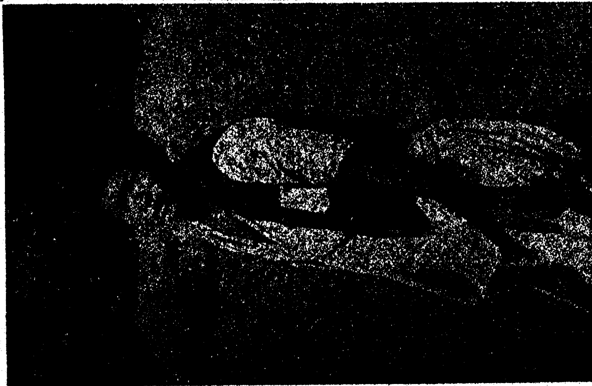
অস্তু পাহাড়ের পথে চলিতে চলিতে দ্বিপ্রহরে এক গ্রামে পৌঁছিলাম। সুন্দরীজলের উপরের অঞ্চল হইতে তমঙ্গদের দেশ আরম্ভ। ব্রিটিশ 'গোর্খা' পল্টনে তমঙ্গ-বীরদের চাহিদা আছে। ভোটীয়দিগের সহিত ইহাদের চেহারার সাদৃশ্য আছে, ভাষার মিলও ততোধিক। ইহাদের ধর্ম্ম এখনও বৌদ্ধ, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় তাহা অধিক দিন থাকে কিনা সন্দেহ। আমার সঙ্গী তমঙ্গ বলিল, তাহাদের মৃত্যুর পরে লামা ডাকিতে হয়, কিন্তু বিজয়া-দশমীর দিনে তাহারা ষোল আনা শাক্ত। এই গ্রামেও টিনে-ছাওয়া একখানি ছোট কুটীর ভাল অবস্থায় আছে। শোনা গেল, এক প্রসিদ্ধ সাধু বৌদ্ধ তমঙ্গদিগকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য এখানে ছিলেন, তাঁহার জন্যই এই কুটীর নির্ম্মিত হয়।

পর্ব্বতমালার দ্বিতীয় স্কন্ধ পার হইয়া আমরা এখন অন্য পার দিয়া

চলিতেছিলাম। এখন পথে স্থানে স্থানে 'মানী' অর্থাৎ 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' নামক তান্ত্রিক বৌদ্ধমন্ত্র লিখিত প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। দেখিলেই বুঝা যায় সেগুলি দীর্ঘকাল উপেক্ষিত।



হিমালয়ে নেপালী কৃষিক্ষেত—চাষবাসের জন্য মানুষকে এখানে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু জলাভাবের জন্য প্রায়শই পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হয় না। চাষের উপযুক্ত জমিও এখানে যৎসামান্য।



নেপালের কৃষক—এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কর্ম্মঠ। কিন্তু স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্যের অভাবে অধিকাংশ লোকের অবস্থা শোচনীয়।

রাত কাটিল এক কুঁড়েঘরে, প্রভাতে উৎরাইয়ের পালা আরম্ভ হইল। দু-দিন

পথ-চলায় পায়ে জোর পাইয়াছিলাম, উপরন্তু এখন উৎরাই চলিয়াছে, সুতরাং এখন আমি পথ চলায় কাহারও পিছনে পড়ি না। আটটার সময় আমরা নীচের নদীতটে আসিলাম এবং নদী পার হইয়া নীচে গিয়া কিছু দূরে নদীসঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার দোকানে আহার্য সংগ্রহ করিয়া আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। দ্বিপ্রহরে একখানি ছোট গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামের-নীচে পূজার জন্য প্রাচীন অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ রহিয়াছে, কিন্তু শীতের জন্য তাহাদের অবস্থা ভাল নহে। এখানে পাহাড়ের উপরের অংশে যল্মোজাতির বসতি। নীচের অংশ বন-শূন্য এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া তাহাদের পছন্দ নহে, কেন-না তাহাদের ভেড়া ও চমরীর পালের জন্য বন-জঙ্গল অত্যাবশ্যক।

যে-গৃহে আমাদের রন্ধন-ভোজনের ব্যবস্থা হইল, তাহার অধিস্বামী এক ক্ষেত্রী। নেপালে এখনও মনুসম্মত অনুলোম বিবাহের প্রচলন আছে। ক্ষত্রিয় পিতা ও নিম্নবর্ণের মাতা হইতে জাত সন্তান এদেশে ক্ষেত্রী নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, কয়েক পুরুষ পরে উপযুক্ত আদান-প্রদানের ফলে ইহারা পুরাদস্তুর ক্ষত্রিয় হইয়া যায়। এইরূপে অব্রাহ্মণ-কন্যাজাত ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান প্রথমে জোশী নামে পরিচিত থাকে এবং কয়েক পর্যায় পরে পুরা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেই দিনই সন্ধ্যায় আমরা যল্মোদিগের আদি বাসভূমিতে পৌঁছিলাম। ইহাদিগকে লোকে ভোটীয় মনে করে এবং ভোটীয় ভাষা ইহাদের বিশেষ পরিচিত। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ গৌর এবং মুখকান্তিও সুন্দর, এই জন্য ইহাদের কন্যা রাজগৃহে উপপত্নীরূপে সমাদর পায়।

সেই রাত্রে পিসুর উৎপাতে ঘুম নষ্ট হইল, তবে পরদিন গন্তব্যস্থানে পৌঁছিব, সুতরাং সে কষ্ট সহ্য হইল। পরদিন অতি প্রত্যূষেই আবার চড়াইয়ের পথ ধরিলাম। তিন ঘণ্টা পথ-চলার পর ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ-অঞ্চলে তখনও গমের শীষে দানা বাঁধে নাই, কোথাও কোথাও আলুর ক্ষেত তখনও রহিয়াছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে আলুর সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

পর্ব্বতের এক বিস্তৃত বাহু লঙ্ঘন করিতেই যেন নাটকের এক নূতন দৃশ্যপটের প্রবর্ত্তন হইল। চারিদিকে গগনচুম্বী মনোহর দেবদারু বৃক্ষ, নীচে শ্যামল শস্যে ভরা ক্ষেত্র, যেন নীলবসনা প্রকৃতিদেবী দৃশ্যপটে সশরীরে অবতারণ করিয়াছেন। স্থানও অতি শীতল। ১১ই এপ্রিল তিনটা নাগাদ আমি আমার গন্তব্যস্থানে যল্মো গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামের প্রবেশ-পথে জলস্রোত-চালিত মন্ত্রচক্র ('মানী) ঘুরিতেছে দেখিলাম।

যে-গ্রামে আমি ছিলাম তাহা যল্মোজাতির বসতি। ইহারা যল্মো নদীর ধারের পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের পুরুষদের বেশ নেপালী ধরণের, কিন্তু নারীরা ভোটীয়া-

ম্বীদের স্থায় বেশভূষা ব্যবহার করে। বস্তুতঃ ভাষা, বেশ, ভোজন ইত্যাদি হিসাবে ইহাদের ভোটীয়া বলা উচিত, যদিও অন্যজাতির সদৃষ্টান্তে ইহারা ভোটীয়দিগের অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার এবং এদেশে মুখ-হাত ধোওয়ার প্রচলন আছে।

এই বৃহৎ গ্রামখানিতে শতাধিক ঘর-বাড়ী ছিল। পাশেই দেবদারুর বন থাকায় কাঠ পাওয়া সহজ এবং সেই জন্য গৃহনির্ম্মাণে কাঠের ব্যবহার খুবই বেশী। অধিকাংশ ঘরই দু-তলা বা তেতলা, উপরের ছাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত। নীচের অংশে (একতলায়) কাঠ রাখা, পশু রাখা, এই সব চলে, উপরে বসবাস। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে। এপ্রিলের অর্দ্ধেক পার হওয়ার পরেও আমি এখানে যথেষ্ট শীত ভোগ করিলাম। পাহাড়ের উপরের অংশে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তুষারপাত দেখিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও জাগ্রত আছে। প্রতি ঘরের পাশে দেবদারুর স্তম্ভে মন্ত্রযুক্ত ছাপা কাপড়ের ধ্বজা ঝুলান আছে। গ্রামের 'মানী' স্তূপগুলিও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। প্রতি গ্রামে দু-একটি 'গুম্বা' (বৌদ্ধ বিহার বা মঠ)। সেখানে দু-চার জন লামা থাকেন। গৃহ, লোকজন, ক্ষেত, পশু প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় এই যল্মোরা নেপালের অন্যজাতি অপেক্ষা সুখী। ইহাদের ক্ষেত অপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি ভেড়া, ছাগল ও চমরীর পাল। শীতের সময় ইহারা পশুর পাল ঘরে আনে, অন্য সময়ে যেখানে চরাইবার সুবিধা সেইখানেই ইহাদের রাখালের দল কুকুর লইয়া যাযাবরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মাখনমিশ্রির চা ও সত্তু (ছাতু) ইহাদের প্রধান খাদ্য।

আমি এক ভোটীয় (যল্মো) গৃহে স্থান লইলাম। এখানে আসিবা মাত্রই আমি ভোটীয় চোগা ও জুতা পরিয়া লইয়াছিলাম। পরদিন আমার মিত্র ফিরিয়া গেলেন। শুনিলাম এই গ্রাম হইতে কুতী ও কে-রোং চারদিনের পথ মাত্র, উভয়স্থানই তিব্বতের এলাকায়। এখানে ঘুরিয়া বেড়ানোর কোন বাধা ছিল না, সুতরাং দিন কাটাইতাম ঘুরিয়া এবং তিব্বতী পুস্তক পড়িয়া। মাঝে মাঝে ভাগ্যগণনা করাইবার বা হাত দেখাইবার জন্য লোক আমার কাছে আসিত। অধিকাংশকেই আমি নিরাশ করিতাম, যদিও ভাগ্যগণনা, মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ ও ঔষধের ব্যবস্থা এই তিন কার্যই এদেশে বিশেষ সম্মানার্হ।

আমি আসিবার তিনদিন পরে ডুক্‌পা লামার শিষ্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দল আসিয়া পড়িল। উহারা বলিল, বড় লামা শীঘ্রই আসিবেন এবং এ খবরও দিল যে, এখনও কয়েক হাজার পুস্তক ছাপা বাকী আছে। শিষ্যের দল গ্রাম ছাড়িয়া নিকটস্থ এক গুম্বায় আস্তানা গাড়ায় আমিও সেইখানেই গেলাম, কেন-না ইহাদের সঙ্গে থাকিলে আমার তিব্বতী ভাষা শিক্ষা সহজ হইবে।

এখানে আসিয়া প্রথমে আমার জ্বর হয়, কিন্তু দুই তিন দিনে ছাড়িয়া যায়। এখন

গুম্বায় আমার কাজ ছিল সকালে প্রাতঃকৃত্যের পর যে-সময়ে অন্যেরা পুস্তক ছাপা বা কাগজ প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত থাকিত—সে-সময় 'তিবেতন্ মেনুয়েল' পাঠ। বেলা আটটা নাগাদ 'থুক্‌পা' (লেই) তৈয়ার হইত, সকলে তিন-চার পেয়ালা পান করিত। আমিও আমার কাঠের পেয়ালায় থুক্‌পা পান করিতাম। ফুটন্ত জলে ভুট্টা মেড়ুয়া বা



তাসীগাঁও—দরবার-চত্বর

জই (ওট্‌স) হইতে প্রস্তুত সত্তু ফেলিয়া পাক করিলেই থুক্‌পা হয়। কখনও কখনও তাহাতে শাকসব্জীও মিশাইয়া দেওয়া হয়, লবণ তো থাকেই। মধ্যাহ্নভোজন—গাঢ়তর সত্তুর পাকের সহিত শাকসব্জী; সাতটার সময় সান্ধ্যভোজন ঐ থুক্‌পা। ভুট্টা

ও মেড়ুয়ার সত্তুর ব্যবহারই অধিক প্রচলিত ; মেড়ুয়ার সত্তু 'গ্যাগরচম্পা' (ভারতীয় সত্তু) নামে পরিচিত। আমি ইহার নামের উপর খুবই টিপ্পনী করিতাম।

এখানে তিন্-জিন্ (সমাধি) নামের এক চার-পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক আমার ঘনিষ্ঠ মিত্র (ভোটীয় ভাষায় 'রোক্‌পো') হইল। সে আমাকে ভাষাশিক্ষা ও ভাষা সম্বন্ধে ভুলভ্রান্তি দূর করা এই দুই কার্যে সহায়তা করিত। কিছু দিন পরে 'গ্যাগর্ চম্পা' খাইয়া আমার 'পেটে চড়া পড়া' অবস্থা হওয়ায়, আমি মাখন, চাউল ও যবের সত্তু কিনিয়া আনাইলাম। আমার মাষ্টার মহাশয় সানন্দে আমার একান্নবর্তী হইলেন। জঙ্গলে তখন হিসালু (ষ্ট্রবেরী) পাকিয়াছে, আমি প্রত্যহ তাহারও ব্যবস্থা করায় তিন্-জিন্ মহা খুশী হইত। এই শিশু ডুক্‌পা লামার খুল্লতাত-কন্যার পুত্র ছিল। এক মাস একত্র থাকায় সে আমার বিশেষ স্নেহভাজন হয়, এবং যাইবার সময় তাহার জন্য আমায় বিচ্ছেদব্যথাও পাইতে হয়।

এখান হইতে বড় কুকুরের উৎপাত আরম্ভ হইল। এই হেতু এখানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা রাখালদিগের বাসস্থানে যাওয়া-আসা দুরূহ ব্যাপার। তজ্জন্য আমি এত দিনের মধ্যে গ্রামে মাত্র দুই-তিন বার গিয়াছিলাম, যদিও প্রত্যহই পাহাড়ে উপর-নীচে বহুদূর 'টহল' দিয়া ফিরিতাম। ক্ষেতে গম ও জইয়ের ঢেউ খেলিতেছিল,:কিন্তু ফসল পাকিতে তখনও এক মাস দেরি। শীতের প্রকোপে এখানে ভুট্টা ও ধান হয় না, আলু যথেষ্ট পরিমাণে হয়, কিন্তু তখন সবে বপন শেষ হইয়াছে মাত্র। কোন কোন দিন পূর্ব্ব বৎসরের আলু ও মূলা তরকারির জন্য পাওয়া যাইত। ডুক্‌পা লামার শিষ্যদলও ভুট্টা মেড়ুয়ার সত্তু খাইয়া হয়রান হইয়া মাংসের খোঁজ আরম্ভ করিল। একদিন চার-পাঁচ মাইল দূরের এক গ্রামে একটা বলদ মরিয়াছে খবর আসিল। ইহারা তৎক্ষণাৎ সেখানে চলিল, কিন্তু দাম ছয় সাত টাকা এবং অস্থিচর্ম্মসার দেখায় নিরাশ হইয়া ফিরিল—দলের লোকের পেট ভরিয়া মাংস খাওয়ার ইচ্ছা অপূর্ণ ই রহিল। শেষে ভুট্টা ভাজিয়া এবং চায়ে মাখন, অভাবে সরিষার তৈল ঢালিয়া খাওয়া আরম্ভ হইল। মাখনের বদলে তৈলের ব্যবহার ইহারাই আবিষ্কার করে। শুনিতাম, তাহাতেও চা বেশ সুস্বাদু হইত। আমি দ্বিপ্রহরের পরে কিছুই খাইতাম না এবং পৃথক্ ব্যবস্থা করিবার পর আহারের সুখ ছিল।

আমাদের গুম্বা হইতে প্রায় এক মাইল উপরের দিকে, দেবদারুর ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি কুটির ছিল। এক লামা সেখানে বহু বর্ষ যাবৎ বাস করিতেছিলেন। লামারা এইরূপে প্রায়ই লোকালয়ের বাহিরেই থাকেন এবং ইঁহাদের নির্জ্জনবাসের কাল, বৎসর ও দিন হিসাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে। শ্বেতবর্ণের কুটীরটি দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল, এক-একবার ইচ্ছা করিত ওখানে গিয়া কিছুদিন থাকি, কিন্তু পরেই মনে

হইত—"আইথি হরিভজন কো, ওটন লগী কাপাস"—আমার কার্য্যে কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপের স্থান নাই।

এই গ্রামের ঠিক উপরে, একটু তফাতে, একজন 'খম্পা' লামা (চীন প্রান্তস্থ তিব্বতের খম্ প্রদেশের) কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছিলেন। একদিন ইনি আমাদের গুম্বায় আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করেন এবং আমাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এইখানে আমি আমাদের গুম্বার কিছু বর্ণনা করি: আমি নীচের তলার প্রধান দেবালয়ে থাকিতাম। আমার সম্মুখেই রক্তপানরতা, অস্ত্রচর্ব্বণকারিণী, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণচক্ষুযুক্তা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি! এই মন্দিরেই অন্য অনেক দেবতা ও লামার মূর্তি ছিল। প্রধান মূর্তি লোবন্ রিম্পো-ছের—অর্থাৎ গুরু পদ্মসম্ভব। ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, ঐমূর্ত্তিতে কারুকৌশলের সৌন্দর্য এবং কলার লালিত্য ছিল। ছাদ হইতে বহু চিত্র লম্ববান। গুম্বার উপরতলে ছিল কয়েকটি মূর্ত্তি এবং শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ভোটীয় ভাষায় হস্তলিখিত এক অতি সুন্দর পুঁথি। প্রথমে এখানে এক ভিক্ষু বাস করিতেন, পরে তাঁহার শিষ্য বিবাহ করেন এবং এখন তাঁহার সন্তানগণ এই গুম্বার অধিকারী। গুম্বার পার্শ্বস্থ দেবোত্তর ক্ষেতের উপরই ইহাদের ভরণপোষণ নির্ভর করে। পূজাপাঠে হয়ত আরও কিছু আমদানী হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ভরসা করা চলে কিনা জানি না।

১২ই মে খম্পা লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি পরম সমাদরে আমায় আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার স্বাগত-সম্ভাষণ "তুমিও বুদ্ধের ভক্ত, আমিও বুদ্ধের অনুগত"—আমার কানে এখনও বাজিতেছে। লামা ন্যুমা (উপবাস-ব্রতে) ব্রতী, অর্থাৎ প্রথম দিনে অনিয়মিত আহার ও পূজা, দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পরে না খাইয়া পূজা ও তৃতীয় দিনে নিরাহার অবস্থায় পূজা, উপরন্তু প্রতিদিন সহস্র দণ্ডবৎ—ইহাই তাঁহার নিয়ম। এই অবলোকিতেশ্বরের ব্রতের উপর লোকের বিশেষ আস্থা আছে, খম্পা লামার সঙ্গে অনেক শ্রদ্ধাশীল স্ত্রীপুরুষ এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসে। লামা ঝাড়ফুঁকও কিছু জানেন, সুতরাং এতাদৃশ লোকের কোন বিষয়ে অনটন থাকিতে পারে না। রাত্রে আমি খাই না কিন্তু উনি সাগ্রহে মাখনযুক্ত চা প্রস্তুত করিয়া আমায় পান করাইলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভোট-দেশ ও তথাকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইল। লামা আমাকে খম্ দেশে যাইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। সে রাত্রি ওখানেই থাকিলাম।

পরদিন তাঁহার উপবাস ছিল, কিন্তু তিনি স্বহস্তে চাউল ও আলুর তরকারি রন্ধন করিয়া আমাকে পরম সন্তোষের সহিত খাওয়াইলেন। ভোজনান্তে মধ্যাহ্নের

পর আমি নিজেদের গুম্বায় ফিরিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে ডুক্‌পা লামার বাকী শিষ্যদল এখানে পৌঁছিলেন। তাহাদের নিকট শুনিলাম, ডুক্‌পা লামা কাঠমাণ্ডব হইতে সোজা কুতী রওয়ানা হইয়াছেন, এদিকে তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা নাই। ডুক্‌পা লামা এখন জীবনের শেষভাগে ভোটীয় সিদ্ধপুরুষ ও কবি জেৎসুন-মিলারেপার সিদ্ধস্থান লপ্‌চীতে যাপন করিতে যাইতেছেন শুনিয়া শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেই ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। আমার তো বিষম সমস্যা, দুই মাস তাঁহার আশায় থাকিবার পর এই দারুণ নৈরাশ্যজনক সংবাদ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি আমার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বস্তুতঃ এ-সংবাদে আমার মনে বিশেষ বিক্ষোভ হওয়ার কথা, তবে এত দিনে আমি ভোটীয় স্বভাবের কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি তন্মুহূর্ত্তেই স্থির করিলাম, পরদিনই আমিও কুতী রওয়ানা হইব এবং পথে তাঁহাকে ধরিব। সঙ্গে যাইবার জন্য একজন সাথী প্রয়োজন। শুনিলাম এই সময় বৎসরের জন্য লবণ সংগ্রহ করিতে বহু লোক কুতী যায় এবং দু-চার দিন অপেক্ষা করিলে সঙ্গী নিশ্চয়ই জুটিবে। কিন্তু আমাকে ডুক্‌পা লামার সঙ্গে সীমান্ত পার হইতে হইবে, সুতরাং অপেক্ষা করা বিপজ্জনক।

রাত্রি পর্য্যন্ত কোন লোকের ব্যবস্থা হইল না। গুম্বারই এক যুবক কুতী যাইবে শুনিলাম—কিন্তু তাহার ক্ষেতের ফসল কাটিবার পর। এই প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাকে সে রাত্রির মত নিদ্রার চেষ্টা দেখিতে হইল।

পাঁচ

আজ ১৪ই, সকালে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তমঙ্গ যুবককে সঙ্গী করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। শস্য-কাটা বাকী থাকায় তাহার পক্ষে যাওয়া মুস্কিল; শেষে তাতপানী পর্য্যন্ত মাত্র যাইতে বলায় সে কি ভাবিয়া রাজী হইল।

বেলা আটটা বাজিল, বৃষ্টিও কিছু কমিয়াছে মনে হইল, এইবার বিদায়ের পালা। গ্রাম হইতে পাথেয়-রূপে কিছু সত্তু পাওয়া গেল, তাহাই লইয়া পথ ধরিলাম। পথ এইবার পাহাড়েব উপরের দিকে চলিয়াছে, গ্রামেব লোকের চেষ্টায় তাহা ভালরূপ মেরামত হইয়াছে, রাস্তাও চওড়া।

ছয় ঘণ্টা চলিবার পর রাখালদের পশুচারণের আড্ডায় পৌঁছিলাম। মোটা শিকলে বাঁধা কুকুরের দলের চীৎকারে কানের পর্দা ছিঁড়িবার উপক্রম, রাখালগৃহিণী

তাহাদের থামাইলে গৃহে প্রবেশ করা সম্ভব হইল। গৃহ আর কি, চাটাই মাদুরে ছাওয়া কুটীর। ভিতরে খাওয়া-পরার সরঞ্জাম, বিছানা, আসন ইত্যাদি সাজান আছে। পাশেই গোয়াল, সেখানে জামোর (চমরী ও গরুর সঙ্কর) দুধ দোহান হইতেছিল। গৃহস্বামী ছোট ছোট কাঠের বাসনে দুধ দুহিয়া আনিতেছিল, গৃহিণী আহার্য্য রন্ধনে ব্যস্ত। এখানকার রীতি অনুসারে দোহনের সময়ে পশুর সম্মুখে কিছু আহার্য্য রাখিতে হয়। ঘরের এক কোণে এক বৃহৎ পাত্রে ঘোল ছিল, গৃহস্বামী আমাকে দুগ্ধপান করিতে বলায় আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে খাইবার জন্য সাদর অনুরোধ আসিল—অন্ন ও তরকারি প্রস্তুত। পথে আর খাইবার কিছু পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, সুতরাং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। যাইবার সময় কিছু মাখন উপহার পাওয়া গেল; বেলা এগারটায় আবার পথে বাহির হইলাম।

পথের দুই পাশে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী বনের পাখীর কূজনে মুখরিত, আশেপাশে আরণ্যষ্ট্রবেরী ফলিয়া আছে। আমি ও আমার সাথী ভোটীয় ভাষায় গল্প করিতে করিতে ও ষ্ট্রবেরী খাইতে খাইতে চলিতে লাগিলাম; পথের শ্রান্তি যেন অনুভবই করিতেছিলাম না। উপরে কোথাও কোথাও যল্মোদের শ্বেতপতাকাপূর্ণ ছোট গ্রাম দেখা যাইতেছিল। এই সকল গ্রামের নিকটস্থ পথে মানী (বৌদ্ধমন্ত্রযুক্ত স্তূপ) অতি অবশ্য থাকে, এবং পথের সেই অংশ সর্ব্বদাই সুসংস্কৃত থাকে। বৌদ্ধ যাত্রী এই মানী দক্ষিণে রাখিয়া চলে, যাহাতে যাইবার সময় এক দিক ও ফিরিবার সময় অন্য দিক ঘুরিয়া পরিক্রমা পূর্ণ হইয়া বহু পুণ্যলাভ হয়। এক গ্রামের নিকটস্থ মানীর দেওয়ালের প্রস্তরে খোদিত চিত্র নূতনভাবে বর্ণ-রঞ্জিত করা হইয়াছে দেখিলাম। আগেই বলিয়াছি যল্মোদের মধ্যে লামাধর্ম্ম এখনও জাগ্রত আছে এবং তাহাদের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যও বর্ত্তমান।

দ্বিপ্রহরে একটার সময় পর্ব্বত-স্কন্ধের উপর পৌঁছিলাম। সেখান হইতে আমার পথ পাহাড়ের ঘাট (তিব্বতী 'লা') ধরিয়া অন্য পারে গিয়াছে। ঘাটের মুখেই বৃহৎ মানী এবং তাহার পর হইতেই সোজা উৎরাইয়ের আরম্ভ। কিছু নীচে নামিতেই বনজঙ্গল অদৃশ্য হইয়া গেল, পথের দু-পাশেই সুপক্ক গম ও জউয়ের ক্ষেত। আর কিছুক্ষণ চলিবার পর ঐ সকল ক্ষেতও উপরে রহিয়া গেল, নীচে নামিবার সঙ্গে তাপবৃদ্ধিও বেশ অনুভব করিলাম, তবে আমার সঙ্গীর ফসল কাটিবার জন্য ফিরিতে হইবে এবং আমারও পথ চলা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা দ্রুতই চলিতে লাগিলাম।

পথে তমঙ্গদিগের বহু গ্রাম ছাড়িয়া নীচে গোর্খাদিগের বসতিতে পৌঁছিলাম।

সেখানে ভুট্টার চারা এক বিঘৎ আন্দাজ বাড়িয়াছে। বেলা তিনচারিটার সময় পাহাড়ের নীচে নদীর পুলে পৌঁছান গেল। সেখানেও একজন সরকারী সিপাহী প্রহরী ছিল বটে, তবে ভোটীয়া লামার সঙ্গে তাহার কি প্রসঙ্গ থাকিতে পারে? নির্ব্বিবাদে পার হইয়া চড়াইয়ের পথ ধরিলাম। চড়াইয়ে আগের মত দ্রুত চলা সম্ভব ছিল না, এবং পাঁচটার পর পথশ্রান্তিও অনুভব করিতে লাগিলাম, সুতরাং সময় থাকিতেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিলাম। নিকটের এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণদের ঘরে স্থান পাওয়া গেল। গৃহস্থ লামার জন্য শয়নেব ব্যবস্থা করিলেন, সঙ্গী রন্ধনের ভার লইলেন।

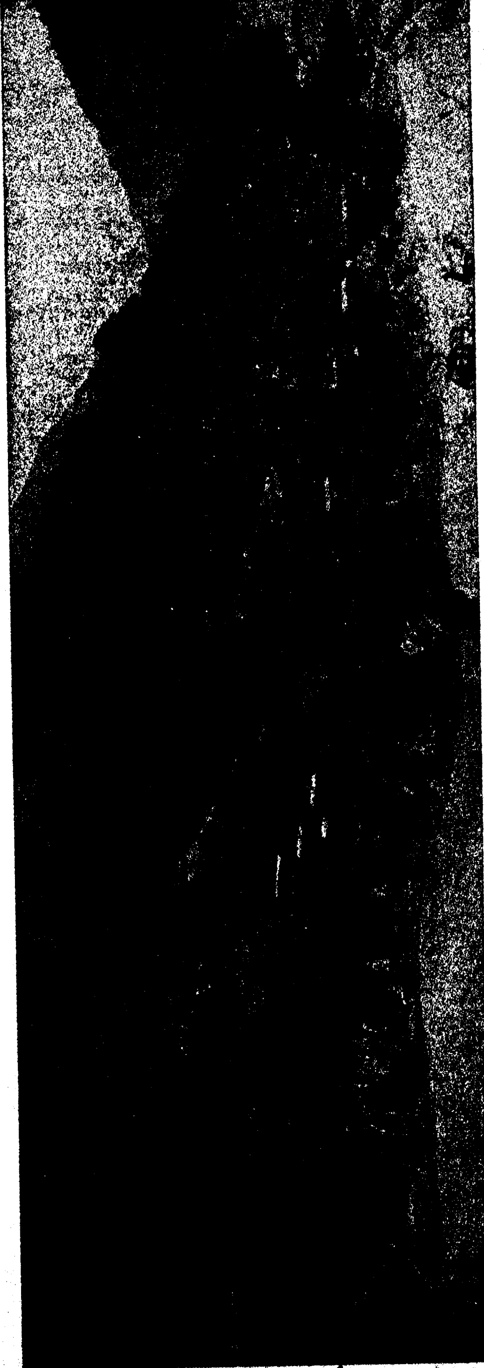
রাত্রিযাপনের পর সকালে আবাব চড়াই আরম্ভ করিলাম। কত গ্রাম, কত নদী-নালা পার হইবার পর অন্য পর্ব্বতমালার স্কন্ধে পৌঁছিলাম। এবার বৃক্ষশূন্য পাহাড়ের মধ্যে পথ চলিয়াছে। দ্বিপ্রহব-শেষে আর এক চড়াই পার হইবার পরে কাঠমাণ্ডব হইতে কুতীর পথে উপস্থিত হইলাম। এই পথ পর্ব্বতস্কন্ধের উপর দিয়া গিয়াছে, নীচেও আর একটি রাস্তা ঐ গন্তব্যমুখেই চলিয়াছে, কিন্তু অসহ্য গরমের জন্য সে পথে চলা মুস্কিল।

আবার পথ ঘন বনানীর মধ্য দিয়া চলিল। এখন কুতী হইতে তিব্বতী-লবণ আনিবার মরসুম, সুতরাং পথে দলে দলে লোক চলিয়াছে। কেহ বা ভুট্টা চাউল ইত্যাদি লইয়া কুতীর বাজারে চলিয়াছে, কেহ বা লবণের বোঝা কাঁধে ঘবের দিকে ফিরিতেছে। বেলা দুইটা নাগাদ আবার উৎবাই আরম্ভ হইল। এখন আমি শর্বা ভোটীয়দের বসতিস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শর্বা নামেব অর্থ 'পূর্ব্ব-অঞ্চলের লোক'। এই জাতি দার্জ্জিলিং অঞ্চল পর্য্যন্ত বসতিস্থাপন করিয়াছে, যল্মোরা এই জাতিরই এক শাখা। *

একজন শর্বাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ডুক্‌পা লামা এখনও এ-পথ পার হইয়া যান নাই। মনে হইল, হয়ত এখনও তিনি পিছনে আছেন। ঘণ্টাখানেক চলিবার পর খবর পাইলাম তিনি সম্মুখের গ্রামে বিশ্রাম কবিতেছেন। এই সংবাদে মন প্রসন্নতা-পরিপূর্ণ হইল। বেলা তিনটার সময় আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

লামার সহিত আমার কোন ঝগড়া ছিল না, তিনি কেবল তাঁহার জাতীয় স্বভাবের বশে আমায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পুনর্মিলনের পর সকলেই 'পংডিতা'

* এভারেষ্ট অভিযানের প্রসিদ্ধ 'টাইগার কুলি' যাহারা ভার লইয়া ২৭,৪০০ ফুট উঠিয়াছিল, তাহারাও এই শ্রেণীর লোক।



নেপালের একটি দৃশ্য

দেখিয়া খুশী হইলেন মনে হইল। সে-রাত্রি ঐ গ্রামেই কাটাইতে হইল। গ্রামটি লামা-ধর্ম্মাবলম্বী তমঙ্গ জাতির ছিল, কিন্তু ডুক্‌পা লামার মত বিশিষ্ট লোকের প্রতিও তাহাদের শ্রদ্ধার কোন চিহ্ন ছিল দেখা গেল না। কেননা প্রয়োজন হইলে দাম দিয়াও কোন জিনিষ পাওয়া কঠিন ছিল; তবুও আমার মন শান্তিপূর্ণ ছিল।

আমাদের দলে চার জন লামা ও চারজন গৃহস্থ ছিল, তাহার মধ্যে আমার বন্ধু কুলু-অঞ্চলের রিঞ্চেনও ছিলেন। ডুক্‌পা লামার শরীর মোটা, তাঁহার চলিবার শক্তিও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে বহিয়া লইবার জন্য সঙ্গে লোক রাখিতে হইত।

সকালে আবার উৎরাই আরম্ভ হইল, উৎরাইয়ের শেষে নদীর উপর লোহার শিকলে ঝুলানো পুল পাওয়া গেল। সাধারণের চলিবার পথ এইটিই, সেই জন্য ঐখানে চটি এবং দোকান ছিল বটে, কিন্তু অগ্নিপক্ক মৎস্য ভিন্ন অন্য আহার্য্যের বিশেষ

সন্ধান পাওয়া গেল না। আবার চড়াই আরম্ভ হইল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিবার পর তমঙ্গদের একটি বড় গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে রাত্রি কাটাইবার পর সকালে গুরুকে বহিবার জন্য দুইজন লোক লইয়া আবার যাত্রা সুরু হইল। এক পর্ব্বত-স্কন্ধ পার হইয়া অনেকখানি উৎরাইয়ের পর আমরা কালী নদীর তীরে পৌঁছিলাম। লবণ সংগ্রহকারীদের ভিড়ে মনে হইল যেন পথে মেলা বসিয়াছে। এইরূপে ১৮ই মে আমরা কালী নদীর উপরের অংশে শর্বাদিদের এক বড় গ্রামে পৌঁছিলাম। সঙ্গীদের নিকট শুনিলাম, আগামী কাল আমরা নেপালের সীমান্তের চৌকী পার হইব।

এই যাত্রার জন্য সকলে সত্তু থুক্‌পা দিয়াই দক্ষিণহস্তের ব্যাপার শেষ করিত, কেবল ডুক্‌পা লামা ও আমার জন্য ভাতের ব্যবস্থা ছিল। ভাতের সঙ্গে কোন দিন জংলী শাক, কোন দিন মাছের ঝোল জুটিত। এই গ্রামে মুরগীর ডিমের প্রাচুর্য্য দেখা গেল। আমি চল্লিশ পঞ্চাশটি ডিম কিনিলাম ; কিন্তু সঙ্গীরা একরাত্রেই সে-সব সাবাড় করিয়া ফেলিলেন। ভারতে এই সকল পদার্থের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু আমি এ-যাত্রা মাংসের উপর নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থায় মাংসাহার চলিত, সুতরাং কিছু ঘৃণার কথা ছিল না।

এখন আমরা কাঠমাণ্ডব-তিব্বতের এক বড় রাস্তায় আসিয়াছি। রাত্রে সীমান্ত পার হইবার তোড়জোড়ের মধ্যে যল্মোয় লিখিত কাগজপত্রাদি পুড়াইয়া শেষ করিলাম, পাছে তাতপানীতে কেহ তল্লাসী করিয়া ঐগুলি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হয়।

আমরা কালী নদীর উপরের অংশে ছিলাম। নদীর পাড়ে পাড়ে আমাদের ক্রমেই উপরে উঠিতে হইতেছিল। নদীর দুই ধারই শ্যামল, যদিও সমস্ত দেশ যে জঙ্গলে ভরা তাহা নহে। বেলা দুইটা নাগাদ আমরা তাতপানী পৌঁছিলাম ; গরম জলের প্রস্রবণ আছে বলিয়াই এখানকার নাম 'তাত (তপ্ত) পানী'। এখানে নেপালী ডাকঘর ও চুঙ্গী আদায়ের দপ্তর ছিল।

আমার তো বুক ধড়ফড় করিতেছিল, কখন কে বলে, "তুমি 'মধেশিয়া' (ভারতীয়), এখানে কি করিয়া আসিলে ?" লামা মহাশয় পিছনে ছিলেন, চুঙ্গীর লোক আমাকেই প্রশ্ন করিল, "লামা কোথা হইতে আসিতেছে ?" আমি উত্তর দিলাম, "তীর্থ হইতে" (অর্থাৎ ভারতীয় বৌদ্ধ-তীর্থ দর্শনের পর), এবং তাহাতেই চুঙ্গীর হাতে রেহাই পাওয়া গেল। সঙ্গী রিঞ্চেন বলিলেন, "যাক্, তোমার কার্য্যোদ্ধার হয়ে গেল তো ?" সেই সময়েই আমি খোঁজ পাইলাম যে, ফৌজী-চৌকী (সেনানিবাস) এখনও সম্মুখে আছে, সুতরাং বলিলাম, "ভাই, আসল ঘাঁটি এখনও পার হই নাই।"

কিছুক্ষণ পরে লামা আসিয়া পৌঁছিলেন। বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুতরাং কিছুক্ষণ

একটি কুটীরে অপেক্ষা করিবার পর আমরা আবার চলিলাম। সম্মুখে এক উচ্চ পর্ব্বতবাহু যেন আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এমন কি, নদীর স্রোতও কোন্ পথে আসিতেছে তাহা দেখা যাইতেছিল না। এতক্ষণে বুঝিলাম তাতপানীর ফৌজী-চৌকী ছাড়িয়া এত দূরে কেন। বাস্তবিকই এই বিরাট পর্ব্বত প্রাকার সৈনিকের দৃষ্টিতে অতি মহত্ত্বপূর্ণ, কেননা উহার সাহায্যে সামান্য সৈন্যের দলও শত্রুর বিশাল বাহিনীর পথরোধ করিতে পারে।

কিছু পথ চড়াইয়ের পর রাস্তার উপর সশস্ত্র সান্ত্রী দেখা দিল। সান্ত্রী আমাদের আটক করিয়া পথের পাশে বসিতে বলিয়া হওলদার সাহেবকে ডাকিয়া আনিল। এই সেই স্থান, যাহার ভয়ে আমার মন এতদিন অস্থির ছিল। আমার মনে হইল, যেন আমি সাক্ষাৎ যমরাজের সম্মুখে উপস্থিত। আমার এক সঙ্গীকে প্রশ্ন করায় সে বলিল, "আমরা কেরোঙের অবতারী লামার শিষ্যদল।" বলিতে বলিতে স্বয়ং লামা মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় হওলদার কাপ্তান সাহেবকে খবর দিলেন।

কাপ্তান সুবেদারকে পাঠাইলেন, তিনি আসিতেই একে একে সকলের নাম, গ্রাম ইত্যাদি লেখান আরম্ভ হইল। সে সময় আমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই মনে হইত আমি বহুদিন কঠিন রোগে ক্লিষ্ট। পারতপক্ষে আমার মুখ সুবেদারের নজরে যাহাতে না পড়ে আমি তাহারই চেষ্টা দেখিতেছিলাম। শেষে আমার পালা আসিল। রিঞ্চেন বলিল, "ইহার নাম খুনু ছবং।" আমার পরীক্ষা শেষ হইল, এতক্ষণ আমি নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলাম, ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। নিকটের গ্রামেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে। সুবেদার মহাশয় গ্রামের লোক ডাকাইয়া অবতারী লামার থাকিবার সুব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন। আমরা ঐ লোকের সঙ্গে গ্রামের দিকে চলিলাম। সম্মুখের পাহাড়ের বাঁকের পরেই গ্রাম দেখা গেল এবং সেখানে পৌঁছিতেই থাকিবার জন্য ভাল ঘরও পাওয়া গেল।

আজ ১৯শে মে, ডুক্‌পা লামা দেবতাপূজা আরম্ভ করিলেন। সত্তুপিণ্ড রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া 'মাংস' প্রস্তুত হইল, গ্রাম হইতে উৎকৃষ্ট 'কারণ' আসিল, বিংশাধিক ঘৃতদীপ জ্বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ মন্ত্র-জপের পর ডমরু-নিনাদে পূজাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পূজা চলিবার পর প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হইল। আমার কাছে প্রসাদী মদ্য আসিলে আমি ফিরাইয়া দিলাম। তাহাতে দেবতা রুষ্ট হইবেন ইত্যাদি অনেক কথা শুনিতে হইল, কিন্তু ঐ দেবতার ক্রোধের ভয় রাখে কে? যাহা হউক, লাল সত্তুর প্রসাদ আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম না। পরদিন প্রাতে রওয়ানা হইয়া দুইঘণ্টা পথ চলিবার পর, আমরা এক নদীর সেতুর কাছে পৌঁছিলাম।

এই সেতুই নেপাল ও তিব্বতের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিতেছে। তিব্বতের সীমায় পদার্পণ করিবামাত্রই দেহমন হর্ষোৎফুল্ল হইল; এতদিনে আমার অভিযান জয়যুক্ত হইল!



কোশী নদীর উপর শিকলে ঝোলান সেতু

২০শে মে সকালে দশটার আগেই আমরা ভোট রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলাম। এখানে ভোটীয়া-কোশী নদীর উপর কাঠের সেতু আছে, সেই সেতুই ভোট

ও নেপালের সীমা নির্দ্দেশ করে। নদী পার হইতে চড়াই আরম্ভ হইল, রাস্তা লবণ-প্রার্থী গোর্খা পথিকের ভিড়ে ভর্ত্তি। মাঝে মাঝে এক-আধটি ভোটীয়ের বাড়ী, তাহাতে যাত্রীদিগের থাকিবার ব্যবস্থা আছে, কেননা ভোটীয় গৃহস্থের এই সময়ই যাত্রীদিগের নিকট পয়সা আদায়ের মরসুম। চারিদিকের জঙ্গলে কাঠের প্রাচুর্য্য, সুতরাং দিবারাত্র ঘরে ঘরে ধুনি জ্বলিতেছে এবং পথিকের তৃপ্তির জন্য ভুট্টার মদ্যও প্রচুর চলিতেছে। পথের দুই পার্শ্বে, এমন কি চৈত্য মানী ইত্যাদির পরিক্রমাও পথিকদলের 'উৎসর্গে' দুর্গন্ধ নরকে পরিণত হইয়াছে। সেই দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজন আমি পথের মাঝে এক যল্মোর ঘরে সম্পন্ন করিলাম। এই দম্পতি যল্মো হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে।

এখন আমরা অতি মনোরম স্থানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। চারিদিকে শ্যামলগাত্র উত্তুঙ্গশিখর পর্ব্বতমালা, মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য ঝরণার কলনিনাদ, নীচে হইতে কোশী নদীর ফেনপুঞ্জ আচ্ছাদিত বেগবতী ধারার অস্ফুট গর্জ্জন এবং নানা প্রকার মনোহর পক্ষীর কাকলিকূজনে সমস্ত উপত্যকা মুখরিত ; মনে হইতেছিল যেন কোন মায়াবীর দেশে আসিয়াছি। এই সমস্ত আনন্দের মধ্যে ভয় ছিল একমাত্র পাহাড়ী কাঁকড়া-বিছার। এইখানে ডুক্‌পা লামাকে বহন করিবার কোন লোক পাওয়া যায় নাই, সেইজন্য তিনি ক্রমাগত পথের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আমাদেরও যখন-তখন অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। আমার সেই বুদ্ধগয়ার পরিচিত মঙ্গোলীয় লামা লোব্‌-সঙ্‌-শে-রব (সুমতি-প্রজ্ঞ), কাল একাকীই কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিও আমার সঙ্গী। যদিও এখন স্থানে স্থানে চড়াই বহুদূর বিস্তৃত, তবুও কোন ভার-বোঝা না-থাকায় আমি বিনা কষ্টেই পথ চলিতেছিলাম। দ্বিপ্রহরের পরে পথ ছোট ছোট বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

বেলা চারিটার সময় ডাম্ গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক চটিতে উপস্থিত হইলাম। লোকে জানিতে ডুক্‌পা লামা আসিতেছেন ; সুতরাং সকলেই প্রস্তুত ছিল। লামা আসিতেই গ্রামের সকল স্ত্রী-পুরুষ লামার সম্মুখে মাথা নোয়াইতে ছুটিল। তিনিও তাহাদের মাথায় ডান হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

লামাকে লইয়া শোভাযাত্রা হইল, আগে আগে ধূপধুনা জ্বালাইয়া কয়েকজন চলিল। রাস্তা হইতে কিছু দূরে এক জায়গায় গালিচা বিছান ছিল এবং পেয়ালা রাখিবার ছোট ছোট চৌকিও ছিল। বসিবামাত্র চা আসিল—যদিও আমি ঘোল সেবা করিলাম এবং ডুক্‌পা লামার সম্মুখে চাউল ও নেপালী মুহরের (রৌপ্যমুদ্রা) ভেট পড়িতে লাগিল। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে মন্ত্রপূত লাল ও

হরিদ্রাবর্ণের কাপড়ের টুক্‌রা বিতরণ করিতে লাগিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই ব্যাপার সাঙ্গ হইল এবং আমরাও পথে অগ্রসর হইলাম। ধীরে ধীরে আমরা নদীর এক ছোট শাখার সম্মুখে আসিলাম। উহার ধারা এইখানে ঘোর নিনাদে বহু উচ্চ হইতে প্রপতিত হইতেছিল। নদী-পারের উপরে লোহার শিকলে ঝুলান সুদীর্ঘ সেতু, কিন্তু উহার মাঝামাঝি পৌছিলেই উহা এমন দুলিতে আরম্ভ করে যে, অনেকে ভীত হইয়া পড়ে। আমাদের সঙ্গের নেপালী বালক গুমা-জু অতি কষ্টে পার হইল। সেতুরক্ষার জন্য নানা বর্ণের পতাকাযুক্ত দেবতা স্থাপিত আছে।

পুলের পাশেই উঁচু-নীচু ক্ষেতের মধ্যে রয়েছে ডাম্ গ্রাম। গ্রামে বিশ-পঁচিশটি ঘর; প্রায় সবই প্রস্তরের দেওয়াল ও কাঠের ছাউনি দিয়া নির্ম্মিত। একটু উপরেই দেবদারুর জঙ্গল, সুতরাং ঘর-ছাওয়া ইত্যাদি সকল কার্য্যেই দেবদারু কাঠের প্রচুর ব্যবহার হয়। একটি বড় ঘরে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যদিও এ সময়ে লবণ সংগ্রহকারীদের ঘর ভাড়া দিলে লাভ হইত, তথাপি লামার সম্মান ও ভয় বড় কম ব্যাপার নহে। গ্রামে প্রবেশ করিতেই নরনারীর দল লামার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য দৌড়াইল। ঘরে প্রবেশ করিবার পরই সেখানেও ভিড়ে ঘর ভরিয়া গেল। দোতলায় আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ডুকৃপা লামাকে মাখনমিশ্রিত মদ্য নিবেদন করা হইল। আমাদেরও মাখনযুক্ত উত্তম চা জুটিল

রাত্রেই রিঞ্চেনের কাছে শুনিলাম কাল হইতে অবলোকিতেশ্বর মহাব্রত আরম্ভ হইবে। অনেকেই ব্রত ধারণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, আমিও বলিলাম ব্রতপালন করিব। এই ব্রত তিনদিনব্যাপী হয়, প্রথম দিনে দ্বিপ্রহরের পর ভোজন নিষেধ। দ্বিতীয় দিন নিরাহারে মৌনব্রত ধারণ করিতে হয়, তৃতীয় দিনে কেবল পূজা করিতে হয়। ব্রতের সঙ্গে মন্ত্রজপ, পাঠ, পঞ্চাশাধিক ঘৃতদীপ প্রজ্বলন, সত্তু ও মাখনের 'তোর্মা' (বলি) সাজাইয়া নিবেদন ইত্যাদি চলে; উপরন্তু বহু শত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ও করিতে হয়। অবলোকিতেশ্বরের এই ব্রতে (ন্যুমা) মদ ও মাংস সর্ব্বথা নিষিদ্ধ; পরদিন দ্বিপ্রহরে সকলে অন্নভোজন করিলাম। তাহার পর পূজাপাঠ আরম্ভ। অন্যদের সঙ্গে আমিও কয়েকশত দণ্ডবৎ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অনর্থক কেন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি, অনর্থক কেন পরিশ্রম করিয়া হয়রান হই, এই ভাবিয়া দ্বিতীয় দিন প্রাতেই ব্রতভঙ্গ করিয়া চা ও সত্তু ভক্ষণ করিলাম। সেই দিন দ্বিপ্রহরে এক ভোটীয় সজ্জন আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়া পরম তৃপ্তির সহিত মুরগীর ডিমে প্রস্তুত 'সেওয়ঁই' ইত্যাদি ভোজন করাইলেন। ভোজনের পর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। এই ভদ্রলোক লাসা, চীন সীমান্তের খাম্ অঞ্চল ইত্যাদি নানা স্থলে অধ্যয়ন করিয়াছেন, গোর্খা ভাষাও উত্তমরূপ জানেন।

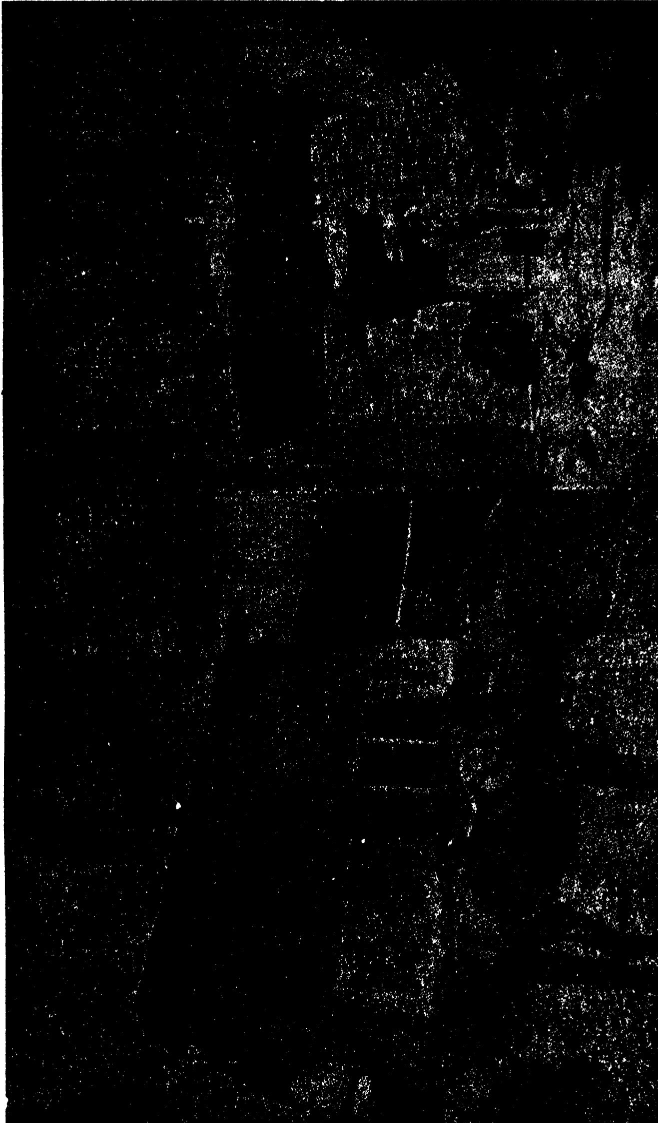
তৃতীয় দিন বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল ; উপর্য্যুক্ত সজ্জন আজ বুদ্ধোৎসব মানত করিলেন। বৌদ্ধদের এই পবিত্রতম তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্ম, বোধ ও নির্ব্বাণ তিনটিই হয়। শুনিলাম এই দিনে সমস্ত ভোট দেশে বুদ্ধোৎসব হয়।

এই তিন দিনে লোকের ভেট-পূজা ইত্যাদি শেষ হইলে ২৪শে মে প্রাতরাশের পর আমরা পুনর্ব্বার পথে বাহির হইলাম। কিছু দূর যাইতেই পর্ব্বতের দেবদার-কটিবন্ধে প্রবেশ করিলাম। নদীর দুই পাশেই দেবদারু বৃক্ষরাজি দেখা দিল। বেলা দুইটার মধ্যে চিরা গ্রামে পৌঁছিলাম। এখানেও আমাদের খবর আগেই পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং খুব বাদ্যভাণ্ডের বহিত ডুক্‌পা লামাকে স্বাগত করা হইল। ডুক্‌পা লামা আসনে বসিতেই দুই-তিন ডজন থালায় চাউল, মুহর ও'খাতা' (চীনদেশে প্রস্তুত শ্বেত রেশমী বস্ত্র, যাহা মূল্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় রিঞ্চেন বলিল, "গুরু এখানে তিনদিন পূজা-পাঠ করিবেন।" এইরূপে মাঝে মাঝে নিশ্চলভাবে থাকা আমার নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হইত। কিন্তু উপায় কি ? সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের লোকে লামাকে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল না, বোধ হয় যাহার যাহা দেয়, তাহা প্রথম মুখেই দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। রাত্রি এক প্রহর যাইতেই রিঞ্চেন বলিল, কালই রওয়ানা হইতে হইবে। বলা বাহুল্য এ সংবাদ আমার নিকট অতি মধুর শুনাইল।

পরদিন বেলা আটটায় যাত্রা করিলাম। খালি হাত হওয়ায় আমি অন্যদের আগেই যাইতাম। এখনও আমরা দেবদার অঞ্চলে জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট গরু চরিতেছে দেখিলাম। কিছু দূরে নবনির্ম্মিত ঘর দেখা গেল। আমি ঘর ছাড়াইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সঙ্গীদের প্রতীক্ষা করিলাম, শেষে তাহাদের দেরি দেখিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলাম, ডুক্‌পা লামা রেনপোছে আসিতেছেন। ব্যস, আর কথা কি, তৎক্ষণাৎ চায়ের পাত্র উনানে চড়ান হইল। লামা আসিতেই বলিলাম যে, চা প্রস্তুতপ্রায়। গৃহস্বামী শশব্যস্ত লামাকে প্রণাম করিয়া নূতন গৃহে তাঁহার পদধূলি দানকরাইল। গৃহেরএককোণে ছোট জলের প্রস্রবণ ছিল, লামা তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কিছু পরে মাখনযুক্ত গাঢ় চা এবং সঙ্গে এক থালা চাউল ও মুহর ভেট উপস্থিত হইল। সকলের চা খাওয়া শেষ হইলে আবার অগ্রসর হইলাম।

দ্বিপ্রহরের পর দেবদারু বৃক্ষ ক্রমেই ছোট হইতেছে মনে হইল, ক্বচিৎ একটি বনস্পতি দেখা যায়। শেষেনদীর ধার-রোধকারী বিশালপর্ব্বতভুজ দেখা দিল, তাহা পার হইতেই বৃক্ষগুল্মের শ্যামলরাজ্য প্রায় শেষ মনে হইল। এখন দু-চারটি মাত্র অতি ছোট দেবদারু দেখা যাইতেছিল, ঘাস তো প্রায় দেখাই যায় না। বিকেলে চক্‌-সুম্‌

গ্রামে পৌঁছিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ প্রথমে গ্রামে পৌছাইয়া মাখম চা প্রস্তুত করিয়া আগাইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। আমার কিছু পরে অন্যেরা পৌঁছিলেন এবং প্রত্যেকেই দু-এক



পেয়ালা চা খাইয়া গ্রামের দিকে চলিলেন। গ্রামের পথের উপরে নীচে বহু চমরী গাই (য়াক্) চরিতেছে দেখিলাম। পাহাড়ের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, এইখানেই

বৃক্ষ-বনস্পতির শেষ দর্শন হইল। আবার বৎসরাধিককাল পরে বৃক্ষবনরাজির শ্যামল শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়াছিল।

চক্-স্থুম্ বেশ বড গ্রাম। গ্রামের নীচে নদীর কাছে দুইটি তপ্তজলের কুণ্ডা থাকায় এ-গ্রামের অন্য নাম চ্চু-কম্ (তপ্তজল)। এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহে লামার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া সকলে তপ্তজলে স্নান করিতে লাগিল। যাহা হউক, তখন তবু রাত্রের অন্ধকার ছিল, পরদিন দিনের বেলা স্নান করিতে গিয়া দেখিলাম, সঙ্গীরা সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া স্নান করিতেছে এবং আরও দেখিলাম যে, ঐস্থলে ভোটীয় পুরুষেরা স্ত্রীলোকের সম্মুখেই অম্লানবদনে নগ্ন হইয়া স্নান করিতেছে। বস্তুতঃ আমার মনে হয় শীতের ভয় না থাকিলে ইহারা কঙ্গো দেশের কাফ্রীদের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া ঘুরিত।

গ্রাম বড ছিল, কিন্তু যথেষ্ট ভেট আসে নাই: সেইজন্য ডাম হইতে আগত ভদ্র পুরুষ যদিও লামাকে বহন করার লোকের ব্যবস্থা করিয়া অগ্রে পৌঁছিবার জন্য অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই রওয়ানা হইয়াছিলেন, তথাপি লামা সমস্ত বিচার করিয়া আরও একদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই দিন লামা গরমজলে স্নান, গরম গরম মদ্যপান, ভক্তদের ভাগ্য-বিচার ও মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণে কাটাইলেন।

২৬শে মে আমরা চক্-স্থুম্ হইতে রওয়ানা হইলাম। এখানে আসিবার পরই আমি রিঞ্চেনের প্রদত্ত ভোটীয় ভিক্ষুর বস্ত্র পরিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শীতবায়ুর প্রকোপে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। ভয় হইতেছিল, এখান হইতেই ফিরিতে না হয়।

চক্-স্থুম ছাড়াইয়া কিছু দূর যাইতেই বৃক্ষলতার চিহ্নও পাওয়া গেল না, দূরে দূরে পর্ব্বতগাত্রে ঘাসের অন্বেষণে বিশালকায় চমরী চরিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। পথে দুই বার তুষারের উপর দিয়া চলিতে হইল। এখানে কাঠ দুষ্প্রাপ্য, দ্বিপ্রহরে যেখানে চা খাইলাম সেখানে ঘুঁটের দ্বারা আগুন জ্বালান হইয়াছিল। এখন পথ অতটা দুর্গম ছিল না। দূরে তুষারাবৃত গৌরীশঙ্করের রূপালী শিখর দেখা যাইতেছিল।

কূতী হইতে এক মাইল আগেই লামার জন্য ঘোড়া আসিয়াছিল, কিন্তু বহনকারী কুলি থাকায় তিনি সওয়ার হইলেন না। তিনি কয়েকজন অনুচরকে আগে যাইতে বলিলেন এবং আমাকেও তাহাদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কিন্তু আমার মনে মনে অন্য ভয় আছে, সুতরাং আমি লামার সঙ্গেই চলিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলাম। শেষে পাঁচটার সময় কূতী পৌঁছিলাম। নূতন মানী প্রতিষ্ঠার জন্য লামার নিকট চাউল আনা হইল। তিনি 'সুপ্রতিষ্ঠ বজ্র স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া মানীর চতুর্দ্দিকে ঐ চাউল নিক্ষেপ করিলেন।

আমাদের জন্য উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। পৌঁছিবামাত্রই অভিনব পাত্রে গরম চা ও লামার জন্য গরম ঘিয়ে ছোঁকা উৎকৃষ্ট মদ্য আসিল। আমার স্থান লামার কক্ষেই নির্দ্দিষ্ট হইল।

ছয়

তিব্বতের বিখ্যাত তান্ত্রিক কবি ও সিদ্ধপুরুষ জে-চুন্-মিলা-রে-পা'র নির্জ্জনবাসের স্থান বলিয়া লপ্-চী ভোটীয়াদিগের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডুক্পা লামা ঐখানেই তাঁহার শেষজীবন নির্জ্জনবাসে অতিবাহিত করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু লপ্-চীর পথের লা (গিরিসঙ্কট) তুষারপাতে দুর্গম বলিয়া কিছুদিনের মত যাত্রা স্থগিত রহিল। কুতীতে বাসস্থান বসতি সবই ভাল, বিশেষতঃ লবণ-ক্রেতা-বিক্রেতা অনেক দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া ভিড করিয়াছে, সুতরাং সেইখানেই আরও কিছুদিন তাঁহার বিশ্রাম করা প্রয়োজন হইল। কুতী পোঁছিবার পবদিনই আমি আমার পথপ্রদর্শক ও সাথীকে নেপালী তের মুহর (৫৷১০) দিয়া বিদায় দিলাম। তাতপানী পর্য্যন্ত আসার জন্য তাহার পারিশ্রমিক চার মুহর ধার্য্য হইয়াছিল, সুতরাং ঐ হিসাবে তাহার প্রাপ্য আট মুহর মাত্র এবং তাহাই তাহার নিজের হিসাবে যথেষ্ট। আশাধিক দক্ষিণা পাওয়ায় অতি সন্তুষ্টচিত্তে প্রচুর লবণ কিনিয়া সে দেশে ফিরিয়া গেল।

বর্ষা আগতপ্রায়। এই সময়ের পূর্ব্বের দুই তিন মাস কাল কুতীর পথঘাট লোকে ভরা থাকে। নেপালীরা চাউল, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্য লইয়া আসে এবং ভোটীয়ের দল ভেড়া বা চমরীর পৃষ্ঠে লবণ বোঝাই করিয়া আনে। কুতীতে অনেক নেপালী সওদাগরের দোকান আছে, তাহারা শস্য ও লবণ দুই-ই কিনিয়া রাখে, কেহ বা বিনিময়ে সোডা, শস্য বা লবণ গ্রহণ করে। লবণ ভিন্ন ভোটীয়েরা সোডাও বিক্রীর জন্য আনে। এই সকল পদার্থই তিব্বতের কয়েকটি হ্রদের কূলে পাওয়া যায় এবং এগুলির উপর শুল্কও নির্দ্ধারিত আছে। কুতীর এই বিরাট হাটে নেপালীরা যে- কোন ঘরে আশ্রয় লইয়া থাকে, কিন্তু ভোটীয়দের ভেড়া ও শত শত চমরীর পালের সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরেই থাকিতে হয়।

আমি যেদিন কুতী পোঁছিলাম সেই দিনই কয়েক জন নেপালী ব্যবসায়ী শীগর্চীর (টশী-লুন্-পো) পথে কুতীতে আসিল। এই পথে এখানেই শীগর্চী-লাসা-যাত্রী নেপালীরা

ঘোড়া ভাড়ার ব্যবস্থা করে। ভাড়া টশী-লুন্-পো পর্য্যন্ত ৪০-৪৫ সাং (তখন ১৲ টাকায় দেড় সাং)। এক ঘোড়ায় অত দূর যাওয়া যায় না, পথে কয়েকবার ঘোড়া বদল করা প্রয়োজন। এই ভাড়ায় ঘোড়া বদল মায় খাওয়া'থাকার ব্যবস্থা সবই ঘোড়াওয়ালা করে। আমিও আমার সঙ্গী এই সওদাগর দলের সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা রাজী হইল না। চারিদিকেই নিরাশ হইলাম। এদিকে ডুকৃপা লামার পূজায় লোকের সমাগম বাড়িয়াই চলিল। চাউল, 'খাতা' ও অল্পস্বল্প মুহর ক্রমেই স্তূপাকার ধারণ করিতে লাগিল, মাংস ও ডিম্বও নিবেদন হইতে থাকিল।

২৯শে মে ডুকৃপা লামার নিকট 'জোঙ্-পোন (জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট) মলাশয়ের তলব আসিল। সঙ্গীর দলের কেহ কেহ আমাকেও ঐ সঙ্গে যাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "আমরা বলিব তুমি লদাখী।" কিন্তু আমার কি আর অন্য কাজ নাই যে, "আয় ষাঁড়, আমায় গুঁতো" বলিয়া আমি আগাইয়া যাইব? সুতরাং ডুকৃপা লামার দলে আমি যাই নাই। জোঙ্ পোন্ আগেই ডুকৃপা লামার নাম শুনিয়াছিলেন, সুতরাং বিশেষ খাতির করিলেন। লামা মহাশয়ও ভাগ্য-ভবিষ্য গণনা ও মন্ত্রপূজাপাঠ করিলেন। সন্ধ্যার সময় দল ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম এখন একজন মাত্র জোঙ্-পোন্ আছেন, অন্য জন মৃত, তবে তাঁহার বিধবা সম্প্রতি কিছু কাজকর্ম্ম দেখেন। এখনও অন্য জোঙ্-পোন্ নিযুক্ত হন নাই। তিব্বতে প্রতি গ্রামে প্রধান (গোবা) আছে এবং প্রতি অঞ্চলে ইহাদের উপর জোঙ্-পোন্ থাকে, (জোঙ্ অর্থে কেল্লা এবং পোন্ অর্থে অধ্যক্ষ বা প্রধান কর্ম্মচারী) এবং এই জোঙ্ সাধারণতঃ পাহাড় বা টিলার উপর স্থাপিত হয়। কুতীর নিকট সেরূপ পাহাড় না থাকায় কেল্লা নীচের ভূমিতে স্থাপিত।

ছোট ও বড় প্রদেশ হিসাবে জোঙ্-পোন্ পদেরও স্তরভেদ আছে এবং প্রতি জোঙ্ দুইজন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে যাহাদের মধ্যে একজন গৃহস্থ ও অন্যজন সাধু-সন্ন্যাসী। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়, যেমন এখন কুতীতে হইয়াছে। জোঙ্-পোনের উপরে সাক্ষাৎ দালাই লামার গভর্নমেন্ট ; ন্যায় ও ব্যবস্থা এই দুই ব্যাপারেই জোঙ্-পোনের যথেষ্ট অধিকার, এমন কি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এক-একটি রাজা বলিলে হয়। ইহাদের নিয়োগ লাসা হইতেই হয় এবং অধিকাংশই দালাই লামার কৃপাপাত্রগণের আত্মীয় বা প্রেমাস্পদ। এমন যে জোঙ্-পোনের স্থান শূন্য তাহার বিরুদ্ধে এই প্রদেশের প্রজাগণ লাসায় আবেদন করে। দরবার তাহাদের দুঃখ-গাথা শুনিয়া বিরূপ হইয়াছেন এই কথা শুনিয়া ঐ জোঙ্-পোন্ লাসার নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন বলিয়া শুনিলাম।

নেপাল-সরকারের নিয়ম অনুসারে ভোটদেশে বাণিজ্যের জন্য যাইতে হইলে নেপালী ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ পত্নীকে দেশে ছাড়িয়া যাইতে হয়। এইজন্য প্রায়

সকল নেপালী ব্যবসায়ীর ভোটীয়-স্ত্রী রক্ষিতা হিসাবে থাকে, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যা হয়। তিব্বতের স্থানে স্থানে নেপালীদের বিশেষ অধিকার অনুসারে নেপালের প্রজাদের বিচার নেপাল-সরকার-নিযুক্ত বিচারক করেন। এইরূপ বিচারকের নেপালী নাম 'ডিঠা'। কেরোং, কুতী, শীগর্চী, গ্যাঞ্চী ও লাসায় নেপাল-সরকারের 'ডিঠা' আছে। লাসায় সহকারী ডিঠা ও নেপালরাজদূত আছে, গ্যাঞ্চীতেও রাজদূত আছে। ইহাদের বিচারে ভোটীয় স্ত্রীর গর্ভজাত নেপালীর পুত্র নেপালের প্রজা, কন্যা তিব্বতের প্রজা! এইরূপ সন্তানের নেপালী নাম 'খচরা'। তাহাদের মাতাপিতার সম্পত্তির উপর এই সন্তানদেরও কোন অধিকার থাকে না—পিতা স্বেচ্ছায় যাহা দেয় তাহাই তাহারা ভোগদখল করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সত্ত্বেও ইহারা নেপালী পিতা ও পতির কারবারের যেরূপ সহায়তা করে তাহা আশ্চর্য্যজনক।

* * * * *

৩০শে মে পর্য্যন্ত আমি অগ্রসর হইবার কোনই উপায় করিতে পারিলাম না। কুতীর নিকটস্থ নদীর পুলের পাশে রাহদারী (লম্-ইক্, অর্থাৎ পাসপোর্ট) দেখিবার লোক আছে। নদী পার হইবার পরও য়া-লেপ্-এ পুনর্ব্বার রাহদারী দেখাইতে হয়। যখন এই সব ঘাঁটি পার হওয়ার কোনও উপায় দেখিলাম না, তখন ঠিক করিলাম মঙ্গোলীয় ভিক্ষু সুমতি-প্রজ্ঞকে বলিয়া দেখি তিনি যদি কিছু করিতে পারেন। তিনি তখন কুতীতেই ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন। তিনি মহা খুশী হইয়া বলিলেন, আমি কাল লম্-ইক আনিব এবং আমরা কালই এখান হইতে যাত্রা করিব। তিনি তো নিশ্চিন্ত মনে একথা বলিলেন, কিন্তু আমার ঘোর সন্দেহ ছিল কাজটা এতই সোজা হইবে কিনা। আমি একজন ভারতীয় 'সাধুবাবা'কে প্রায়ই দেখিতাম, যিনি দুই মাস যাবৎ এখানে আটকাইয়া আছেন, আগে যাওয়া বা পিছনে ফেরা কোনটাই করিতে পারিতেছেন না। যাই হউক, একবার চেষ্টা করায় দোষ কি?

সেই রাত্রে এক নেপালী সওদাগরের গৃহে ভূত-প্রেত বিতাড়ন ও ভাগ্য প্রসন্ন করার জন্য পূজাপাঠ করিতে ডুক্পা লামার আমন্ত্রণ হইয়াছিল, আমি সেখানে চলিলাম। অনেক স্ত্রীপুরুষ বাল-বনিতার ভিড়ের মধ্যে এ-ব্যাপারের আয়োজন হইল। মনুষ্য-জঙ্ঘার হাড়ের বীণ, যুগ্ম নরকপালের ডমরু ইত্যাদি ভয়াবহ উপকরণ লইয়া সশিষ্য ডুক্পা লামা পূজায় বসিলেন।

ঘৃত-দীপের ক্ষীণ আলোক ক্ষীণতর করা হইল, পূজারীবৃন্দকে পর্দ্দায় ঘেরা হইল। তাঁহাদের ঋষভকণ্ঠের মৃদুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ, ক্ষণে ক্ষণে ডমরুর নিনাদ ও তাহার সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুর করুণ ক্রন্দনের শব্দের মত হাড়ের বীণের স্বর, এইরূপ

আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া মন্ত্রমুগ্ধ না হওয়া দুরূহ। পূজা অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল, তাহার পর সমবেত মণ্ডলীকে পূজা-জলে অভিষেক করিলে পরে সকলে নিদ্রার আয়োজন করিতে গেল।

৩১শে মে প্রত্যূষেই আমি যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একত্র করিতে লাগিলাম ও সুমতি-প্রজ্ঞকে লম্-ইকের চেষ্টায় রওয়ানা করাইয়া দিলাম। সে সময় আমার কাছে ষাট বা সত্তর টাকা মাত্র ছিল। তাহার মধ্যে ত্রিশ টাকার নোট আলাদা বাঁধিয়া বাকী টাকার কিছু মালপত্র কিনিলাম, কিছু ভাঙাইয়া ভোটীয় টঙ্কা সংগ্রহ করিলাম। টাকায় নয় টঙ্কা দর পাওয়া গেল, যদিও মুদ্রা প্রায় সবই অর্দ্ধ-টঙ্কা পাইলাম। শীতের ভয়ে চার টাকায় একটি ভোটীয় কম্বল কিনিলাম, মাথার আবরণ হিসাবে ডাম্ গ্রামের সজ্জনের কাছে পীতবর্ণ পশমের টুপী উপহার পাইলাম। কিছু চিঁড়া, চাউল, চীনা চা, সত্তু ও মশল্লা ইত্যাদিও কিনিলাম, কিন্তু এর পর নিজের সকল বোঝা নিজের কাঁধেই বহিতে হইবে সেজন্য সবই অল্প পরিমাণে লইলাম। ডুক্‌পা লামা আমাকে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন, ইতিমধ্যে সুমতি-প্রজ্ঞ আমাদের দু-জনার জন্য ছাড়পত্র লইয়া আসিলেন। দুই মাসের ঘনিষ্ঠতার পর বিদায়ের সময় আমি ও সঙ্গীদের সকলেই প্রায় মিত্র-বিয়োগের দুঃখ অনুভব করিলাম। ডুক্‌পা লামা অতি সহৃদয়তার সহিত আমার মঙ্গলকামনা করিলেন এবং চা ও কিছু কিছু অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিলেন।

মোট বহিবার বাঁকের মধ্যভাগে মালপত্র বাঁধিয়া পিঠে করিয়া, হাতে লম্বা লাঠি লইয়া তীর্থযাত্রীর বেশে বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা দুইজনে কুতী হইতে রওয়ানা হইলাম। অল্পক্ষণেই পুল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দেখিলাম, ছাড়পত্র-পরীক্ষক সেখানে নাই। পুলটি সাধারণ কাঠ পাতিয়া তৈয়ারা করা হইয়াছে, তাহা পার হইতেই চড়াই আরম্ভ হইল। বোঝাস্কন্ধে জীবনে এই প্রথম চলিতে হইতেছে, সুতরাং চড়াইয়ের কষ্টের কথা আর কি বলিব! মাঝে মাঝে কেবল মনে হইতেছিল যে, প্রত্যেক মানুষেরই এই অভ্যাস রাখা উচিত। অল্প চড়াইয়ের পরই আমরা কোশী নদীর দক্ষিণবাহিনী মুখ্য ধারার সঙ্গে সঙ্গে উপরে চড়িতে লাগিলাম। পথ সাধারণ চড়াইয়ের, বোঝাও বিশ-পঁচিশ সেরের অধিক নহে, তবুও অল্প দূর যাইতেই কাঁধ ও জঙ্ঘায় বিষম ব্যথা আরম্ভ হইল। সুমতি-প্রজ্ঞ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সেরের বোঝা কাঁধে অম্লানবদনে গল্পগুজব করিতে করিতে চলিতেছিলেন। আমার তখন কথা বলা দূরে থাক, কথা শোনাও বিরক্তিজনক মনে হইতেছিল। নদীর কূলের উপত্যকা চওড়া, কিন্তু কোথাও বৃক্ষের চিহ্নমাত্র নাই। পথের ধারে এক-আধটি ঘরও দেখা যাইতেছিল—ঠিক যেন পাথরের স্তূপ—এবং দু-চারটি শস্যের ক্ষেতও এখানে-ওখানে ছিল।

ডাম্ গ্রামের সজ্জনেব লপ-চী যাইবার কথা ছিল, সকালেই তিনি বাহির হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার টশী-গঙে থাকিবার কথা। সুমতি-প্রজ্ঞ পরামর্শ দিলেন যে, আজ আমাদেরও সেখানেই থাকা ভাল। সন্ধ্যা-নাগাদ ফর্-ক্যে-লিঙ মঠ (গুম্বা) দেখা দিল। গুম্বার আগে একটি ছোট গ্রামে বোঝা বহিবার লোকের খোঁজ করিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না ; সুতরাং গুম্বায় চলিয়া গেলাম। গুম্বার বাহিরের রূপ অতি সুন্দর, সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিক্ষুর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। বোঝা বাহিরে রাখিয়া আমরা দেবদর্শনে চলিলাম। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য নানা দেবদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি, নানা প্রকারের সুন্দর বর্ণরঞ্জিত চিত্রপট ও ধ্বজা প্রভৃতি অখণ্ড দীপেব আলোকে প্রকাশিত ছিল। মঠে জে-চুন-মিলার সম্মুখে স্থাপিত ছঙ (কাঁচা মদ) দেখিয়া আমি সুমতি-প্রজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা তো গে-লুক্-পা (পীতটুপিযুক্ত লামা-সম্প্রদায়) শ্রেণীব মঠ, তবে এখানে মদ্য কেন ? তিনি বলিলেন, জে-চুন-নিলা সিদ্ধপুরুষ,—সিদ্ধপুরুষ ও দেবতাদিগেব ভোগে গে-লুক্-পা সম্প্রদায়ও মদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের নিজেদের ইহা পান করা নিষিদ্ধ। মন্দিরেব বাহিরে আসিয়া দেখিলাম আমাদেব জন্য চা আসিয়াছে ; মন্দিবের অঙ্গনে বসিয়া দু চার পেয়ালা চা পান কবিলাম। ভিক্ষুগণ আমার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা কবায়, সুমতি-প্রজ্ঞ লাসার ডেপুঙ গুম্বা ও আমি লদাখেব নাম করিলাম। আমরা বলিলাম যে, গ্য-গর্ (ভারতবর্ষ) দোর্জে-দন্ (বজ্রাসন, মধ্যযুগ হইতে সংস্কৃত লিপিলেখে বুদ্ধগয়ার এই নাম প্রচলিত) তীর্থ-দর্শন করিয়া আমরা লাসায় ফিরিতেছি।

আমি এ-সময় অত্যন্ত ক্লান্ত। সবসুদ্ধ কুতী হইতে পাঁচ মাইল মাত্র আসিয়াছি, তবুও আমার পক্ষে এক পাও চলা দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল। এমন সময় ওখানে টশী-গঙ-এর এক বালক বলিল, ডাম্ গ্রামের 'কুশোক' (ভদ্রলোক) টশী-গঙে বিশ্রাম করিতেছেন। সুমতি-প্রজ্ঞ তৎক্ষণাৎ ওখানে যাইতে চাহিলেন, আমিও ভাবিলাম সেখান হইতে কাল হয়ত মোট বহিবার লোক পাওয়া যাইবে এবং এই আশায় যাইতে স্বীকার করিলাম। মঠেই সন্ধ্যার অন্ধকার আরম্ভ হইয়াছিল, আমরা সেই বালকের পিছু পিছু চলিলাম। নদীর কিনাবা ধবিয়া কিছু দূর গিয়াই পুল পাওয়া গেল এবং পার হওয়া গেল। আরও কিছু পরে চষা ক্ষেত, তাহাতে বুঝিলাম এবার গ্রামের নিকট আসিয়াছি। খানিক পরে কুকুরের ডাকে বুঝিলাম গ্রাম আরও নিকটে। কিন্তু শুনিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থল আরও দূরে। শেষে কোনক্রমে ডাম্ গ্রামের সজ্জনের বিশ্রামস্থানে পৌছিলাম।

তিনি সে সময় লোহার চুল্লিতে আগুন দিয়া পাতলা খিচুড়া রন্ধনে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেখিয়া অতি প্রসন্ন হইয়া তাড়াতাড়ি বিছানা বিছাইয়া দিলেন। আমিতো

বোঝা ফেলিয়া সটান শুইয়া পড়িলাম। চা তৈয়ার ছিল, থুক্‌পাও (খিচুড়ী) অল্পক্ষণ পরে প্রস্তুত হইল, তখন উঠিয়া দুই তিন পাত্র গরম থুক্‌পা খাইয়া একটু 'ধাতস্থ' হইয়া চা-পান করিতে করিতে পরদিনের 'প্রোগ্রাম' ঠিক করিতে লাগিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, 'লপ্‌-চী' মহাতীর্থ (চা-ছেন-বো), উহা জে-চুন-মিলার সিদ্ধস্থান, চলুন আমরাও ইঁহার সঙ্গে ওখানে যাই। লপ্‌-চী যাইতে হইলে আমাদের সোজা রাস্তা ছাড়িয়া উচ্চ লা (গিরসঙ্কট) পার হইয়া পূর্ব্ব দিকে তুম্বা কোশীর ঘাঁটিতে যাইতে হইবে, পথে একটি জোঙ্‌ও পড়িবে। সেখান হইতে আবার দুইটি লা পার হইলে তবে পুনরায় আমাদের গন্তব্য তিঙ্‌রী যাইতে পারিব। এই সব বাধাবিঘ্নের কথা ভাবিয়া আমার মন তো ওদিকে কোন মতেই যাইতে চাহিতেছিল না, কিন্তু সে কথা বলিয়া নাস্তিকতার পরিচয় দেওয়াও কঠিন! পরে যখন তাঁহারা আমার বোঝা বহিবার লোকের ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন, তখন আমার আর আপত্তির উপায়ই বা রহিল কোথায়? শেষে রাজী হইলাম, এবং স্থির হইল কাল খাওয়াদাওয়ার পরই যাত্রা করা যাইবে।

পরদিন পূর্ব্বকথামত দ্বিপ্রহরে রওয়ানা হওয়া গেল। আমার খালি-হাত, সুতরাং মহানন্দে চলিতে লাগিলাম। পথ ক্রমেই চড়াইয়ের দিকে চলিল, ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের পর টুপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরিচ্ছদ পশমী হওয়ায় ভোটীয়েরা বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপও করে না, সুতরাং আমরা চলিতে থাকিলাম। কিছু দূরে এক জায়গায় পথ বক্র ও ঢালু পর্ব্বতপার্শ্বের উপর দিয়া গিয়াছে, সেখানের মাটি নরম এবং মধ্যে মধ্যে মাটি ও পাথরের রাশি খসিয়া সশব্দে কয়েক শত ফুট নীচের খাদে পড়িতেছে। আমার তো ঐ দৃশ্যে হৃৎকম্প আরম্ভ হইল, কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, আমিও না ঐ মাটি-পাথরের সঙ্গে নীচের খাদে চলিয়া যাই। সঙ্গীরা বোঝা-স্কন্ধে বেপরোয়া চলিতে লাগিলেন। পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া একজন আমাকে তাঁহার হাত ধরিতে বলিলেন, কিন্তু আমি নিজেকে নির্ভয় বলিয়া পরিচিত করিতে চাহি, সুতরাং বিনা সাহায্যেই প্রাণ হাতে করিয়া কোন প্রকারে ঐস্থান পার হইলাম। আমার ভোটীয় জুতা বিশেষ ঢিলা হওয়ায় একটু ভয়ের কারণ ছিল, কেননা তাহাতে পা হড়্‌কাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আরও উপরে উঠিতে বৃষ্টির বিন্দুর বদলে এলাচদানার মত ছোট ছোট নরম বরফ পড়িতে লাগিল। আমরা সে-সব গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া বেলা দুইটার সময় লর্সেতে (লার নীচে থাকিবার জায়গা) পৌঁছিলাম। তখন বরফ পেঁজা-তুলার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের আকারে পড়িতেছিল। সঙ্গীদের কতক চমরীর ঘুঁটের সন্ধানে মাঠে ছুটিলেন, অন্যেরা পাথরে দড়ি বাঁধিয়া ছোলদারী তাম্বু দাঁড় করাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। এ জায়গাটা প্রায় চৌদ্দ-পনের হাজার ফুট উঁচু,

কাজেই শীত খুব, উপরন্তু ক্রমাগত তুষারপাত হওয়ায় শৈত্যের আধিক্য বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কোনপ্রকারে ছোলদারী দাঁড় করাইয়া তাহার ভিতর ঘুঁটের আগুন জ্বালান হইল। আমরা সবাই চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলাম, ঘুঁটেতে বাতাস দিয়া আগুন জ্বালাইয়া চা-সুদ্ধ জল চড়াইয়া দেওয়া গেল। চারিদিকের জমি তুষারে ঢাকিয়া গেল, মাঝে মাঝে ছোলদারীর চাল নাড়াইয়া বরফের রাশি ফেলিতে হইতেছিল। আগুনও যেন শীতে আড়ষ্টপ্রায়—অত উচ্চে জল ফুটান দুরূহ নহে, কিন্তু ফুটন্ত জলের উত্তাপ অল্প—অতি কষ্টে চা প্রস্তুত করা গেল। চা যদিবা হইল, তাহাতে মাখন দিয়া মন্থন করে কে? প্রত্যেকের পেয়ালায় মাখনের টুকরা ফেলিয়া তাহার উপর গরম কালো চা ঢালিয়া দেওয়া হইল। কুশোক (ভদ্র পুরুষ) তাঁহার কাছে যে ছোট বিস্কুট ও কমলালেবুর মিঠাই ছিল, তাহা সকলকে দিলেন। আগুনের ঐ অবস্থায় থুক্‌পা রন্ধন অসম্ভব, সুতরাং অন্যেরা সত্তু খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন, আমি চায়ের মধ্যে চিঁড়া ফেলিয়া খাইলাম।

চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ঘিরিয়া আসিল, কুশোক তাঁহার লণ্ঠন জ্বালাইয়া আমাকে 'বোধিচর্য্যাবতার' হইতে পাঠ করিতে বলিলেন। আমার কাছে উক্ত পুস্তকের সংস্কৃত ভাষার সংস্করণ ছিল এবং তাহার তিব্বতী অনুবাদের সমস্ত শ্লোক কুশোকের কণ্ঠস্থ ছিল। আমি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও তাহা ভাঙা ভোটীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে লাগিলাম, কুশোক ভাবার্থ বুঝিয়া তিব্বতী শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মচর্চ্চা করার পর সকলেই সেই ছোলদারীর নীচে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া পড়িলাম। শৈত্যের প্রভাবে অস্নাত জনমণ্ডলীর কাপড়ের দুর্গন্ধ পাইলাম না বটে, কিন্তু সকালে উঠিয়া বুঝিলাম যে, আমার কাপড়ের মধ্যে কয়েক শত উকুন আশ্রয় লইয়াছে। কাপড়চোপড়ে খুঁজিয়া অনেকগুলি বাহিরও করিলাম। সারারাত বরফ পড়িয়াছে দেখিলাম, ছোলদারীও বহুবার ঝাড়িতে হইয়াছে শুনিলাম।

প্রাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কাল যে-ভূমি নগ্ন ছিল আজ তাহা এক ফুটের অধিক পুরু তুষারের আবরণে আচ্ছাদিত। তুষারস্তূপ গলিয়া একটি ক্ষীণ ধারা নীচের দিকে বহিতেছে, সেখানে গিয়া মুখ হাত ধুইলাম। আগুনের জন্য ঘুঁটে পাওয়া অসম্ভব, সুতরাং চায়ের আশা ছাড়িয়া বিস্কুট ও কমলালেবুর মিঠাই খাইয়া প্রাতরাশ শেষ করিলাম।

সুমতি-প্রজ্ঞ উপরে চারিদিকের তুষারস্তূপ দেখিয়া বলিলেন, এখানেই এত বরফ, উপরের লা নিশ্চয়ই আরও তুষারাবৃত—এদিকে তুষারপাত সমানে চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের লপ্‌-চী যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করাই উচিত। আমি তো তাহাই চাই।

কুশোকের কাছে বিদায় লইলাম, তাঁহাকে লপ্-চী যাইতেই হইবে। পুনরায় নিজের বোঝা কাঁধে করিয়া নীচের দিকে চলিলাম। পথও তুষারাবৃত, তবে উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বরফের আবরণী পাতলা হইয়া আসিল। শেষে তুষারহীন ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম, এখানে টুপ্‌টাপ্ বৃষ্টি চলিয়াছে। এইরূপে ভিজিতে ভিজিতে বেলা দশটায় আমরা টুশী-গণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া, সেখানকার গোবার (মোড়ল) গৃহে আশ্রয় লইলাম। গোবা আমাকে আশ্বাস দিলেন যে পরদিনের গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য-ভারবাহী লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাদের দু-জনেরই জুতার তলা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, গোবার ছেলেকে কিছু পয়সা দিয়া তাহাও মেরামত করাইয়া লইলাম। এইরূপে ২রা জুন সেইখানেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা চমরীর দুগ্ধের ঘোলে সত্তু মাখিয়া খাইলাম, রাত্রে সুমতি-প্রজ্ঞ ভেড়ার চর্ব্বি দিয়া থুক্‌পা রাঁধিলেন। শুনিলাম, কুশোকের দলের কয়েক জন বরফের মধ্যে রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন,আমরা গেলে আমাদেরও ঐ দশা হইত।

* * * * *

চা- সত্তু খাইয়া, ভারবাহীর পিঠে মালপত্র চাপাইয়া, ৩রা জুন সকাল ৭-৮ টার সময় আমরা রওয়ানা হইলাম। ভারবাহীর পক্ষে এক মণ দেড় মণ বোঝা তুচ্ছ, সুতরাং আমি খালি হাত এবং সুমতি-প্রজ্ঞের বোঝাও খুবই হাল্কা, রাস্তাও বরাবর উৎরাই চলিয়াছে। বেলা এগারটার মধ্যেই আমরা তর্গ্যে-লিঙ গ্রামে পৌঁছিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ চতুর্থবার এই পথে ফিরিতেছেন,এইজন্য পথের পাশের বসতিগুলিতে স্থানে স্থানে তাঁহার পরিচিত লোক ছিল। এখানেও মোড়লের গৃহেই আমাদের স্থান হইল। গৃহকর্ত্রী পঞ্চাশোর্দ্ধবয়স্কা, তাহার স্বামীর বয়স অনেক কম। তিব্বতে এই ব্যাপার খুবই সাধারণ। আমি তো প্রথমে এই দম্পতীর পতি-পত্নী সম্বন্ধ বুঝিতেই পারি নাই। যখন দেখিলাম পুরুষটি স্ত্রীর চুল খুলিয়া তাহা ধোওয়া ও চাঙ প্রদেশের ধনুকাকার শিরোভূষণে তাহার সম্বরণে সাহায্য করিতেছে, তখন জিজ্ঞাসা করায় আসল সম্বন্ধ জানিলাম।

সুমতি-প্রজ্ঞ বৈদ্য, তান্ত্রিক এবং ভাগ্যগণনায় পটু ; তিনি চা-পানের পর গ্রামের ভিতর চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা এক বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে সন্তান লাভের জন্য যন্ত্রদান করিতে যাইতেছেন। তিনি ভোটীয় অক্ষর লিখিতে পারেন না, সুতরাং আমাকে প্রয়োজন। শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। বলিলাম, প্রৌঢ়ার উপরও আপনি আপনার বিদ্যার পরীক্ষা করিতে চাহেন ? তিনি বলিলেন, ওখানে হাসি ও না যেন, ধনী স্ত্রীলোক, উপস্থিত কিছু সত্তু মাখন লাভ হইবেই,

এবং যদি তীর লাগিয়া যায় তবে ভবিষ্যতের জন্য একটি উত্তম যজমানও হইয়া থাকিবে। আমি বলিলাম, তার লাগিবার কথা ভুলিয়া যান, তবে হাঁ, উপস্থিত দেখা ভাল। সেখানে গিয়া দরজা পার হইতেই এক মহাকায় কুকুর শিকল নাড়িয়া গর্জ্জন আরম্ভ করিল। বাড়ীর এক ছোট ছেলে তাহার কাপড়ে কুকুরের মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলে তবে আমরা তাহাকে পার হইয়া উপরতলার সিঁড়িতে উঠিতে পারিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ গৃহপত্নীকে ঔষধ-যন্ত্র ও পূজা-মন্ত্র দিলেন, আমাদের সের-দুই সত্তু, কিছু চর্ব্বি ও চা দক্ষিণা জুটিল। ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে সঙ্গে লোক লইয়া পথে অগ্রসর হওয়া গেল। গ্রামের কাছেও বৃক্ষের চিহ্ন নাই, ক্ষেতগুলিতে সবে মাত্র চাষ আরম্ভ হইয়াছে। লাল পশমের গুচ্ছে সজ্জিত বিশালকায় চমরীতে হল টানিতেছে; কোথাও কোথাও চাষী হলকর্ষণের সঙ্গে গান জুড়িয়া দিয়াছে। দ্বিপ্রহরে য়া-লেপ্ পৌঁছান গেল। গ্রামের অল্প নীচেই প্রাচীন লবণের ঝিল শুকাইয়া আছে। য়া-লেপে পুরানো আমলের চীনা দুর্গ আছে। কিছু দূরে নদীর ওপারেও কাঁচা দেওয়ালযুক্ত কেল্লার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। চীন-সাম্রাজ্যের প্রভুত্বের সময় য়া-লেপের দুর্গে কিছু সৈন্য থাকিত। এখনও সরকারী লোকজন সেখানে আছে, কিন্তু দুর্গ শ্রীহীন দেখা যায়; ঘর-দেওয়াল সবই মেরামতের অভাবে জীর্ণ।

এক পরিচিত গৃহস্থের ঘরে চা-পান ও সত্তু-ভোজন করা গেল। সুমতি-প্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীকে বুদ্ধগয়ার প্রসাদী কাপড়ের টুকরা দিলেন। এই স্থানে লম্-ইক (ছাড়পত্র) লওয়া হয়। ইহার পর আর পাসপোর্টের হাঙ্গামা নেই। সেইজন্য একজন পরিচিত লোকের হাতে সেগুলি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার দেওয়া গেল। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরের পথে আসিবামাত্র একটা প্রকাণ্ড কুকুর হাড-চিবান ছাড়িয়া আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। এই সব শৈত্যাধিক্যের দেশের কুকুরের গায়ে শীতকালে লম্বা লোমের নীচে নরম পশম জন্মায় যাহাতে উহাদের শীতের প্রকোপ লাগে না। গ্রীষ্মকালে সেই লোম ও পশম সাপের খোলসের মত ঝরিয়া পড়ে। এই কুকুরটারও সেই রকম 'খোলস-ছাড়া' অবস্থা ছিল। যাই হোক, আমরা তিনজন লোক ছিলাম, কাজেই কুকুরে কি ভয়? য়া-লেপ হইতে প্রায় তিন মাইল পথ চলিবার পর দক্ষিণ দিকে লে-শিঙ্ ডোল্মা গুম্বা নামক ভিক্ষুণীদের বিহার দেখা গেল। এখানে নদীর ধারা অতি ক্ষীণ, কিছুদূর যাইয়া আমরা নদী পার হইয়া অন্য পারে চলিয়া আসিলাম। এ দিকে দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রের সারি; ছোট ছোট নালী দ্বারা আনীত নদার জলে সেচকার্য্য চলিতেছিল আরও কিছু দূর গিয়া আমরা থো-লিঙ গ্রামে পৌঁছিলাম। এই গ্রামটিতে বিশ-পঁচিশ ঘর লোকের বাস এবং ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তের-চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ। তর্গ্যো-লিঙ্ হইতে যে-লোক আনা হইয়াছিল, তাহার এই গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবারই

কথা ছিল। সে প্রথমে তাহাব পবিচিত এক গৃহে আমাদেব লইয়া গেল, সেখানে বাজকর্ম্মচাবী বা উচ্চপদস্থ লোকেবা আসিয়া থাকেন শুনিযা আমাব থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। পবে সুমতি-প্রজ্ঞেব পবিচিত এক ঘবে যাওয়া গেল, সেটি গ্রামেব মধ্যভাগে স্থিত। সেখানে কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ বৌদ্রে বসিয়া সূতাকাটা ও তাঁত চালাইবাব ব্যবস্থা কবিতেছিল, সুমতি-প্রজ্ঞকে দেখিযা 'জ্জু-দন্‌জ' (আগন্তুকেব অভ্যর্থনা) কবিযা দাঁড়াইল। ঘবেব ভিতব হইতে পবিচিত কয়েকজন লোক বাহিবে আসিলে পবে আমাদেব থাকিবাব স্থান ইত্যাদিব ব্যবস্থা হইল। বাড়ীটি দু-তলা, চতুর্দ্দিকে কুঠবি, মধ্যে ধোঁয়া বাহিব হইবাব জন্য মাটিব ছাদে বড় ছিদ্র আছে।

সুমতি-প্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীকে কিছু চা তৈয়াবী কবিবাব জন্য দিলেন। গৃহকর্ত্রীব মুখ, হাত ও কাপড়চোপড়—সকলেবই উপব মোটা কাজলেব মত তেল-কালিব এক স্তব জমিযাছিল। সে বহুমুখী-চুল্লীব উপব জল ও চা চড়াইযা ভেড়াব নাদিব ইন্ধনে বাতাস দিযা আঁচ তুলিল। চা ফুটিতে আবম্ভ কবিলে তাহাতে অল্প ঠাণ্ডা জল দিযা নামাইয়া লম্বা কাঠেব চোঙায় ঢালা হইল। সুমতি-প্রজ্ঞ এক ডেলা মাখন দিতে, মাখন ও লবণ চায়ে দিযা আট-দশ বাব মন্থন দণ্ড চালাইতেই চা, মাখন ও লবণ মিশ্রিত হইয়া সফেন পানীয়ে পবি-



রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও তাঁহার সঙ্গী

ণত হইল। চা-মন্থনেব পাত্রটি এক মুখ বন্ধ (অন্য মুখেব ঢাকনিব মধ্য দিয়া মন্থনদণ্ড চলে) দুই আড়াই হাত লম্বা পিচকারীব মত। মন্থনীটি পিচকারীব মত উপব-নীচে চালাইলে ভিতবে সজোবে হাওয়া যাওয়ায় পিচকাবীব দণ্ডেব মুখেব গোল চাকতিতে তবল চা ও মাখন আলোড়িত হইয়া সবই দ্রুত মিশিয়া যায়।

এখান হইতে যাইবার পথে আমাদের থোঙলা (থোঙ নামক গিরিসঙ্কট) পার হইতে হইবে। ভারবাহী লোক লওয়া অপেক্ষা ঘোড়ায় যাওয়াই শ্রেয় মনে হইল, এবং সেইজন্য এখান হইতে লঙ-কোর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য আঠার টঙ্কায় (দুই টাকায়) দুটি ঘোড়া ভাড়া করা হইল।

সাত

পরদিন সঙ্গে লোক লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলাম। এই নির্জ্জন বনস্পতিহীন দেশে, কোশী নদীর ক্ষীণ ধারা চারিদিকের মৃত্তিকাময় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বহিতেছিল। স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত গৃহ ও গ্রামের চিহ্ন পাওয়া গেল, কোন-কোনটার বাহিরে দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। মনে হয়, পূর্ব্বকালে এই উপত্যকায় বিস্তৃত লোকবসতি ছিল। নদীর ধারাও নিশ্চয় এখন অপেক্ষা অনেক পুষ্ট ছিল, নহিলে এত ক্ষেতের সেচ চলিত কি প্রকারে? আগের গ্রামে শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্ব বৎসর এই থোঙলার পথে দুইজন যাত্রীকে কাহারা খুন করিয়াছিল। ভোটদেশে মানুষের প্রাণের মূল্য কুকুরের অপেক্ষাও কম, রাজদণ্ডের ভয়েও লোকের প্রাণরক্ষা হয় না। সুমতি-প্রজ্ঞ এ বিষয়ে বিস্তর মন্তব্য করিলেন।



আবার ঘোড়ার পিঠে যাত্রারম্ভ

উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতেছিল, এইভাবে আমরা গিরিসঙ্কটের নীচে লহর্সেতে (বিশ্রামের স্থল) পৌঁছিলাম। সেখানে পাহাড়ের ওপার হইতে আসিয়া কতকগুলি লোক চা প্রস্তুত করিতেছিল। পথ-চলার কালে ভোটদেশে ডাথী (হাত পাখা ও কুলা জাতীয় বাতাস করিবার দ্রব্য বিশেষ) অত্যাবশ্যক জিনিষ; ইহার সাহায্য ব্যতীত ভিজা ঘুঁটে ইত্যাদির দ্বারা আগুন জ্বালানো অসম্ভব। আমাদের ডাথী ছিল না, সুতরাং আমরা অন্য আগন্তুকদের

সঙ্গে আমাদের চা মিশাইয়া দিলাম। ঘোড়াগুলিকে চরিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং আমরা চা ও গল্পে জমিয়া গেলাম, শুনিলাম লা (গিরিসঙ্কট) এখন তুষারশূন্য। লোকগুলির মুখের বর্ণ পুরানো তামার মত, তিব্বতের উচ্চঘাট-পথে চলিবার সময় শরীরের যে অংশ অনাবৃত থাকে তাহা ঐরূপ কালিমাখা হয় এবং সেই রং প্রায় দেড় সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে।

আবার ঘোড়ার পিঠে যাত্রারম্ভ করা গেল। এবার চড়াই খুব বেশী নহে কিম্বা অন্যের পিঠে থাকার দরুণ তত বেশী মনে হয় নাই। ঘাটের পথ ক্রমশঃই সরু হইতে থাকিল, শেষে নদীর ধার মাত্র রহিল যাহারও স্থানে স্থানে—কোথাও বা অনেকখানি—পুরানো বরফের স্তরে ঢাকা ছিল। পথ নদীর এপার-ওপার হইয়া শেষে দক্ষিণ পার্শ্বের পর্ব্বতের গায়ে গোলকধাঁধার চক্রের মত বক্রভাবে উপরে চলিল। ঘোড়াগুলি মাঝে মাঝে নিজে নিজেই যাইতেছিল, কারণ এত উপরে হাওয়ার স্তর অত্যন্ত পাতলা। শেষে অদূরে কালো সাদা পীতাভ কাপড়ের পতাকা দেখা গেল, বুঝিলাম লা'র শিখর নিকটেই। ভোটদেশে প্রত্যেক লা কোন দেবতার স্থান, সুতরাং দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য লা'র শিখরের কাছে লোকে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়ে। আমরাও নামিলাম এবং সুমতি-প্রজ্ঞ ও অন্য ভোটীয়েরা 'শো শো শো' বলিয়া দেবতার জয়ধ্বনি করিলেন। শিখর হইতে সুদূর দক্ষিণে দিগন্ত বিস্তৃত হিমাচ্ছাদিত হিমালয়ের পর্ব্বতমালা দেখা গেল। অন্যদিকেও পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সেগুলি তুষারমণ্ডিত নহে, তবে উপত্যকার আশপাশে স্থলে স্থলে বরফ ছিল। আমার ঘোড়াটি ছিল অলস, তাহাকে প্রহার করা আমার দ্বারা হইল না। সুতরাং আমি সকলের পিছনে পড়িলাম। পথে লোকজন নাই, মাঝে মাঝে আশপাশের বসতি হইতে পথের ঠিকানা লইতে লইতে, অন্যদের প্রায় তিন-চার ঘণ্টা পরে আমি লঙ্কোর পৌঁছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার দেরি হওয়ায় সুমতি-প্রজ্ঞ অত্যন্ত চটিয়া গেলেন।

লঙ্কোর তিঙরীর বিশাল উপত্যকার শিরোভাগস্থিত ছোট গ্রাম। এখানকার গুম্বা (বিহার) এককালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, 'তঞ্জুর' এর কিয়দংশ এখানেই সংস্কৃত হইতে ভুটীয়া ভাষায় অনুবাদিত হয়। (বৌদ্ধ ত্রিপিটকের তিব্বতী অনুবাদের নাম 'কঞ্জুর' এবং তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং ঐ সম্বন্ধে যাবতীয় পুস্তক-সংগ্রহের নাম 'তঞ্জুর')। প্রাচীন বিহারের দেওয়াল এখনও পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান, বিহার প্রথম গোর্খা-ভোট যুদ্ধে গোর্খাদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং তাহার পর ইহার আর পুনর্নির্ম্মাণ হয় নাই। প্রাচীনকালের ভিক্ষুদের বংশধরগণ এখনও এই গ্রামে আছে এবং তাহারা একটি ছোট মন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহা ভোটদেশের প্রাচীনতম সম্প্রদায় নিগ্-মা-পা (পুরাতন) মতাবলম্বী। এই সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয়

অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপিত, একাদশ শতাব্দীতে কর্-যুগ্-পা সম্প্রদায়ের আরম্ভ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সক্যা-পা ও ষোড়শ শতাব্দীতে গে-লুক্-পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই চারিটি তিব্বতের প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়। সুমতি-প্রজ্ঞ ৬ই জুন তারিখেও নড়েন না দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, তিনি এই যাত্রায় কিছু অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টাও দেখিতেছেন—যাহাতে লাসায় গিয়া অনটন না হয়। তাঁহাকে আমি বলিলাম যে, যদি তিনি শীঘ্র লাসা রওয়ানা হইতে এবং পথে দেরি না করিতে রাজী থাকেন, তবে লাসায় পৌঁছিয়া আমি তাঁহাকে পঞ্চাশ টঙ্কা দিব। তিনি তাহাতে স্বীকার পাইলেন।



দূর হইতে লঙ্কোর তিঙবীর দৃশ্য

পরদিন ৭ই জুন, যাত্রা করা স্থির হইলেও দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃথা লোকের আশায় বসিয়া রহিলাম। পরে লোক পাওয়া গেল না এবং শেষে নিজের বোঝা নিজের পিঠে বাঁধিয়া, সঙ্গে কিছু শুকনো মাংস ও মাখন পাথেয় লইয়া দুইজনে পথে নামিয়া পড়িলাম। লঙ্কোর হইতে তিঙ্‌বী চার-পাঁচ মাইল দূর, কিন্তু সেখানকার কেল্লা যেন খুবই নিকটবর্ত্তী দেখাইতেছিল, হয়ত হাওয়া পাতলা ও পরিষ্কার হওয়ায় এই ভ্রম হইতেছিল। যদিও এই অধিত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চে, তবুও নির্ম্মল রৌদ্রের মধ্যে চলিতে বিশেষ গরম লাগিতেছিল। প্রান্তরে ঘাস স্থানে স্থানে কুশের মত গজাইয়াছে, সেখানে ভেড়া গরু ইত্যাদি গৃহপালিত পশু ভিন্ন অনেক জঙ্‌লী গাধা ও কিয়াং দেখিলাম। এদিকের কুকুর খুব বড় ও হিংস্র, সেইজন্য আমি গ্রামে যাইতে ইতস্ততঃ করিতাম।

রৌদ্রে চলিতে চলিতে পিপাসা পাওয়ায় সুমতি-প্রজ্ঞ চা খাইবার প্রস্তাব করিলেন। সামনেই ছোট ছোট ঘরে ভরা একটি গ্রাম দেখা গেল। সেখানকার এক গরীব বৃদ্ধ তাহার কুটীরে আমাদের লইয়া গেল এবং চায়ের ব্যবস্থা করিল। বৃদ্ধ আমার সাথীর সঙ্গে অন্য কথার প্রসঙ্গে সঙ্-গে-ওপা-মে (অমিতাভ বুদ্ধ) সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। ভোটীয়েরা টশী-লামাকে অমিতাভ বুদ্ধের অবতার বলিয়া মানে, এইজন্য ইঁহাকে অমিতাভ বুদ্ধ নামেও ডাকে। সে যখন শুনিল যে, তিনি চীনদেশে রহিয়াছেন ও ফিরিবার আশা নাই, তখন সে অতি কাতরভাবে বলিল, "তিনি কি তিব্বত ছাড়িয়া গেলেন নাকি?" সাধারণ তিব্বতীদের মধ্যে এইরূপ সরলবিশ্বাসী অনেক আছে। ইতিমধ্যে অপরিচিত লোক দেখিয়া কুকুরের দল দ্বার ঘিরিয়া ফিরিতে লাগিল, গৃহপতি লাঠি লইয়া তাহাদের তাড়াইলেন।

চা-পান করিতে করিতে সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "নিকটস্থ গ্রামের শেকর্ বিহারে চাষ চলিতেছে। সেখানকার প্রধান ভিক্ষু নম্-সে আমার পরিচিত, গেলে পরে পথের জন্য কিছু মাংস ও মাখনের সংস্থান হইতে পারে এবং বোঝা বহিবার লোকও পাওয়া যাইতে পারে।" শেষের কথাটা আমার মনোমত ছিল, সুতরাং আমিও গে-লোঙ (ভিক্ষু) নম্-সে'র সঙ্গে দেখা করিতে রাজী হইলাম। চা-পানের পর আমরা ঐ মঠের দিকে চলিলাম, গ্রাম হইতেই তাহা দেখা যাইতেছিল। বেচারা বৃদ্ধ আমাদের কুকুরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জলের ধার পর্য্যন্ত আসিল। মঠের চারিদিকেও কয়েকটা বড় কুকুর বাঁধা আছে দেখিয়া আমরা দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করায় একজন লোক বাহির হইয়া আসিল এবং কুকুরের মুখ হইতে আমাদের আগলাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। গে-লোঙ্ নম্-সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আগন্তুকদের দেখিযাই বলিলেন, "এই যে! সোগ্-পো (মঙ্গোল) গে-লোঙ (ভিক্ষু) আসিয়াছেন।"

নীচে রন্ধনশালায় আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবার পর আমাদের সামনে চা ও সত্তুর পাত্র রাখা হইল, আমার সত্তুতে রুচি ছিল না, কেবল চা পান করিলাম। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া দেখিলাম, শেকর্ গুম্বার জায়গীরের আয়-ব্যয় হিসাব চলিয়াছে। মুনিম-মহাশয় হাড় ও প্রস্তরখণ্ড গুনিয়া রাখিতেছেন এবং পুনর্ব্বার গুনিয়া সেগুলি পৃথক পৃথক পাত্রে সাজাইতেছেন। তাঁহার এই হিসাবের ধরণ আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকিতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐরূপ হিসাবের প্রণালী শিখিতে বেশ কিছুদিন যে সময় লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা-পানের পর আমরা দ্বিতলে ভিক্ষু নম্-সে'র নিকট গেলাম। তিনি পরম আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আজ বিশেষ পূজায় ব্যস্ত ছিলেন, পূজাকক্ষ

মূর্ত্তিতে ও তোমা-য় (সত্তু ও মাখনের নানাবর্ণ বলিপিণ্ড) সুসজ্জিত ছিল। তিনি আবার চা-পান করিতে অনুরোধ করায় সুন্দর গঙ্গা-যমুনা (তাম্রের উপর রৌপ্য) থালের উপর আসল চীনা পেয়ালায় চা আসিল এবং আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম।

আমার কক্ষে কঞ্জুরের পুস্তকাগার ছিল, সেখানকার এক প্রাচীন হস্তলিখিত কঞ্জুর আমি খুলিয়া দেখিতেছিলাম। এই মহামূল্য গ্রন্থ শতাধিক খণ্ডে বিভক্ত ছিল, তাহার এক-এক খণ্ডের ওজন দশ সেরের অধিক। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "তোমাকে যদি এই পুস্তক দেওয়া হয়, তবে তুমি কি ইহা লইয়া যাইবে ?" আমি বলিলাম, "অতি আনন্দের সহিত।"

সুমতি-প্রজ্ঞ প্রথম দিনই বলিয়াছিলেন যে, এই গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপবিচিত বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং সেইজন্য আমাকে দুই-একদিন থাকিতে হইবে। পরদিন সেই কাজে তিনি বাহির হইলেন, আমি পুস্তক দেখা ও অল্পস্বল্প পডায় ব্যস্ত হইলাম। দ্বিপ্রহরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আজই যাত্রা করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার গৃহেই থাকিবেন। আমি ইহাতে বাধা দিতে তিনি বলিলেন, "তোমার ভয় কিসের ? এখানে কেহই তোমায় গ্যা-গর-পা (ভারতীয়) বলিয়া চিনিতে পারিবে না।" তিঙ্‌রী পর্ব্বতমালা হইতে বিচ্যুত একটি পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর একটি প্রাচীন কেল্লা বে-মেরামত অবস্থায় আছে ; এখানে এখনও কিছু সৈন্য থাকে। এই পর্ব্বতমূলেই তিঙ্‌রী গ্রাম, গ্রামের আয়তন কুতী অপেক্ষা অধিক। এখানে নেপালী দোকানপাট নাই, তবে পূর্ব্বেকার চীনাদের সন্তানেরা এখনও কেহ কেহ এখানেই আছে। পুবানো জোঙ-পোনের গৃহ গ্রামের এক প্রান্তে, আমরা সেখানেই গেলাম। তিনি সুমতি-প্রজ্ঞকে দেখিয়া তাডাতাড়ি আসিয়া তাঁহার পিঠের বোঝা নামাইলেন, পরে তাঁহার চাকবেরা আমার বোঝাও নামাইয়া লইল। সেই অঙ্গনেই গালিচা বিছানো হইল, সঙ্গে সঙ্গে গরম চায়ের পাত্র ও ছুরিসুদ্ধ শুকনো মাংসও হাজির হইল। আমাব সম্বন্ধে জোঙ-পোন মহাশয় কেবলমাত্র এই প্রশ্ন করিলেন, "ইনি তো লদা-পা (লদাখ-বাসী) না ?" এই বলিয়া তিনি নিজের হাতে শুকানো মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন। আমি সেই মাংস খাইতে অসম্মত হওয়ায় সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "ও সবে মাত্র দেশ থেকে এসেছে, লদাখে সিদ্ধ না করিয়া (অর্থাৎ না রাঁধিয়া) মাংস খাওয়া হয় না।" মাংস খাওয়া শেষ হইতে-না-হইতে নূতন জোঙ-পোন মহাশয় আসিলেন এবং তাঁহার জন্য রূপার পাত্রে মদ আনা হইল। আমার সম্বন্ধে কি করিয়া সন্দেহ হইতে পারিত যে, আমি সেই ভারতীয়দের দলে যাঁহাদের অনেক বন্ধুবান্ধব ভোটীয়দের আতিথ্যের অসদ্ব্যবহার এবং তাহাদের

প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিরা ইংরেজদের নিকট তিব্বতের গুপ্ত রাজনৈতিক ব্যাপার সকল ব্যক্ত করিয়াছিল? যে কারণে এখন ভোটীয়দের সর্ব্বদাই তাহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ভূমির অধিবাসীদের সম্বন্ধে আশঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ থাকিতে হয়।

আমাদের গৃহস্বামী বেশ রসিকপুরুষ ছিলেন, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পেয়ালার পর পেয়ালা চলিতে লাগিল। লোকে বলে, "কারণ"ই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্নীসহ বীণা বাজাইতে বাজাইতে মিত্রগোষ্ঠী মিলনে চলিলেন, চাকরদের উপর আমাদের ভোজন-শয়নের ব্যবস্থা করার আদেশ হইল। আমার শয়নস্থল পাকশালাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল, সেখানকার তত্ত্বাবধান এক অনী'র (ভিখারিণী) উপর অর্পিত ছিল। ভোটদেশে পরিবারের সকল ভাই মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণ করাই প্রথা, এইজন্য সকল স্ত্রীলোকের বিবাহ সম্ভব নহে এবং অবিবাহিতদের মধ্যে অনেকে চুল কাটাইয়া অনী হইয়া, হয় মঠে আশ্রয় লয়, নয় ঘরে থাকিয়া যায়। আমাদের এই অনী সাক্ষাৎ মহাকালী ছিল। শরীরের উপর এত পুরু কালো কাজলের স্তর ইহার পূর্ব্বে আমি কাহারও দেখি নাই, পরেও দেখি নাই। ঐ কালো মুখমণ্ডলে চক্ষুর শ্বেত পরিবেষ্টিত রক্তাভ দৃশ্য বর্ণনার অতীত। দেখিলাম থুক্‌পা-পাকের সময় হাতায় করিয়া নিজের হাতে তাহা ঢালিয়া সে লবণ পরীক্ষার জন্য চাখিয়া দেখিল, এবং তাহার পরই পরনের চোগায় হাত মুছিল। এইমাত্র রক্ষা যে, তিব্বতে ভোজন সামগ্রার দেওয়া-নেওয়া বা তৈয়ারী করা সবই হাতা চামচে চলে, হাতে ছোঁওয়ার ব্যাপার খুবই কম।

থুক্‌পা-চা পানভোজনে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, ততক্ষণ গৃহস্বামী বীণা বাজাইতে বাজাইতে ফিরিয়া আমাদের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ কথায়-কথায় লাসা যাইতে বলায় তিনি বলিলেন, "কি করি, চাম (চাম-কুশোক= উচ্চশ্রেণীর মহিলা) যাইতে রাজী নহেন।" পরে কিন্তু আমি লাসায় থাকিতে থাকিতেই এই দম্পতি ভোটীয় নববর্ষের সময় লাসায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা ছিলেন সাধারণ পরিচ্ছদে, কেননা লাসায় অনেকেই রাজপুরুষের লোলুপদৃষ্টির ভয়ে নিজ অবস্থার কম চালে থাকেন—এবং আমি ছিলাম লাল রেশমে মোড়া পোস্তিন (বহুমূল্য পশমযুক্ত চর্ম্মের পোষাক) ও বুট পরিহিত। পরস্পরকে চিনিবার পর তিনি আমাকে লখাদী বলিয়া সম্বোধন করায় আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলি এবং তাঁহার আতিথ্যের জন্য বহু ধন্যবাদ দিই। এই ভূতপূর্ব্ব জোঙ-পোন মহাশয় অনেক অশ্বতরের মালিক এবং সেগুলির কুতী ও লাসার মধ্যে মাল সরবরাহের ব্যাপারে নিযুক্ত। পরদিন আমরা যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে আমাদের তিনি আরও দু-চার দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা রাজী না-হওয়ায় তিনি পাথেয়রূপে চা, সত্তু, মাংস, চর্ব্বি, মাখন ইত্যাদি দিলেন।

ভারবাহী পাওয়া গেল না, সুতরাং প্রাতরাশের পর বোঝা পিঠে বাঁধিয়া রওয়ানা হইতে হইল ; রক্ষা এই যে পথে চড়াই ছিল না।

আমরা ফুঙ নদীর দক্ষিণ কিনারা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে চলিতেছিলাম, সেদিকে আশপাশের পাহাড়গুলি খুবই ছোট ছোট। কয়েকঘণ্টা চলিবার পর নদীর বাম দিকে শিবৃরীর পাহাড দেখা গেল। তিব্বতের অধিকাংশ পাহাড মাটিতে ঢাকা, কিন্তু এই পাহাড় প্রস্তরময়, এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কিংবদন্তী আছে যে, এই পাহাড় গ্য-গর (ভারত) দেশীয়, এবং সেইজন্য ইহা লোকচক্ষুতে অতি পবিত্র। এখন ইহার পরিক্রমার সময়, সুতরাং অনেক যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া পরিক্রমা কবিতেছে। এখানকার পরিক্রমায় (পথে) চিত্রকূটের মত



ফুঙ নদীব একটি অংশেব দৃশ্য

স্থানে স্থানে অনেক মন্দির আছে। আমবা আটটায় যাত্রারম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহরে গ্রামে পৌছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ চাপানের যোগাড় করিলাম। একে তো পথশ্রান্ত ছিলাম, তাহার উপর চা-পানে ও গল্পে অনেক দেরি হইয়া গেল এবং ইহাও শুনিলাম যে, পরের গ্রাম বহু দূর। এই কারণে আমরা সেখানে থাকা স্থির করিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার সময় গৃহস্বামী জানাইল যে, তাহার ঘরে স্থানের অভাব। সে গ্রামের মধ্যে অন্য এক বাড়ীতে আমাদের পাঠাইয়া দিল, সেখানে মাত্র তুইটি কক্ষ। একটিতে এক ভিখারী রোগশয্যায় পড়িয়াছিল, সুতরাং অন্যটিতে আমরা আশ্রয়

লইলাম। অন্ধকার হইবার মুখে সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "আমাদের এখানে থাকা ভাল নয়, এ-গ্রাম চোরে ভর্ত্তি, সুতরাং রাত্রে টাকাকড়ির লোভে আমাদের উপর আক্রমণ হইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব যে, এই কারণেই আমাদের এখানে চালান করা হইয়াছে। আমি এ-কথায় আপত্তি না করিয়া সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে গিয়া গ্রামের মধ্যে এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় লইলাম। সেই গৃহে আরও দুইজন অতিথি ছিলেন। তাঁহারা শিবরী পরিক্রমা সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছিলেন। এবার খুব ভিড়, তাঁহাদের কাছে এই কথা শুনিয়া সুমতি-প্রজ্ঞের মনও পরিক্রমার জন্য উন্মুখ হইতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "এইবার সোজা লাসায় চলুন, সামনের বৎসরে আমরা দুইজনেই নিশ্চিন্তমনে পরিক্রমা করিতে আসিব।" সেইসঙ্গে আগন্তুকদের একজনকে কিছু পয়সা দিয়া বলিলাম যে, তাহা যেন আমাদের তরফে শিবরী রেন্‌-পো-সে-তে নিবেদন করা হয়। এই গ্রামে একটি অতি সুন্দর পিত্তলের বজ্রযোগিনী মূর্ত্তি দেখিলাম। শুনিলাম, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, যখন লোকে চারিদিকে পলাইতেছিল, তখন এই গ্রামেরই কোন ভোটীয় সিপাহী ইহা লুট করিয়া আনে। বস্তুতঃ ঐ যুদ্ধে ইংরেজের সেনা অপেক্ষা ভোটীয় সেনাই বেশী লুটপাট করিয়াছিল।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া আমরা দশটার সময় সম্মুখস্থ গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে প্রথম যে গৃহে গেলাম তাহা সুমতি-প্রজ্ঞের পছন্দ না হওয়ায় তাঁহার পরিচিত লোকের ঘরে যাইতে হইল। এই গ্রামে অনেক বড় বড় কুকুর ছিল এবং যেখানে আমরা আশ্রয় লইলাম সেখানে এক বিশালকায় কালো কুকুর দ্বারে বাঁধা ছিল। আমাদের সঙ্গে এক বালক আগে আগে পথ দেখাইয়া যাইতেছিল, তাহার পর সুমতি-প্রজ্ঞ এবং শেষে আমি ছিলাম। আমাদের দেখিবামাত্র কুকুরটা ডাকাডাকি ও লাফালাফি আরম্ভ করিল, কাছে যাইতে সে ঝটকা দিয়া শিকল ছিঁড়িয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সুমতি-প্রজ্ঞ অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির উপর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কুকুর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেল, ইতিমধ্যে বাড়ীর লোকজন আসিয়া পড়ায় তিনি রক্ষা পাইলেন। শিকল ছিঁড়িয়াছে দেখিয়া বালক ও আমি বাহিরে পলায়ন করিলাম, পরে ঘরের লোকজন আসিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল। আমাদের পলায়নে সুমতি-প্রজ্ঞ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বিরক্ত হওয়ার কারণও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল যে, তিনি চৌদ্দ বৎসর ভোটদেশে থাকায়, আমা অপেক্ষা কুকুর সম্বন্ধে নির্ভয়তা পাইয়াছেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, দেহের অনুপাতে কুকুরদের সাহস বা তেজ হয় না।

আট

চা-পান ও আহাবাদিব পালা শেষ হইলে আমাদেব যাত্রাবম্ভেব আয়োজন। গৃহস্বামী ছিলেন না, গৃহিনী তিন-চাব সেব সত্তু দিতে চাহিলে সুমতি-প্রজ্ঞ আমাকে তাহা বাঁধিযা লইতে বলিলেন। তাঁহাব ধাবণা ছিল না যে আমাব ঐ হাল্কা বোঝা বহিতেই অবস্থা কিরূপ কাহিল, সুতবাং তাঁহাব ভাবী বোঝাব ন্যায় আমাবটাও দাঁড কবাইতে চাহিলেন। সত্তুব আশা শেষ পর্য্যন্ত ছাডিতেই হইল, এবং তাহাতে তিনি চটিলেন বিলক্ষণ, কিন্তু উপায কি? যাহা হউক, বওয়ানা হওযা গেল এবং কিছুক্ষণ পবে চা-কোবেব নিকট পৌঁছান গেল। চা-কোব বাজবংশ এককালে নিশ্চয়ই প্রবল প্রভাবশালী ছিল, নিকটস্থ পর্ব্বতেব উপবে প্রাচীন বাজপ্রাসাদেব প্রস্তব প্রাচীব এবং দুর্গেব ভগ্নাবশেষ তাহাব সাক্ষীরূপে এখনও দণ্ডায়মান। কেল্লায পৌঁছিবাব আগে এইখানে চীন সেনাবাস ছিল। তখন এই দিকে কডা পাহাবা ছিল, বিনা আজ্ঞাপত্রে কেহই সীমা পাব হইতে পাবিত না। চা-কোব গ্রামেব কযেকটি গৃহও তাহাব অবস্থাব ক্রমাবনতিব পবিচয দেয়। এখানে সুমতি-প্রজ্ঞেব পবিচিত ব্যক্তি তো ঘবে ছিলেন না, তবে অনেক বলা-কওয়াব পব আমবা থাকিবাব অনুমতি পাইলাম। সন্ধ্যাব পব অল্প অল্প শিলাবৃষ্টিব পব সজোরে বর্ষণ আবম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে বাহিবেব অঙ্গন জলে ভবিয়া গেল এবং মাটিব ছাদ দিয়া যেখানে-সেখানে জল পডিতে আবম্ভ কবিল। সন্ধ্যাব সময় বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী ফিরিল।



পর্বতের উপরে রাজপ্রাসাদের প্রাচীব ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ

সুমতি-প্রজ্ঞ তাহাকে চিনিতেন এবং আমার উপর চটিয়া থাকায় তাহার নিকট আমার নিন্দাবাদ সুরু করিলেন। আমি তাহাতে কিছু মনে করিলাম না, কেননা আমি জানিতাম তাঁহার মনটা ছিল সাদা।

১১ই জুন প্রাতে আমরা আবার চলিতে লাগিলাম এবং কিছু দূর পূর্ব্বমুখে যাইবার পর ফুঙ্ নদী পার হইলাম। নদীর স্রোত বিস্তৃত এবং তাহাতে জলও ছিল জঙ্ঘাপ্রমাণ গভীর। জল এতই শীতল যে মনে হইতেছিল পা বুঝি কাটিয়া যায়। অতিকষ্টে নদী পার হইয়া মেষপালকদের আড্ডায় গিয়া চা-পান করিলাম। আগেই বলিয়াছি এদিকে আমাকে বোঝা বহিয়া চলিতে হইতেছিল, উপরন্তু অন্য খাদ্যের অভাবে সত্তু খাওয়ায়—সত্তুতে আমার স্বভাবতঃই রুচি নাই—শরীরও দুর্ব্বল ছিল। পথে আর একবার চা খাইলাম। এখন আমি কেবল মনের জোরে পথ চলিতেছিলাম, পথে কয়েকটি ছোট গিরিসঙ্কট (লা) ছিল, দ্বিতীয়টি পার হইতে আমার আর শক্তি রহিল না। কতকগুলি অন্য লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কোর হইতে শে-কর্ জোঙে যাইতেছিল, তাহাদের একজন আমার বোঝা লওয়াতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম। আমার খালি হাতে চলিবার সামর্থ্যের অভাব ছিল না। পাহাড় হইতে নামিয়া একটি ছোট নদী পার হইয়া শুনিলাম সামনের ছোট পাহাড়ের ওপারেই শে-কর্ জোঙ্। পথে কিছুক্ষণ এক জায়গায় বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলাম। বেলা তিন-চারটার সময় শে-কর্ পৌঁছিলাম।

লঙ্কোরের লোকজন শে-কর্ গ্রামে যেখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিল, আমরাও সেখানেই রহিলাম। শে-কর্ গুম্বায় সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক ভিক্ষু ছিলেন, কিন্তু সুমতি-প্রজ্ঞ সেখানে যাইলেন না। আমার পা কাটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিবার সামর্থ্য ছিল না, সেইজন্য টশী-লুন-পো পর্য্যন্ত ঘোড়া ভাড়ার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই চেষ্টায় ১১ই হইতে ১৪ই জুনের দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কিছু ব্যবস্থা করা গেল না। প্রথম দিনই আমরা শে-কর্ মঠের অবতারী লামার নিবাস দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরটি সুন্দর মূর্ত্তিরাজি ও চিত্রপটে সুসজ্জিত। লামা গৃহে ছিলেন না, তাঁহার গৃহ রাজপ্রাসাদ বলিলেই হয়। প্রাসাদের সম্মুখে সফেদার বাগান, এবং বাগান ফুলগাছের টবে সাজানো। ১৩ই জুন গুম্বা দেখিতে গেলাম। গুম্বা পাহাড়ের নিম্ন হইতে শিখর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট মঠ, তাহাতে প্রায় পাঁচ-ছয় শত ভিক্ষু বাস করেন। ইহার মন্দির বড় বড় স্বর্ণ রৌপ্যময় দীপের আলোক উদ্ভাসিত। এখানকার প্রধান পণ্ডিতের (কুশোক্ খেম্বো) সঙ্গে যদিও সুমতি-প্রজ্ঞের ইচ্ছা ছিল না, তবু দেখা করিতে গেলাম। তিনি চীন সীমান্তের খাম প্রদেশের লোক এবং লাসার সেরা গুম্বায় শিক্ষিত। প্রথমে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তার পর তন্ত্র ও বিনয়

সম্বন্ধে আলাপ হইল। আমি বলিলাম, "যেখানে বিনয়, মদ্যপান, জীবহিংসা, স্ত্রী-সংসর্গাদি বর্জ্জন করে, সেখানে তন্ত্রমতে ঐ সকল বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এইরূপ বিবাদী মত কিরূপে একত্রে চলিতে পারে?"



শে-কর্ মঠের দৃশ্য

লামা বলিলেন, "ইহার অর্থ, ভিন্ন অবস্থার লোকের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। যেমন রোগীর জন্য বৈদ্য অনেক খাদ্যকে কুপথ্য বলেন, কিন্তু রোগ উপসমের পর ঐ লোকই সেই খাদ্য ভোজনে উপকার পায় তেমনি বিনয় সাধারণ লোকের জন্য যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন।"

পণ্ডিত মহাশয় আমাদের যাত্রার বাধাব ব্যাপার শুনিয়া লাসা-যাত্রী এক ব্যাপারীকে ডাকাইয়া আমাদিগকে তাহাব সঙ্গে লইতে অনুরোধ করিলেন এবং আমাদের মোটঘাট লইয়া গুম্বায় চলিয়া আসিতে বলিলেন। পরদিন সেই ব্যবস্থানুসারে আমবা গুম্বায় আসিলে পর শুনিলাম যে সওদাগর চলিয়া গিয়াছে। নিকটস্থ এক অশ্বতরওয়ালার কাছে গিয়া ভাড়ার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনও কিছু ঠিক হইল না, শেষে সুমতি-প্রজ্ঞ লঙ্কোরের এক ভিক্ষুকে (ঢাবা) বিনা-পয়সায় লাসা তীর্থ দর্শনের লোভ দেখাইয়া আমাদের সঙ্গে যাইতে রাজী করাইলেন।

১৪ই জুন দ্বিপ্রহরে ভিক্ষুর স্কন্ধে আমার বোঝা চাপাইয়া যাত্রা সুরু করিলাম। পথ একটি নদী পার হইয়া বামদিকে নিম্নাভিমুখী হইয়া অন্য এক নদীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া চলিল। এই উপত্যকা বেশ প্রশস্ত, নদীর কিনারে ছোট ছোট বৃক্ষ, এখানে সেখানে ক্ষেত্রে বিঘৎপ্রমাণ যব ও গমের চারায় জলের সেচ—এই সব দেখিতে দেখিতে চারটা নাগাদ যে-রা গ্রামে পৌঁছান গেল। ওখানকার এক ধনী গৃহস্বামীকে সুমতি-প্রজ্ঞ চিনিতেন, তাহার ঘর গ্রামের বাহিরে ছিল। সেখানে গেলে দেখা গেল গৃহের চারি

কোণে চারটি বিশাল দেহ কালো কুকুর মোটা শিকলে বাঁধা রহিয়াছে। দূর হইতে ডাকাডাকি করিতে একজন লোক বাহিরে আসিয়া দ্বারস্থ কুকুরটিকে তাহার কাপড়ে ঢাকিয়া চাপিয়া ধরিলে আমাদের ভিতরে যাওয়া সম্ভব হইল। ভিতরে গিয়া লঙ্কোরের সেই লোকটি কাঁদিতে লাগিল, "আমার মায়ের আমি এক ছেলে, এই ভয়ানক কুকুর আমায় খেয়ে ফেললে মা না খেয়ে মরে যাবে!" তাহাকে সুমতি-প্রজ্ঞ ধমকাইতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা দেখিয়া তাহাকে যাইতে দিতে বলিলাম। বেলা অনেক দূর অগ্রসর, সুতরাং সে তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ-পত্র গুছাইয়া প্রস্থান করিল। আমরা গৃহস্বামীর সঙ্গে ঘরের ভিতরের অংশে গিয়া চা-পানের উদ্যোগ করিবার সময় দেখিলাম যে, সে সুমতি-প্রজ্ঞের ছয়-সাত সের সত্তুর থলিটিও লইয়া গিয়াছে। সুমতি-প্রজ্ঞ তৎক্ষণাৎ সে লোকের পিছনে ছুটিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া আমি বলিলাম, "ছেড়ে দিন, যা গিয়েছে গিয়েছে।"

সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "তুমি সেদিন সত্তু নিতে দাও নি, আজ এটার সম্বন্ধে আবার ঐ রকম কথাবার্ত্তা বলছ।"

আমি বলিলাম, "সে গিয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক, তাকে ধরতে ধরতে সে শে-কর্ পৌঁছে যাবে। আপনি সেখানে পৌঁছবার আগেই রাত্রি হয়ে যাবে।" গৃহস্বামী আমাদের বাদানুবাদের কারণ শুনিয়া পাঁচ ছয় সের সত্তু আনিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, আমি তাহা দেখিয়া বলিলাম, "এই নিন, যতটা গিয়েছে ততটা এসে গেল।" সত্তু দিবার পর তিনি একটু ঠাণ্ডা হইলেন। সেই ঘরে এক দরজী কাপড় সেলাই করিতেছিল, জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম যে, শে-করের খেম্বো যে গ্রামের মোড়লের নামে ঘোড়া ঠিক করার জন্য চিঠি দিয়াছেন, এ সেই গ্রামের লোক। গৃহস্বামীর কথায় বুঝিলাম ঘোড়া বা মুটিয়া কোনটারই ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং শেষে আমি স্থির করিলাম সেই দিনই ঐ দরজীর সহিত তাহার গ্রামে যাইব। সূর্য্যাস্তের মুখে আমরা রওয়ানা হইলাম, দরজী আগ্রহের সহিত আমার মোট নিজে তুলিয়া লইল। কিছু রাত্রি হইলে গন্তব্য গ্রামে পৌঁছিলাম এবং দরজী মুখিয়ার (মোড়ল) ঘর দেখাইয়া দিলে তাহাকে চিঠি দিলাম। সে চিঠি পড়িয়া বলিল, "এখন তো ঘোড়া নাই। কাল আপনার সঙ্গে লোক দিয়া লো-লো গ্রামে পাঠাইয়া দিব, সেইখানে ঘোড়া পাওয়া যাইবে।"

পরদিন অতি প্রত্যুষে লোকের ঘাড়ে মোট দিয়া রওয়ানা হইয়া আটটায় লো-লো পৌঁছিলাম। বিশ-পঁচিশ ঘরের গ্রাম, কিন্তু ঘরগুলি সবই কাঠের অভাবে নিতান্ত ছোট। ঐ রকম ছোট একটি ঘরে আমাদের লইয়া মুখিয়ার লোক গৃহস্বামীকে মোড়লের অনুরোধ শুনাইল। চা-পান ইত্যাদির পর সে বলিল, "ঘোড়া পাওয়া

যাইবে এবং ল্যার্সে-জোঙ পর্য্যন্ত ভাড়া আঠাব টঙ্কা।" এখানকাব হিসাবে ভাড়া অধিক হইলেও আমি দিতে স্বীকাব কবায় সে তখনই ঘোড়া চবাইবাব প্রান্তবে চলিল। তিনটাব সময় ফিবিয়া আসিয়া সে বলিল যে, এখন ল্যার্সেতে বড গবম, সেইজন্য ঘোড়াব মালিক অত দূব না গিয়া "চাসা-লা" পাব কবিয়া একদিনেব পথেব এদিকে পর্য্যন্ত যাইবে। আমি তাহাব ভাড়া এক কথায় স্বীকাব কবিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ কথাবার্ত্তাব ধবণ দেখিয়া ঘোড়া লইতে বাজী হইলাম না। লোকটি প্রথমে সৈনিক ছিল। তিব্বতে ছোট ভাই পৃথক বিবাহ কবিতে পাবে না, এ তাহা কবায় অন্য ভায়েবা তাহাকে ঘব হইতে তাড়াইয়া দেওযায সে নূতন একটি ছোট ঘব বাঁধিয়া গৃহস্থালি কবিতেছে। আমাব কাজে ছুটাছুটি কবাব দরুণ তাহাকে কিছু পয়সা দিতে সে খুবই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময়ে খবব পাইলাম যে শে-কব্ হইতে ল্যার্সে-জোঙ যাত্রী একদল ক'টি গাধা লইয়া এখানে আসিয়াছে। সুমতি-প্রজ্ঞ দবদস্তুব কবিয়া পাঁচ টঙ্কায় (প্রায় আট আনা) আমাদেব মালপত্র ল্যার্সে-জোঙ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবাব ভাড়া ঠিক কবিলেন। গাধাওয়ালা সওযাবীব জন্য একটি বড গাধা ভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু খালি-হাতে হাঁটিতে আমাব কোনও ভয ছিল না, সুতবাং তাহা লইলাম না। বাত্রে আমবা দুইজন মালপত্র লইয়া গাধাওযালাব আড্ডায চলিযা গেলাম।



গাধাব দল চলিতে লাগিল

১৬ই জুন বাত্রি থাকিতেই গাধাব দল চলিতে লাগিল। গাধাতে লাসার জন্য নেপালী চাউল বোঝাই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে নেপালী সওদাগরেব রক্ষীরা দুই হাত লম্বা

তলোয়ার বাঁধিয়া চলিয়াছিল। আমরা চড়াই পথে চলিয়াছিলাম। বেলা দশটায় খাওয়া-দাওয়ার জন্য নামা হইল এবং সে-সময় গাধাগুলিকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা চলিল, আমি ততক্ষণ চারিদিকে তুষার-দেশের মূষিকের দৌড়াদৌড়ি দেখিতে লাগিলাম। এই জীবগুলি আমাদের দেশের ক্ষেতের মূষিকের সমান বড়, কিন্তু ইহাদের লেজ নাই ও শরীর অতি নরম লোমে আবৃত। প্রাতরাশের পর গাধাগুলিকে ভিজান মটর কচলাইয়া খাইতে দেওয়া হইল এবং তাহার পর আবার চলা সুরু হইল। আমার হাত খালি, সুতরাং ষোল হাজার ফুট উচ্চেও চলিতে কষ্ট ছিল না, এবং সেইজন্য আমি সর্ব্বপ্রথমে পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। আমরা সেই প্রথম নদীর পাড়ে পাড়ে চলিয়াছি, এখানে নদী পর্ব্বত ছেদ করিয়া গিয়াছে, তবে নদীর পাশে পথ নাই বলিয়া আমাদের পর্ব্বতবাহুর উপরে উঠিতে হইল। ইহার পর উৎরাই আরম্ভ হইল, পাহাড়ের গায়ে এখানে-সেখানে চমরীর দল চরিতেছে দেখিলাম। আরও নীচে পথ নদীর পাটে নামিল, নদীর ওপারে হরিণের পাল জল খাইতেছিল। আমাদের দেখিয়াই ছুটিয়া পাহাড়ের উপর পলাইল। কিছু দূর যাইবার পর স্লেটের পাহাড় দেখা গেল, যাহার নীচের নরম মাটিতে কেরোসিন তেলের গন্ধ পাইলাম। এইরূপে চারটার সময় বক্‌চা গ্রামে পৌঁছান গেল। গ্রাম বলিতে সাত-আট ঘর এবং ঘর বলিতে পাথরের স্তূপ মাত্র। গ্রামের লোকের জীবিকার উপায় ভেড়া, ছাগল ও চমরী, কেননা এত উচ্চে শস্য জন্মায় না। সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে কিছু চা ছিল, তাহা একটি ঘরে গিয়া প্রস্তুত করাইয়া খানিকটা আমরা পান করিলাম, বাকীটা সঙ্গীদের জন্যও রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে গাধার দলও পৌঁছিল।

১৭ই জুন রাত্রি থাকিতেই আমবা বক্‌চা ছাড়িয়া চলিলাম। প্রথমে দলের সর্দ্দার ঘণ্টা বাজাইয়া যাইতেছিল, তাহার পিছনে অন্য সকলে। উপরে পাহাড় ক্রমেই ছোট ও অধিত্যকা চওড়া হইতেছিল। পথের পাশে কোথাও কোথাও হিমশিলার স্তূপ পড়িয়াছিল, স্থানে স্থানে ভেড়া চমরীর গোঠ ছিল, সেখানে কাল কাল তাম্বুর ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। দশটার সময় আমরা ছোট ছোট পাহাড়ে-ঘেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছিলাম। সেখানে ঐরূপ কাল তাম্বু অনেক দেখা গেল। ঐ স্থানের বাম দিকে কিছু দূরে লোহের প্রস্তরচূর্ণ পাহাড় ছিল। কিছুক্ষণপরে আমরা চা-পানের জন্য বসিলাম, চায়ের পেয়ালায় নিজ নিজ থলির ভিতর হইতে মাখন ও সত্তু দিয়া পান ভোজনের ব্যাপার একসঙ্গেই শেষ হইল। এইবার উপত্যকা ছাড়িয়া পাহাড় চড়াইয়ের পালা আরম্ভ হইল, সুমতি-প্রজ্ঞ পিছাইয়া গেলেন, আমি সামনে আগে আগে চলিলাম। যদিও চাসা-লা আঠার হাজার ফুট উচ্চে স্থিত, তবুও আমার

উপরের ঘাটে পৌঁছাইতে কষ্ট হয় নাই, ঘাট পার হইয়া নীচে আসিয়া তবে শুইয়া বিশ্রাম করিলাম। অনেকক্ষণ পরে সুমতি-প্রজ্ঞ আসিয়া পৌঁছিলেন। গাধার দল আরও পিছনে পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামেব পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। চাসা-লা'র উৎরাই কঠিন এবং কয়েক মাইল লম্বা, চলিতে চলিতে দেখিলাম কোন কোন পাহাড়েব নীচে বরফ জমিয়া আছে। আশেপাশের সবুজ ঘাসে চমরীর দল



প্রথম দলেব সর্দাব ঘণ্টা বাজাইযা চলিতেছিল

চবিতেছে। বেলা দুইটার সময় আমবা জিগ-চেব গ্রামে পৌঁছিলাম, গাধার পাল আবও প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে আসিল। এই গ্রামেব প্রধান পেশা যাত্রীদের থাকিবাব স্থান ইত্যাদি দেওয়া, সঙ্গে অল্পবিস্তর পশুপালনও আছে। বাত্রে এখানেই বাস করা গেল।

১৮ই জুন ভোর রাত্রে আবার রওয়ানা হইলাম। এবার উৎরাই যে কঠিন শুধু তাহা নহে, উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়িতে লাগিল। প্রভাতের আলোর সঙ্গে পথেব পাশে জঙ্লী-গোলাপের ঝোপ দেখা গেল। সাতটা নাগাদ চা পান করিয়া আর এক ঘণ্টা চলিবার পব ব্রহ্মপুত্রের সৈকত দেখা যাইতে লাগিল। দশটার সময় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে পৌঁছিলাম। নদের বেলাভূমি অতি বিস্তৃত, স্থানে স্থানে বৃক্ষপূর্ণ বাগান রহিয়াছে এবং বাকী প্রায় অন্য সকল স্থানেই শস্যের ক্ষেত ও বৃক্ষ লাগান যাইতে পাবে, কিন্তু বিস্তব জমি পতিত বহিয়াছে। একটাব সময় আমাদের দল খ-চৌং গ্রামে উপস্থিত হইল। ইহা গাধাওয়ালাব গ্রাম। সুতরাং আজ তাহারা ওখানে থাকাই স্থির করিল।

সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমি এক বৃদ্ধার ঘরে আশ্রয় লইলাম। চা-পানের পর সুমতি-প্রজ্ঞ গ্রামে বেড়াইবার জন্য ঘরের অঙ্গনের দরজার বাহিরে যাইবামাত্র, চারটা বৃহৎ কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। আমি চীৎকার ও কুকুরের ডাক শুনিয়া দেওয়ালের কাছে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম, ছাতা হাতে সুমতি-প্রজ্ঞ একেবারে কুকুরের মুখে পড়িয়া আছেন। আমি কুকুর তাড়াইবার জন্য পাথর ছুঁড়িতেই কুকুরের দল সরোষে সেই পাথরের টুকরার পিছনে ছুটিতে লাগিল। সুমতি-প্রজ্ঞ সেই অবসরে ঘরে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইলেন। সেই গ্রামে থাকিতে তিনি আর বাহিরে যাইবার নাম করিলেন না।

১৯শে জুন মালপত্র বাঁধিয়া গাধাওয়ালার জিম্মা করিয়া আমরা ল্যর্সে-জোঙ চলিলাম। এই নদীতটে গ্রাম অনেক এবং সেচ-কার্য্যের জন্য বড় বড় নালীও আছে। এইরূপ এক নালী পার হইয়া আমরা একটি ছোট নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, উহা স-ক্যা গুম্বা হইতে প্রবাহিত হইতেছে। বেলা নয়টার সময় ল্যর্সে পৌঁছিয়া আমরা প্রথমে গুম্বায় যাইলাম। পথে সকলেই আমায় লদাখী বলায় আমিও এখন নিজেকে লদাখী বলিতাম। গুম্বায় চা-পানের পর আমি নদীর ধারে গাধার দল যেখানে আসিবে সেখানে, যাইবার প্রস্তাব করায় সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "এখন এখানেই অপেক্ষা করি, পরে যাইয়া মালপত্র আনিব।" তাঁহার ইচ্ছা কিছুক্ষণ এখানে থাকা। আমার মন যাইতে উৎসুক। সুতরাং অনেক কথায় বুঝিলাম "ক্বা" (চামড়ার নৌকা) শীগর্চী চলিয়া গিয়াছে, ফিরিতে দুই-একদিন লাগিবে। অনেক পীড়াপীড়ির পর সুমতি-প্রজ্ঞ ঘাটে চলিলেন; সেখানে দেখিলাম দুইজন সওদাগর মালপত্র লইয়া ক্বা'র প্রতীক্ষায় আছেন, তাঁহারাও বলিলেন নৌকা আসিতে দুই-তিন দিন লাগিবে। গুম্বায় কয়েক জায়গায় কুকুর ছাড়া আছে দেখিয়া আমি সেখানে থাকিতে চাহিলাম না, কিন্তু সুমতি-প্রজ্ঞ সেখানেই থাকিবার আগ্রহ দেখাইলেন। শেষে স্থির হইল আমি ঐ সওদাগরের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় থাকিব এবং সুমতি-প্রজ্ঞ থাকিবেন গুম্বায়।

ল্যর্সে-জোঙ হইতে শীগর্চী পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রে চামড়ার নৌকা চলে। এই নৌকা য়াকের চামড়া জুড়িয়া কাঠের কাঠামোতে আঁটিয়া প্রস্তুত করা হয়, ইহারই নাম "ক্বা" এবং ইহার এক-একটিতে ত্রিশ-চল্লিশ মণ মাল আঁটে। আমার তিনজন সওদাগর সঙ্গীর মধ্যে একজন টশী-লুন-পোর চাবা (ভিক্ষু বা সাধু), অন্যজন লাসার সেরা মঠের চাবা এবং তৃতীয় জন লাসার গৃহস্থ ছিল। ভোট দেশের সাধু দুই প্রকার—প্রথম যাঁহারা মঠে থাকিয়া পূজা-পাঠ করেন, দ্বিতীয় যাঁহারা ব্যাপার-ব্যবসায় ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে কোন দৃঢ় সীমা নাই, এক শ্রেণীর লোক যখন ও যত দিনের জন্য ইচ্ছা অন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। সওদাগর চাবাদের পরিচ্ছদ সাধারণ গৃহস্থদেরই মত,

কেবলমাত্র মস্তক মুণ্ডিত। ইহারা যথেচ্ছা মদ্যপান ও স্ত্রী-সংসর্গ কবে এবং জীবহত্যাও মাঝে মাঝে কবে। আমাব সঙ্গী চাবা দুইজন খম-পা (খাম দেশবাসী) এবং গৃহস্থ



ছাঙীম ব্রহ্মপুত্রেব দৃশ্য

লাসা-পা (লাসা নিবাসী) ছিল; ইহাদেব মধ্যে টশী-ল্যুপ্যোব চাবা বয়োজ্যেষ্ঠ ওদলেব নেতা ছিল এবং সেবাব চাবা সেই লোকই যাহার সঙ্গে শে-কব্ মঠেব খেম্পো আমাদেব

লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় আঠারো-বিশ নৌকা বোঝাই মাল ইহাদের সঙ্গে ছিল, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই চাউল, বাকী অংশের মধ্যে লৌহ-পিতলের বাসন এবং পেয়ালা ইত্যাদি তৈয়ারী করার কাঠও ছিল। চারিদিকে মাল-পত্রের স্তূপ করিয়া দেওয়াল করা হইয়াছিল, মধ্যে চমরীর লোমের ছোলদারী তাম্বু, আগুন জ্বালাইবার স্থান এবং শয়ন-ভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের বাহিরে নদীর তীরে এরূপ মালপত্র লইয়া থাকা বিপজ্জনক; কিন্তু সওদাগরদের নিকট ভোটীয় কৃপাণ ও তরবারি ছিল, উপরন্তু ভোটীয় চোরও চাবাকে ভয় করিয়া চলে।

দিনের বেলায় ইহারা মালপত্রের আচ্ছাদন মেরামত, নৌকা যোগাড়, কাঠসংগ্রহ —এখানে নদীতটে ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত গাছ আছে—এই সবে ব্যস্ত থাকিত। প্রতি রাত্রেই নেতা গ্রামে শুইতে যাইত এবং কোন কোন দিন অন্য দুইজনের একজনকে সঙ্গে লইয়া যাইত, ফলে আমি ও অন্য একজন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকিতাম। ভোটদেশে লজ্জা-ভয় অত্যন্ত কম, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের অনুচিত বা অবৈধ সম্বন্ধ প্রকাশ্যভাবেই হইয়া থাকে। পথে চলিতে চলিতেও লোকে আশপাশের বসতিতে সেইরূপ সম্বন্ধের সুযোগ পায়, কেননা সাধারণ কুমারী ও মুণ্ডিতমস্তক অনীতে অনেক প্রভেদ—অর্থাৎ কুমারীর ব্রহ্মচর্য্যের কোনও বালাই নাই। আমি ইহা বলিতেছি না যে, ভোটদেশে অন্য দেশ অপেক্ষা ব্যভিচার অত্যন্ত অধিক; বস্তুতপক্ষে যদি গুপ্ত ও প্রকাশ্য ব্যভিচার সকলই একত্রে দেখা যায়, তবে আমার ধারণায় বোধ হয়, সকল দেশের অবস্থাই প্রায় কাছাকাছি আসে। যাহা হউক, নেতা চাবা তো ব্যবসায় সম্পর্কে এই পথে ক্রমাগত যাতায়াত করে এবং এরূপ অবস্থায় এদেশে প্রায় প্রতি বসতিতেই কোন-না-কোন স্ত্রীলোক জুটিয়া যায়, সুতরাং উহারও সেই ব্যবস্থাই ছিল। প্রতিদিন চামড়ার মটকায় ভরা 'ছঙ' (ভোটীয় কাঁচা মদ) গ্রাম হইতে আসিত এবং ইহারা তাহা জলের মত পান করিত। অবসরকালে নদীতে বঁড়শী ফেলিয়া মাছ ধরার চেষ্টাও চলিত, কিন্তু মাছধরায় সফল হইতে কোন দিন দেখি নাই।

১৯শে হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত এইভাবে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় কাটিয়া গেল। দুই-তিন দিনের স্থলে এত দেরি হওয়ার কারণ শুনিলাম—নৌকা যাইবার সময় যায় জলে এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতের মুখে দুই দিনে শীগর্চী পৌঁছায়, কিন্তু ফিরিয়া আসে গাধার পৃষ্ঠে—চামড়া ও কাঠ পৃথক বোঝাই হইয়া।

নয়

নৌকার প্রতীক্ষায় এক-দুই করিয়া পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। সঙ্গীদের সঙ্গে ভোট, খাম, অম্‌দু (দক্ষিণ-চীন ও মঙ্গোলীয়ার প্রান্তের দক্ষিণে তিব্বতীয় প্রদেশ) প্রভৃতি দেশের নানা চমকপ্রদ গল্প শুনিয়াও দিন-কাটা ভার হইল। এই সময় মন্ত্রজপের তিব্বতীয় অভ্যাস করিলাম। এখানে অধিকাংশ লোকই এক হাতে মালা অন্য হাতে জপচক্র ঘুরায়। জপচক্র তাম্র বা রৌপ্যের চোঙ্গা। চোঙ্গার ভিতর লক্ষাধিক মন্ত্র কাগজে লিখিয়া ভরিয়া দেওয়া হয় এবং একবার ঘুরাইলে ততো-সংখ্যক মন্ত্রজপের ফললাভ হয়। অতি বৃহৎ জপচক্রও আছে, তাহা জলের স্রোতের সাহায্যে বা মানুষের গায়ের জোরে জাঁতার মত ঘুরানো হয়, কোথাও কোথাও উষ্ণবায়ু-যন্ত্র (hot air-motor) যোগেও চালানো হয়। তিব্বতে বিদ্যুৎশক্তির প্রচলন হইলে তাহাও জপচক্রচালনে ব্যবহৃত হইবে সন্দেহ নাই। যন্ত্রশক্তিযোগে পুণ্যসঞ্চয়ে তিব্বত এখনও ভারত অপেক্ষা শতবর্ষ অগ্রগামী!

যাহা হউক, আমার কাছে মানী (জপচক্র) ছিল না, তবে নেপাল হইতে এক জপমালা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। পথে সময়ে-অসময়ে ইহা ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এত দিনে আসল সুযোগ জুটিল। তিব্বতীয়েরা অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র (ওঁ মণিপদ্মে হুঁ) বা বজ্রসত্ত্বের মন্ত্র (ওঁ বজ্রসত্ত্ব হুঁ, ওঁ বজ্রগুরু পদ্মসিদ্ধি হুঁ, ওঁ আ হুঁ) জপ করে, আমি সে-স্থলে "নমো বুদ্ধায়" জপ করিতাম। তিব্বতী মালায় একশত আট গুটিকা এবং একটি সুমেরু থাকে। ইহা ভিন্ন তিন গুচ্ছে দশ-দশটি করিয়া রৌপ্য বা অন্য ধাতুর পুঁতিমালার সঙ্গে বাঁধা পুঁতিগুলি ছাগল বা হরিণের নরম চামড়ায় গাঁথা, এইজন্য কোন পুঁতি উপরে টানিয়া দিলে আটকাইয়া থাকে। একবার মালা জপ হইলে প্রথম গুচ্ছের প্রথম পুঁতিটি টানিয়া উপরে চড়ানো হয় এবং এইরূপে দশবার মালা জপ হইলে প্রথম গুচ্ছের দশটি পুঁতিই উপরে টানা হয়, তাহার অর্থ সহস্রাধিক মন্ত্রজপ হইল। প্রথম গুচ্ছের দশটি পুঁতিই উপরে উঠিলে দ্বিতীয়ের একটি উঠে, অর্থাৎ দ্বিতীয় দশটি উঠিলে দশ হাজার মন্ত্র-জপ বুঝায় এবং ঐরূপে তৃতীয় দশটি উঠিলে লক্ষাধিক মন্ত্র-জপ হয়। এখানে ঐরূপে কয়েক লক্ষ বার মন্ত্র-জপ হইল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা পুণ্যার্জ্জন ভাল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে ব্রহ্মপুত্রের চড়া অতিবিস্তৃত। স্রোত দুই ভাগে বিভক্ত, দুইটির উপরই রজ্জু-সেতুতে লোক পারাপার হয়। পশু বা বৃহৎ মোট পারের জন্য কিছু দূরে খেয়াঘাট আছে। ঘাট হইতে কিছু দূরে গ্রামের পাশে একটি পাহাড় একাকী

দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই শিরে জোঙ্ বা কলেক্টরী অর্থাৎ সেখানে নূতন গৃহনির্ম্মাণ চলিতেছে এবং নির্ম্মাণকার্য্য ভোটীয় নিয়ম অনুসারে বেগার-মজুরীতেই হইতেছে। এদেশে প্রত্যেক গৃহপিছু একজন লোককে কিয়ৎকাল সরকারী বেগার খাটিতে হয়। অবশ্য যাহারা ধনী তাহারা অপরকে মজুরীর পয়সা দিয়া উদ্ধার পায়। ঐ সময় দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ (স্ত্রীলোকই বেশী) চমরীর পশমে তৈয়ারী থলিতে নদীতীরের পাথর বোঝাই করিয়া গান গাহিয়া জোঙ্-এ লইয়া যাইতেছিল। কাজের সঙ্গে সঙ্গে লাফালাফি-খেলা, হাসি-ঠাট্টা সবই চলিতেছিল! স্ত্রীলোকদের কাপড় টানিয়া উলঙ্গ করাও ইহাদের কাছে রহস্য মাত্র! স্নানের সময় স্ত্রীলোকদের দৃষ্টির মধ্যেই নগ্নাবস্থায় ছুটাছুটি, স্নান, কাদা-ছিটানো এসবও চলিতেছিল। সময় গ্রীষ্মকাল হইলেও নদীর জল অতিশয় ঠাণ্ডা, সেজন্য আমি অল্পক্ষণ জলে থাকিতেও কষ্ট পাইতাম, কিন্তু ভোটীয় ছেলেদের বহুক্ষণ সাঁতার কাটিতে দেখিতাম।

ল্যর্সে গ্রামে প্রথম দিনই নমাজের আজানের ডাক শুনিয়াছিলাম, তখন সেটা নিজের ভ্রম ভাবিয়াছিলাম, পরে জানিলাম ঐ গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান ভোটীয়ের বাস আছে। লাসা হইতে লদাখ যাইবার পথে ল্যর্সে পড়ে এবং এই মুসলমানেরা লদাখী মুসলমানদিগের ভোটীয় স্ত্রীদের সন্তান। অন্য ভোটীয় অপেক্ষা ইহারা ধর্ম্মকর্ম্মে মজবুত।

২২শে জুন কয়েকখানি ক্বা (চামড়ার নৌকা) আসিল। তাহাতে আমরা যাইতে পারিতাম, কিন্তু সঙ্গীরা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বলায় থাকিয়া গেলাম। পরদিন তাঁহাদের ক্বা আসিলে দুই দিনের পাথেয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ শুষ্ক ভেড়ার মাংস কিনিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলাম। ভোটীয়দের মতে শুষ্ক মাংস "স্বয়ংপক", কিন্তু আমি তখনও অতটা অগ্রসর হইতে পারি নাই। সঙ্গী বলিলেন, সিদ্ধ করিলে মাংসের সার বাহির হইয়া যাইবে, তাহা শুনিয়াও মাংস সিদ্ধ করিয়া খণ্ডগুলি পথের জন্য বাঁধিয়া লইলাম এবং ক্বাথ ঢাবাকে দিতে চাহিলাম। ঢাবা সুরুয়া লইতে অস্বীকার করায় প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, পরে শুনিলাম তাহাকে মাংসখণ্ড না দেওয়ায় সে চটিয়াছে। আমার মতলবই ছিল যে পথে তাহাকে দিব এবং সেই জন্যই বুঝিতে পারি নাই যে এখন না দেওয়ায় কিছু অন্যায় হইয়াছে। যাহা হউক, যাহা ভুল হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে, এখন শোধরাইবার উপায় নাই।

পথে গাধার পিঠে আসিতে আসিতে নৌকার চামড়া শুকাইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য মাল্লার দল সেগুলি পাথর চাপা দিয়া নদীর জলে একদিন ডুবাইয়া রাখিয়া পরের দিন কাঠের কাঠামোতে আঁটিতে লাগিল। চামড়া আঁটা হইলে নৌকা জলে ভাসাইয়া প্রথমে খোলের নীচের দিকে সঙ্গীদের সংগৃহীত কাঠ সাজানো হইল এবং তাহার উপর মালপত্র বোঝাই করা হইল। সকালে ঢাবা নিজে আসিয়া বলিল,

"নৌকায় আপনাদের স্থান হইবে না।" দ্বিপ্রহরে মাল বোঝাই শেষ হইলে সে সেই কথা পুনর্ব্বার বলিল, কিন্তু আমি ইহা ঠাট্টা হিসাবে লইলাম। পরে মটকা-ভরা ছঙ আসিল এবং তাহার সাহায্যে মাল্লাদের ভোজ হইলে লাল নীল কাপড়ের টুকরার নিশান-পতাকা এক এক জোড়া-বাঁধা নৌকার সম্মুখে লাগানো সুরু হইল। ইতিমধ্যে শীগর্চী-যাত্রী কয়েকজন পথিক আসিলে তাহাদের যাইবার ব্যবস্থাও হইল, কিন্তু সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমার যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা হইল না। অন্য সওদাগর বলিল, "আমার সর্দ্দার আপনাদের লইতে চাহে না, আমি কি করিতে পারি, বলুন?" আমি একটি কথাও না বলিয়া আমাদের জিনিষপত্র সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমার নিজের কাঁধে উঠাইয়া গুম্বায় চলিয়া আসিলাম।

গুম্বায় আসিয়া আমি চা-পানের ব্যবস্থা করিয়া সুমতি প্রজ্ঞকে ঘোড়া বা অশ্বতরের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। তিনি সেই কাজে বাহির হইবার কিছুক্ষণ পরে লাসার সেই দুই সওদাগর আসিয়া বলিল, "আমরা সর্দ্দারকে বুঝাইয়া বলিয়া রাজী করিয়াছি, আপনি চলুন।" আমি সাথীর কথা বলায় তাহারা বলিল, তাঁহার স্থান হইবে না। আমি বলিলাম, "তবে তোমাদের সঙ্গে লাসায় দেখা হইবে। আমি তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট নহি, কিন্তু এরূপস্থলে আমি সঙ্গীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" তাহারা চলিয়া যাইবার পরেই সুমতি-প্রজ্ঞ আসিয়া বলিলেন, "লাসাগামী এক অশ্বতরের দল আসিয়াছে। আমি শীগর্চী পর্য্যন্ত দুইটি অশ্বতর চার সাং (প্রায় ৩৲ টাকা) ভাড়ায় ঠিক করিয়াছি। তাহারা কাল সকালে রওয়ানা হইবে।"

২৬শে জুন সকালেই চা-পান করিয়া মালপত্র লইয়া আমরা অশ্বতরওয়ালাদের কাছে গেলাম। তাহারা বলিল যে, ঐস্থানের রাজকর্ম্মচারীর কিছু জিনিষপত্র লইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং পরদিন যাত্রারম্ভ হইবে। আমরা গুম্বা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, অশ্বতরের আড্ডায় থাকিবার জায়গাও নাই, সুতরাং মালপত্র তাহাদের কাছে ছাড়িয়া দেড় মাইল পথ অগ্রসর হইয়া সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ চা-পানের পর চাঙ-বোমো বিহার অভিমুখে—তাহার মহাস্তূপ দূরে দেখা যাইতেছিল—কাহার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। আমি কিছুক্ষণ ঐস্থানে গৃহবধূর তাঁত-বোনা দেখিতে লাগিলাম। তিব্বতে ঘরে ঘরে পশমের সূতা কাটা ও বোনা হয়। উলের কাপড় এক বিঘৎ মাত্র চওড়া করিয়া বোনা হয়, সহজেই ইহার প্রস্থ বড় করা যায়, কিন্তু সেদিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই। কাপড় সুন্দর ও মজবুত হয়। কিছুক্ষণ পরে ছাতে বেড়াইতে গেলাম। কিন্তু অল্প পরেই গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা নামিয়া আসিতে বলিল। পরে শুনিলাম এখানকার লোকেরা ছাতে বেড়ান অমঙ্গল মনে করে। এই গৃহ ব্রহ্মপুত্রের তীর হইতে

দূরে, কিন্তু এখানেও উপত্যকা বিস্তৃত ও সমতল, যদিও নদীর জল এখানে আসে না। ক্ষেতে চারা অল্প অল্প অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেগুলি সেচনের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। কূপ হইতে চামড়ার ডোল করিয়া গ্রামের জল তোলা হয়, কূপ বিশেষ গভীর নয়। রাত্রে গৃহস্থ আমাদের থুকপা খাওয়াইলে পরে সুমতি-প্রজ্ঞ পথে কেনা কাপড় টুকরা করিয়া বুদ্ধগয়ার প্রসাদ বলিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন।



দুইজনে দুইটি অশ্বতরের সওয়ার হইলাম

পরদিন চা-পান করিয়া দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ভাবিলাম আজও বুঝি অশ্বতরের দল রওয়ানা হইবে না। সেইজন্য ফিরিয়া অশ্বতরের আড্ডার দিকে যাইতে যাইতে গ্রামের কাছে দলের সঙ্গে দেখা হইল। আমি ও সুমতি-প্রজ্ঞ দুই জনে দুইটি অশ্বতরের সওয়ার হইলাম। অশ্বতরের মুখে লাগাম নাই, সুতরাং আমরাই তাহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া চলিলাম। আমাদের দল ব্রহ্মপুত্রের তীর ছাড়িয়া ডান দিকে চলিল। কিছু দূর যাইবার পর দেখিলাম এখানে-ওখানে দূরবিস্তৃত বালুর চর, তাহার মাঝে মাঝে কুশের মত ঘাস, এবং অল্প চড়াইয়ের পরে এক জোত বা ঘাট, দ্বিপ্রহরে তাহা পার হইলাম। উৎরাইও সহজ, এখানকার পাহাড়গুলিও বৃক্ষগুল্মহীন। কিছু দূরে পর্ব্বতশিখরে বামে ও দক্ষিণে দুইটি গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল এবং সেই পাহাড়েরই নীচে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী দেখিলাম, মনে হইল সেগুলি আখরোট কিম্বা বিরি বৃক্ষ।

সেদিন বেলা দুইটা পর্য্যন্ত পথ চলা হইল। কিছুক্ষণের জন্য এক গ্রামে অপেক্ষা করিয়া অশ্বতরগুলির ভুষি ও আমাদের চা যোগাড় করা হইল। গ্রামের পরই চড়াই আরম্ভ, উপর হইতে একটি জলের ধারা নামিতেছিল, সেই জলে এই গ্রামের ক্ষেতের সেচ হয়। তাহার পাশ দিয়া চলিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা চড়াইয়ের পর উপরের

ঘাটে পেঁাছিলাম। ঘাটের উপরিস্থিত পর্ব্বতগাত্রের পাথরগুলি আড়ভাবে খাড়া হইয়া আছে, সুতরাং অশ্বতরের সুবিধার জন্য উৎরাইয়ের কতকটা পথ হাঁটিয়া চলিলাম। এইখানে এক প্রকার কালো পাথর চারিদিকে দেখা গেল, শুনিলাম এইরূপ পাথরের নিকটেই সোনার খনি থাকে। অনেকটা উৎরাইয়ের পর মোটা পাথরের দেওয়ালযুক্ত একটি ছোট দুর্গের বা ফৌজী চৌকির কাছে পেঁাছিলাম, ইমারতটি প্রাচীন নহে, কিন্তু এখন জনশূন্য। কেল্লার দেওয়ালে ঘাটের-দিকে-মুখ-করা কামানের ছিদ্র। কিছু দূর চলিবার পর আমরা ঐ জলধারার পাশ ছাড়িয়া, একটি ছোট পাহাড় ও একটি নালা পার হইয়া চবা-অঙ-চারো গ্রামে পেঁাছিলাম। গ্রামে মাত্র পাঁচ ছয়টি ঘর, একটি বেশ বড়, বোধ হয় কোন ধনীর, অন্যগুলি খুব ছোট। সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমি এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় লইলাম, অশ্বতরওয়ালারা মাঠে লোহার খোঁটায় দড়ি দিয়া জীবগুলিকে বাঁধিয়া বোঝা নামাইয়া ভুষি খাওয়াইল। ভুষি খাওয়ানো হইলে তাহাদিগকে খুলিয়া জল-পান করাইয়া মুখে দানার থলি বাঁধিয়া দিল। দানা বলিতে এখানে দলিত কাঁচা মটর বা ঐ জাতীয় পদার্থ দেওয়া হয়। আমাদের জন্য বৃদ্ধা থুক্‌পা রাঁধিয়া দিল এবং শয্যার জন্য গদিও পাতিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে এক টঙ্কা "নে-ছঙ" (বাস করিবার জন্য বকশিশ) দিয়া অশ্বতর-ওয়ালাদের দলের দিকে চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা প্রস্তুত হইয়া চলিতে লাগিল। পথ বহুদূর পর্য্যন্ত উৎরাই, চারিদিকে কালো পাথর চক্‌চক্ করিতেছে, মধ্যে অশ্বতরের পাল লোহার ঘণ্টার ধ্বনিতে পথ মুখরিত করিয়া দ্রুত চলিয়াছে। প্রায় এগারটা নাগাদ উৎরাইয়েব শেষে একটি লাল রঙের গুম্বা দেখা দিল এবং সামনে একটি নদীও পাইলাম। নদী পার হইয়া তাহার দক্ষিণ তীর ধরিয়া উপরের দিকে কিছু দূর গিয়া এক গ্রামে চা-পানের জন্য আমরা থামিলাম। গ্রাম হইতে নদী ছাড়িয়া অল্প চড়াইয়ের পর অনেক দূর পর্য্যন্ত সমতল পথে চলিয়া লা (ঘাট) পার হইলাম। এখানকার মাটি মসৃণ ও হরিদ্রাভ, বর্ষায় চাষের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আরও পরে কতকগুলি ক্ষেত দেখা গেল, সেগুলিও বর্ষার উপর নির্ভর করে। এইরূপে অনেক দূর চলিয়া শব্‌-কী নদীর পারে একটি বড় গ্রামে পেঁাছিলাম। গ্রামে বড় বড় ঘর, সফেদা ও বিরিবৃক্ষের বাগান এবং সেচ-খালের ব্যবস্থা সবই আছে। এখানে নদীর উপর পাথরের সেতুও রহিয়াছে। সেতু এবড়ো-খেবড়ো পাথরের তৈয়ারী, মাঝে মাঝে কাঠের ব্যবহারও হইয়াছে, স্তম্ভগুলি রক্ষার জন্য তাহাদের মূলে চবুতরা করা আছে। নদীর তট বিস্তৃত, কিন্তু সমতল নহে। আমরা নদীকে দক্ষিণে রাখিয়া আগে চলিলাম, কিছুক্ষণ চলিবার পর নদী বহুদূরে পড়িয়া রহিল। বেলা চারটার সময় নে-চোঙ্ গ্রামে পেঁাছিলাম, এখানে অশ্বতর গাধা ইত্যাদি রাখিবার

ব্যবস্থা আছে। এখানকার লোকে চা ভুষি প্রভৃতি জিনিষ বিক্রয় করিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করে, সুতরাং এইরূপ গাধা-অশ্বতরের দলকে আদর-যত্ন করিয়া থাকে। আজিকার পথ দীর্ঘ, অশ্বতরে চড়িয়া চলিতে চলিতে গায়ে ব্যথা হইয়াছিল। আমি গিয়াই, যে-ঘর আমাদের দেওয়া হইল সেখানে বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ আমাকে দু-চার কথা শুনাইয়া চা তৈয়ারী করিতে বসিলেন। রাত্রে থুক্পা রাঁধিবার সময়ও তিনি বেশ দু-কথা শুনাইলেন, এই তো তাঁহার প্রধান দোষ—তবে আমি কিছুই বলিলাম না।

২৯শে জুন প্রাতে রওয়ানা হইয়া সোজা সমতল পথ দিয়া আমরা চলিলাম। দশটার সময় লা অর্থাৎ ঘাট পার হইলাম। চড়াই-উৎরাই না থাকায় ইহাকে লা বলা উচিত নহে, তবে এখানে দস্যুভয় আছে যথেষ্ট। তাহার পর সামান্য উৎরাই এবং আরও পরে প্রায় সমতল ঢালু উপত্যকার বিস্তৃত জমি। বারটার পর আমরা নার-থঙ্ পৌঁছিলাম, এখানকার কঞ্জুর-তঞ্জুরের ছাপাখানা বৃহৎ, সে বিষয়ে পরে বলিব। এখানে অল্পক্ষণ থাকিয়া চা-পান করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। দুইটার পর পর্ব্বতমূলে বিশাল মঠ দেখিতে পাইলাম, ইহাই টশী লামার বিখ্যাত টশী-লুন-পো মঠ।

মঠ দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র সকলে অশ্বতর হইতে নামিয়া পড়িল। উপর-নীচে সাজানো সুদূরবিস্তৃত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যস্থিত মন্দিরগুলির চীনা-ধরণের ছাদের সোনালী শোভা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। মঠের সর্ব্বনিম্ন অংশে টশী লামার উদ্যান, তাহারই দেওয়ালের পাশ দিয়া আমরা মঠের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বারের কাছে বাগানে ছোট ছোট কেয়ারীতে ও গামলায় মূলা এবং শাকসব্জি লাগানো রহিয়াছে। এখান হইতে শীগর্চীর বস্তী মাত্র কয়েক শত গজ দূরে। সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন চীনা দুর্গের নগ্ন মৃত-প্রাচীর, তাহার পর প্রস্তরে ক্ষোদিত বহু মন্ত্র ও দেবমূর্ত্তি প্রাচীরে স্থাপিত আছে, তাহার নাম "মানী"। অবলোকিতেশ্বরের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"; মণি শব্দ হইতে এইরূপে জপচক্র ও মন্ত্রপূত স্তূপের নাম "মানী" হইয়াছে। মানীর বাম পাশ দিয়া আমরা শীগর্চীতে প্রবেশ করিলাম। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া অশ্বতর-ওয়ালারা আমাদের জিনিষপত্র নামাইয়া দিল এবং সুমতি-প্রজ্ঞ আশ্রয়ের সন্ধানে গেলেন। তাঁহার পরিচিত গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাডাকি করিয়াও কেহ বাহিরে আসিল না দেখিয়া আমরা আরও কয়েক জায়গায় চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় আমাদের বেশ; এরূপ জার্ণ মলিন বসনধারীকে স্থান দেয় কে? শেষে অনেক চেষ্টার পর এক সরাইয়ের বারান্দায়, দৈনিক এক টঙ্কা ভাড়ায় জায়গা পাওয়া গেল।

সে-রাত্রেও সুমতি-প্রজ্ঞ অশেষ কটূক্তি করায় আমি ভাবিলাম ইঁহার সঙ্গে আর

চলা যায় না। ইঁহার এ অভ্যাস যাইবে না, আমি উত্তর না-হয়-নাই দিলাম, কিন্তু মনের শান্তি অটুট রাখাও সম্ভব নহে। পরদিন সকাল হইতেই আমি মালপত্র ছাড়িয়া কোন নেপালীর খোঁজে বাহির হইলাম। নেপালে এক সজ্জন শীগর্চীবাসী নেপালী দুই সওদাগর ভ্রাতার ঠিকানা দিয়াছিলেন। আমি তাহাদেরনাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু দুই ভাই একত্রে এখানে ব্যবসায় করেন বলায় এখানকার এক নেপালী সজ্জন তাহাদের নাম ঠিকানা বলিয়া দিলেন। এখানে বিশ-পঁচিশটি নেপালী দোকান আছে, তাহার মধ্যে চার-পাঁচটি বেশ বড; সুতরাং আমি সহজেই তাঁহাদের খুঁজিযা পাইলাম। সকাল সাতটা—তখনও পর্যন্ত সাহু নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু আমার খবর পাওয়ায় বাহিরে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং অতি আদরের সহিত আমাকে স্বাগত করিয়া তাঁহার লোককে আমার সঙ্গে মালপত্র আনিতে পাঠাইলেন। সরাইয়ে আমাদের দু-জনের ভাড়া চুকাইয়া এবং সুমতি-প্রজ্ঞের জন্য নিজের ঠিকানা রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সেখানে গরম জল ও সাবানে মুখ হাত ধুইয়া সত্তু-সহ চা ও মাংস ভোজন করিলাম।

ভোজনের পর শ্রীআনন্দ ও অন্য বন্ধুদের নামে চিঠি লিখিয়া সাহু মহাশয়কে দিলাম এবং শীঘ্র আমার লাসা যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি দশ-বার দিন থাকিতে বলায় বলিলাম, "আমি লুকাইয়া চোরের মত যাইতেছি, ধরা পড়িলে এখান হইতেই ফিরিতে হইবে। লাসায় গিয়া দলাই লামাকে নিজেব পরিচয় দিয়া কোন সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব।" ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া অশ্বতরের আড্ডায় চলিলেন, কিন্তু লাসাযাত্রী কোন দল পাওয়া গেল না। শেষে ল্যের্সের সেই দলের খোঁজে গেলাম, কিন্তু সেখানেও তাহারা আড্ডায় ছিল না; সুতবাং আমাদেব সঙ্গে তাহাদিগকে দেখা করিতে বলিয়া আসিলাম।

ভোটদেশে লাসার পরই শীগর্চী বৃহত্তম বসতি। এখানে দশ হাজার লোকের বাস। তাহার মধ্যে বিশ-পঁচিশ ঘর নেপালী ব্যাপারী এবং অনুরূপ সংখ্যার মুসলমান দোকানী আছে। অধিকাংশ দোকানই ঘরের ভিতর দিকে স্থিত, রাস্তার দিকে মুখ থাকিলে লুটের আশঙ্কা আছে এই জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা। প্রতি নেপালীর দোকানে দুই-তিনটি পাঁচ-ছয় নলা পিস্তল আছে। আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা ছাড়া প্রত্যেকের ছাদে দুই চারটি বৃহৎ কুকুর ছাড়া থাকে, যাহাতে দস্যুদল ছাতে উঠিয়া ভিতরে ঢুকিতে না পারে।

এখানে সকাল ন'টা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত বৃহৎ মানীর পিছনে হাট বসে। শাক-সব্জী, কাপড়, বাসন, মাখন ইত্যাদি সমস্তই ঐ দুই ঘণ্টায় বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে না হইলে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। হাটের পশ্চিম দিকে লাসায় দলাই লামার প্রাসাদ—"পোতলা"র আকারে নির্ম্মিত জোঙ্। এখানকার

স্ত্রীলোকদিগের শিরোভূষণ দেখিতে অনেকটা ধনুর মত। উহার দুই ধারে পরচুলার বেণী থাকে এবং অবস্থা অনুযায়ী প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতিও লাগানো হয়। ভোটদেশে আসিবার পর এখানেই প্রথম শূকরের বাহুল্য দেখিলাম।

১লা জুলাই রামপুর-বুশহর (শিমলা-পাহাড় অঞ্চল) হইতে আগত তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ যুবক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। দেশের স্কুলে আপার প্রাইমারী পর্য্যন্ত উর্দ্দু পড়ায়, তাহার উর্দ্দু ও হিন্দী কথা পরিষ্কার; এখন চার-পাঁচ বৎসর যাবৎ এখানে ভোটীয় ভাষায় লেখাপড়া শিখিতেছে। কুতী ছাড়িবার পর ইহার সঙ্গেই প্রথম হিন্দী বলিবার সুযোগ পাইলাম। তাহার নিকট সংবাদ পাইলাম যে, আমার পরিচিত এক লদাখী যুবক গৃহ ও মুহুরীর চাকরি ছাড়িয়া এখানে ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আসিয়াছিল 'সে দুই বৎসরের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হইয়া লাসার এক তরুণী যোগিনীকে সঙ্গে লইয়া এই পথে দিনকয়েক পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে। রামপুরের এই যুবকের নাম রঘুবর। রঘুবর তাহাকে নর-কপালে "কারণ" পান ও ভূত ভবিষ্যৎ গণনায় লোকের সুখ-দুঃখের কথা বলিতে দেখিয়াছে। এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে সেই অশ্বতর-ওয়ালারা আসিয়া পড়িল। তাহাদের সঙ্গে আট সাঙ্ (পাঁচ টাকার কিছু বেশী) ভাড়া ঠিক হইল এবং তাহারা গ্যাঞ্চীর পথে বার দিনে আমাকে লাসায় পৌঁছাইয়া দিবার কথা দিল। সোজা পথে লাসা সাত দিনে যাওয়া সম্ভব এবং গ্যাঞ্চীতে ইংরেজ বাণিজ্যদূত থাকায় সে-পথে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমার যাইবার অন্য উপায় না থাকায় এবং এত দিনে নিজের ছদ্মবেশের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস হওয়ায় উহাতেই রাজী হইলাম।

২রা জুলাই দ্বিপ্রহরে নদী-তীরে নাচের আয়োজন ছিল। সকল শ্রেণীর লোকই মদ্য ও খাওয়াদাওয়ার অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া সেখানে যাইতেছিল, কেন-না ভোটীয়েরা নৃত্যে বিশেষ আসক্ত। নাচ হইলে ইহারা সবই ভুলিয়া যায়। স্ত্রীলোকেই নাচে, বাদ্য বাজায় পুরুষ। এখানেও প্রায় প্রত্যেক নেপালীর ভোটীয় রক্ষিতা আছে, তাহারাও নাচে যাইতেছিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নাচ চলিল, তাহার পর যে-যার ঘরে ফিরিল। এদেশে চাউল জন্মায় না, কিন্তু নেপালী মাত্রেই অন্ততঃ রাত্রে একবার ভাত খায়, মাংস তো তিন বেলা চলে এবং রাত্রে মদ্যপান নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার।

৩রা জুলাই যাত্রার দিন। সেদিন অতি প্রত্যূষেই সাহুর সঙ্গে আমি টশীল্যুম্পো গুম্বা দেখিতে গেলাম। এখানে বহু দেবালয় আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান এবং সেগুলির ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত। প্রথমে আমরা আগামী বুদ্ধ মৈত্রেয় দেখিতে গেলাম। অতি বিশাল মূর্ত্তি, মুখ উত্তমরূপে দেখিতে হইলে দ্বিতলে উঠিতে হয়, প্রতিমা মৃন্ময়, কিন্তু সোনার পাতে আচ্ছাদিত। মৈত্রেয় মূর্ত্তি শান্ত ও সুন্দর এবং কক্ষ নানাবর্ণের

রেশমী ধ্বজায় অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। প্রতিমার সম্মুখে স্বর্ণ-রৌপ্যময় ঘৃত-প্রদীপ অবিরাম অষ্টপ্রহর জ্বলিতেছে। মূর্ত্তির আশেপাশে অনেক ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রহিয়াছে এবং পাশের কক্ষে শত শত সুন্দর ছোট পিত্তলের মূর্ত্তি সাজানো আছে। ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য্য ও সিদ্ধ পুরুষের মূর্ত্তিও ইহার মধ্যে আছে। অঙ্গহীনকে সাধু শ্রেণীভুক্ত করা বিনয়ের মতবিরুদ্ধ, কিন্তু এখানে কানা শ্রমণ দেখিলাম। এক দিকে ভোটীয় ভাষায় সূত্রগীত হইতেছে শুনিলাম, সুর নেপালী সূত্রগীতের অনুরূপ। অন্যান্য মন্দিরও অতি সুন্দর এবং স্বর্ণরৌপ্য মণি-মাণিক্যে পূর্ণ। আজ সময় ছিল না এবং পুনর্ব্বার এখানে আসিতে হইবে, সুতরাং শীঘ্র দেখা সাঙ্গ করিয়া ফিরিলাম। ফিরিবার পথে ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গে দেখা হইল।

ভোজনের আয়োজন ঠিক ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে খাওয়া হইল না। নয়টার মধ্যে মালপত্র লইয়া ঘোড়াওয়ালাদের নিকট পৌঁছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে শীগর্চী ত্যাগ করিলাম। চারিদিকে শ্যামল ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে নহরের (সেচ-নালী) জলস্রোত চলিয়াছে, যব ও গমের চারা উঠিতেছে এবং সরিষার ফুলের পীত শোভায় চারিদিক আলোকিত। কোথাও বা লাল ফুলে পূর্ণ মটরের ক্ষেত, কৃষকেরা কোথাও জলসেচনে, কোথাও বা ঘাস নিড়াইতে ব্যস্ত। পথের চারিদিকে ক্রোশব্যাপী ক্ষেত, অশ্বতরেরা যাহাতে ক্ষেতে চরিতে না-পারে সেইজন্য তাহাদের মুখে কাঠের চুপড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামগুলির নিকট সাদা ছাল এবং সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত সফেদা বৃক্ষের ছোট ছোট বাগান ছিল। বিরি গাছের কাটা মাথা হইতে পাতলা সবুজ পাতায় ঢাকা লম্বা বেতের মত সরু শাখাগুলি পিশাচের মাথার চুলের মত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন আমরা মাঘ মাসে ভারতের যুক্তপ্রদেশের প্রান্তস্থিত কোনও অঞ্চলে রহিয়াছি। এক ঘণ্টা পথ চলার পর তুরিং গ্রামে পৌঁছিলাম, আজ আমাদের এখানেই বাসা।

আমাদের তিনজন ঘোড়াওয়ালার মধ্যে একজন ছিল সর্দ্দার, উহার অশ্বতরের সংখ্যাই অধিক। সে কিছু লেখাপড়া জানিত এবং নিজেকে উচ্চবংশীয় প্রমাণ করিবার জন্য ফিরোজা পাথর-বসানো প্রায় আড়াই তোলা ওজনের সোনার মাকড়ী কানে পরিত। হাতের বাম অঙ্গুষ্ঠেও চওড়া সবুজ পাথরের সিল আংটি ছিল। অন্য দুইজনের কানে পাঁচ-ছয় তোলা ওজনের রূপার আংটা ছিল। মাথায় পুরানো ইংরেজী ফেল্ট হ্যাট তো এখন তিব্বতে সাধারণ ব্যবহারের জিনিষ।

আমরা গ্রামে পৌঁছিলে অশ্বতরগুলি বাহিরে বাঁধা হইল এবং তাহাদের খাওয়ানো চলিল। আমরা ভিতরে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাম কর্ণে লম্বিত প্রবাল-মুক্তা-জড়িত সোনালী পেন্সিল তাঁহার সরকারী উচ্চপদের পরিচয় দিতেছিল।

তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সঙ্গীরা লম্বা জিহ্বা বাহির করিয়া ডান হাতে টুপি খুলিয়া দুই-চারবার উপর-নীচে সঞ্চালন করিল ; এইরূপে অভিবাদনের পালা শেষ হইলে সকলে মাটিতে বিছানো গদীর উপর বসিলাম। যদিও আগেকার ন্যায় আমার পরিধেয় ভিখারীর মতই ছিল, তবুও নেপালী সাহুর নিকট এত সম্মান পাওয়ার ফলে সঙ্গীদের নিকটও সম্মান পাইতেছিলাম। আমিও মাঝে মাঝে নিজের ভিক্ষুক-বেশের উপযোগী আচরণ ভুলিয়া যাইতেছিলাম। এক্ষেত্রেও আমাকে বিশেষ আসন এবং চা-পানের জন্য চৈনিক চীনা-মাটির পেয়ালা দেওয়া হইল, অন্যদের দেওয়া হইল শুকানো মাংস ও ছঙ্। সর্দ্দার মদ্যপান করিত না, সে চা-পান করিল ; অন্যেরা ঘোড়া-আগলানোর মাঝে ক্রমাগত ছঙ্ চালাইল। গৃহকর্ত্তার চাকরাণী তাহাদের তামা-পিতলের ছঙ্দানে সর্ব্বদা মদ ঢালিতে থাকিল। ক্লান্ত হইয়াও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা পান থামাইল না, পেটে স্থান ছিল না, সুতরাং টুপি খুলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া অবিরাম অধিকারী মহাশয়কে সেলাম জানাইতে লাগিল, কিন্তু "উহাদের আরও দাও" হুকুম পূর্ব্ববৎ চলিল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে ছঙের পালা শেষ হইল।

ভোটীয়দিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কলারুচি সাধারণভাবে ব্যাপ্ত। এই ঘরের দেওয়ালের হাসিয়া (dado) সুন্দর এবং লাল সবুজ ঝালরে সুসজ্জিত। সতুর কাষ্ঠপাত্র নানারূপে অলঙ্কৃত, চায়ের চৌকী নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং তাহার পায়াগুলির বর্ণবিন্যাস সুরুচির পরিচায়ক। বসিবার গদী ঘাসে ঠাসা, কিন্তু তাহার খোল নানা বর্ণের উলের পট্টি দিয়া সুন্দরভাবে সাজানো এবং তাহার উপর চীনদেশীয় ছাপা ফরাস পাতা। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি হওয়ায় অঙ্গনে কালোপাড়-যুক্ত সাদা জিনের চাঁদোয়া খাটানো হইল। জানালার পাল্লাগুলি কাঠের জালির উপর কাপড় মুড়িয়া তৈয়ারী, বাহিরের দিকে কালো ধারিযুক্ত সাদা জিনের পর্দ্দা, সেগুলি রঙীন ঘুন্টি ও দড়ির সাহায্যে যতটা ইচ্ছা খোলা ও গুটানো যায়। বৈঠকখানার পাশেই অধিকারী মশায়ের দুই পুত্র শিক্ষকের কাছে পড়িতেছিল। এদেশে সুন্দর ও দ্রুত লেখার জন্য দুইপ্রকার লিপি ব্যবহৃত হয়, প্রথমটি "উ-চেন" (দাঁড়ি-যুক্ত), অন্যটি "উ-মেদ" (দাঁড়ি-বিহীন)। সাধারণভাবে উ-মেদের ব্যবহার ও প্রয়োজন অধিক, সেইজন্য ভিক্ষু ভিন্ন অন্য সাধারণে ঐ লিপিই শিক্ষা করে। এখানে শিক্ষক কাগজের উপর নিজে সুন্দরভাবে অক্ষর লিখিয়া দিতেছিলেন, ছাত্রেরা কাঠের পাটায় তাহার অনুকরণ ও অভ্যাস করিতেছিল। আমাদের পুরাতন পাঠশালার পণ্ডিতদের মত এখানেও শিক্ষায় বেতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলিয়া গৃহীত। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের ভুল হইলে তাহাকে গাল ফুলাইতে বলিয়া গালের উপর চওড়া বেত বা চেঁচাড়ি দিয়া সশব্দে ভুল শোধন করিতেছিলেন।

এই তিব্বতী ভদ্র-মহোদয়ের গৃহে বহু চাকর-চাকরাণী কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "চাম-কুশোক" (ভদ্র-মহিলা অর্থাৎ কর্ত্রী ঠাকুরাণী) মাথায় ধনুকাকার মুক্তাপ্রবাল-মণ্ডিত শিরোভূষণ পরিয়া ক্রমাগত রন্ধনশালা, মদ্যাগার, দেবগৃহ প্রভৃতি বাড়ীর সকল অংশে ঘুরিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারও হাতে-মুখে বেশ এক পোঁছ ময়লা জমিয়াছিল এবং পরিচ্ছদের সামনে-ঝুলানো পশমী ঝাড়ন একেবারে কালো রঙে দাঁড়াইয়াছিল। রাত্রে মাংসযুক্ত থুক্‌পা ভোজনের পর আঢ্য মহাশয় অনেকক্ষণ আমার জন্মস্থান লদাখ সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, তাহার পরে অনেক রাত্রে নিদ্রার জন্য সভা ভঙ্গ হইল। ততক্ষণে কর্ত্তা-মহাশয়ের দুই পুত্র লোমযুক্ত মোটা মোলায়েম কম্বল "চুকটু"-নির্ম্মিত থলির মধ্যে নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছিল। ভোটদেশে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করে, ইহাতে তাহাদের সঙ্কোচ বোধ নাই, এমনকি ঘরে একই পিতামাতা, পুত্র-পুত্রবধূ ভিন্ন ভিন্ন শয়নস্থালিতে ঐ ভাবে নিদ্রা যায়, বহু-ভর্ত্তৃকা পত্নীও ঐ ভাবে পতিমণ্ডলীর সঙ্গে লেপ-কম্বলের মধ্যে নিদ্রা যায়।


মাথায় ধনুকাকার শিরোভূষণে তিব্বতী রমণী

৪ঠা জুলাই সকাল দশটায় ডুরিং হইতে যাত্রা করিয়া ক্ষেতের মাঝের পথ ধরিয়া আমরা দুইটা নাগাদ জু-গ্যা গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামে পৌঁছিবার একটু আগেই পথ এক গভীর ও স্বল্প-পরিসরের সেচ-নালীর পাড় দিয়া চলিয়াছিল। অশ্বতর জীবটাই দুষ্ট, কখনও সোজা পথে চলে না, একটা বুড়া

অশ্বতর বোঝাসুদ্ধ ক্ষেতের উঁচু আলে উঠিয়া প্রহারের ভয়ে সেচ-নালীর গভীর অংশে লাফাইয়া পড়িল। চাউলের বোঝার ভারে প্রথমে তো সেটা মুখ থুবড়াইয়া জলের ভিতর বসিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম আপদটা বুঝি মরিল, কিন্তু অশ্বতরওয়ালারা তাহার মুখ জলের উপর তুলিয়া ধরিয়া চাউলের বস্তাগুলি ক্ষিপ্রতার সহিত খুলিয়া লওয়ায় দুষ্ট বাহনটি উঠিয়া আসিতে পারিল। চাউল ভিজিয়া গিয়াছে; এদিকে চাউলের বস্তার মুখ বন্ধ এবং গালা দিয়া সীলমোহর করা, কিন্তু চাউল না শুখাইলে লাসা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহা অখাদ্য অবস্থায় পরিণত হইবে; সুতরাং অশ্বতর-ওয়ালাবা জু-গ্যা গ্রামে পৌঁছিয়া ঐ মোহর ভাঙিয়া চাউল খুলিয়া বাহির করিয়া কম্বলের উপর ছড়াইয়া শুখাইতে দিল। পারিশ্রমিক হিসাবে দিন দুই-তিনের মত থুক্‌পার জন্য চাউলের ব্যবস্থাও করিয়া লইল।

শীগর্চী হইতে আমরা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ছাড়িয়া গ্যাঞ্চীর নদীর উপত্যকা দিয়া চলিতেছিলাম! সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে শীগর্চী ১২,৮৫০ ফুট এবং গ্যাঞ্চা বা 'গিয়াংসি' ১৩,১২০ ফুট উচ্চে অবস্থিত; সুতরাং গ্যাঞ্চীতে অপেক্ষাকৃত অধিক শৈত্য অনুভূত হয়। এখনও আমরা শীগর্চী হইতে বিশেষ দূরে আসি নাই, সুতরাং এই অঞ্চল গরম বলিয়াই অনুভব করিতেছিলাম। এখানের ক্ষেতে প্রচুর বথুয়া শাক দেখিলাম। জু-গ্যা'তে আমাদের সর্দ্দারের পূর্ব্বজদিগের ভদ্রাসন। মাত্র দুই-এক পুরুষ আগে ইহারা এখান হইতে লাসার কাছে গন্দনে ভিটা বাঁধিয়াছে। খবর পৌঁছিবামাত্র সর্দ্দারের জ্ঞাতিভাইদের পত্নীরা পানভোজনের সম্ভার লইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। মুড়ি, খই, তেলে-ভাজা, সেও, কমলালেবুর মিঠাই এমনি অনেক খাবার আসিল। এ দেশের নিয়ম এই যে, ঐরূপ খাদ্য-সামগ্রী সামনে রাখিলে দুই-চার দানা মাত্র মুখে দিতে হয়, নহিলে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করা হয়। আমিও ভদ্রতা রক্ষা করার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু সর্দ্দার বলিল, "খুব খাও।" পরে প্রচুর মাখনযুক্ত গরম চা-ও অনেক আসিল। রাত্রে সর্দ্দার তাহার জ্ঞাতিবন্ধুদের ঘরে দেখা করিতে গেল।

৫ই জুলাই যবের আটা সিদ্ধ ও গরম সরিষার তৈল প্রাতরাশের জন্য আসিল, তবে আমি তাহা খাইলাম না। দশটার সময় অশ্বতরগুলিকে খাওয়াইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। আজ পথ অল্পই ছিল, গ্রাম হইতে দক্ষিণ মুখে প্রথমে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিয়া, পাহাড়ের নীচে নীচে ক্ষেতের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। এদিকে সেচ-নালীর ব্যবস্থা ভাল, সে-সব পার হইয়া আড়াই মাইল আন্দাজ পথ চলিয়া আমরা পা-চা গ্রামে পৌঁছিলাম। অশ্বতরগুলি ইতিপূর্বে ভাল বিশ্রাম করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই সর্দ্দারের ইচ্ছা ছিল এখানে দু-চার দিন থাকিয়া তাহাদের সস্তা দানা-ভুষি খাওয়ায় এবং নিজে নাটক অভিনয় দেখে। পা-চা

গ্রামে যাহার গোশালায় আমরা ছিলাম, সে এ-অঞ্চলের বড় জায়গীরদার। তাহার গৃহের ভিতরে যাই নাই, কিন্তু বাহির হইতে উহা অতি সুন্দর মনে হইতেছিল।

চা-পানের পর সকলে নাটক অভিনয় দেখিতে গেলাম। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে, প্রায় এক মাইল দূরে, নদীর পাড়ে অভিনয় চলিতেছিল। এখানে এই যাত্রাকে "অচী লাহমো"র, "তেমু" অর্থাৎ "স্ত্রী দেবীর লীলা" অভিনয় বলে। ইহাকে ভোটীয় ধর্ম্মাভিনয় বলা উচিত। আমাদের সঙ্গে দুটি বড় কুকুর ছিল, সেগুলিকে দরজায় বাঁধিয়া দ্বারে তালা দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। সবুজ ঘাসে ভরা প্রান্তরে রঙ্গভূমি, তাহার পাশে তিব্বতী বাবলাগাছের জঙ্গল। এই যাত্রা প্রতি বৎসর এখানকার জমিদার নিজের খরচে করাইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ নাটকের অভিনেতা। ভিক্ষুপাত্রদের পান-ভোজন পারিতোষিকের ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হয়; অধিকন্তু অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আহারাদির ব্যয়ও তাঁহাকে দিতে হয়। নাটকের অভিনয়ের জন্য বৃহৎ চতুষ্কোণ শামিয়ানা টাঙানো ছিল। আশেপাশে আরও অনেকগুলি ছোট বড় শামিয়ানায় দূর হইতে আগত অতিথিদের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল, সেগুলির পাশে তাহাদের ঘোড়া বাঁধা থাকিত। রঙ্গভূমির দক্ষিণে ছোট ছোট সুন্দর তাম্বুতে বহু সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষ বসিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বদিকে রৌদ্রের মধ্যেই অন্য অতিথিদের জন্য ফরাস বিছানো ছিল। অন্য সব দিকে অন্যান্য দর্শকেরা নিজ নিজ আসন বিছাইয়া বসিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক। জমিদার মহাশয় আমার সঙ্গীকে দেখিয়াই লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া পূর্ব্বদিকের ফরাশের উপর বসাইলেন। নাটক দেখার সঙ্গে চা ও ছঙ-পান সমানে চলিতেছিল, আমাদের জন্যও চা আসিল। দ্বিপ্রহরে রৌদ্র প্রখর হওয়া সত্ত্বেও লোকে উঠিবার নাম করিল না। ভোটীয় নাটকের যবনিকার ব্যবহার নাই, রঙ্গমঞ্চও সমতল-ভূমি। অভিনেতাদের জন্য বাদকদিগের স্থানের পার্শ্বে মদ্যপূর্ণ চামড়ার মটকা সাজানো। বাদ্যের মধ্যে রোশনচৌকী, দীর্ঘাকৃতি বীণ, এবং দীর্ঘ দণ্ডের উপর স্থাপিত এক প্রকার ডমরু। বাদক ও নট সকলেই নিকটস্থ এক গুম্বার "ঢাবা"। নাটকের প্রসঙ্গ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের জাতক সম্বন্ধীয় এবং অভিনয়ের মধ্যে নৃত্যগীত, রঙ্গভঙ্গী, কৌতুক সবই ছিল। অভিনেতাদের মুখোস কাগজ বা কাপড়ের, বেশভূষা সুন্দর। গানের প্রশংসা চারি দিকেই, যদিও গানের কথার তাৎপর্য্য দু-চারজনও বুঝিতেছিল কিনা সন্দেহ। গদ্য-পদ্য দুয়েরই উচ্চারণের কৃত্রিমতায় আমাদের •রামলীলার অভিনয়ের অস্বাভাবিক আবৃত্তির কথা মনে হইতেছিল। যাত্রার এক অঙ্কে চারিটি স্ত্রী-ভূমিকা ছিল, তাহাদের পরিচ্ছদ স্বাভাবিক। অমনিতেই সাধারণ ভোটীয় মহিলাদের বেশ যথেষ্ট কৃত্রিম (যথা, পরচুলার ব্যবহার, বৃহৎ শিরোভূষণ ইত্যাদি), নাটকে অধিক কিছু করবার প্রয়োজন ছিল না।

এই চারিটি নারীর মধ্যে দুইজন চাং (কুতী হইতে খম্বা-লা পর্য্যন্ত) অঞ্চলের ধনুকাকার শিরোভূষণ এবং অন্য দুইজন লাসা অঞ্চলের ত্রিকোণ শিরোভূষণ পরিয়াছিল। লাসার বেশ যাহারা পরিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন এত ভাল সাজিয়াছিল যে, স্ত্রী-দর্শকেরাও তাহাকে প্রকৃত স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল, যদিও সকলেই জানিত এই শ্রেণীর নাটকে স্ত্রী-অভিনেত্রী লওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। নৃত্যে তাল-লয়-সহযোগে মন্দগতিতে অগ্রপশ্চাৎ গমন, হস্তসঞ্চালন, চক্রবৎ পরিভ্রমণ সবই অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রহসনের মধ্যে বৈদ্য ও মন্ত্রবিশারদের এক অঙ্কে কিছু অশ্লীল অংশ ছিল, কিন্তু লোকে হাসিয়া গড়াইতেছিল। নাটকের পাত্রগণের অধিকাংশই দেবতা। নাটকের মধ্যেই পান-লীলা ছিল, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ-বেশে সুসজ্জিত বহু রাজপরিচারক রৌপ্যময় পানপাত্রে মদ্য লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেলা দুইটার সময় সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগের মধ্যে মাংস, ডিম্বাদি পরিবেশন আরম্ভ হইল। মাংস কিসের স্থির করিতে না পাবায় আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। খাইবার সরঞ্জামের মধ্যে কাঠের বাবকোস, চীনা-মাটির বাসন এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত চীনা "চপ-ষ্টিক" (চীনারা এই শলাকা কাঁটা-চামচের মত ব্যবহার করে) দেওয়া হইতেছিল। চীন দেশের সঙ্গে বহুদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এদেশে বহু চীনা রীতি-নীতির চলন হইয়াছে। বেলা চারিটার সময় আমরা ফিরিলাম, পথে একজন ভোটীয়কে বলিতে শুনিলাম, "এ নিশ্চয় ভারতীয়।" ইহাতে আমি একটু শঙ্কিত হইলাম, তবে লদাখ ও বুশহরের লোকের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য থাকায় এরূপ সন্দেহ ঘুচানো সহজ, সুতরাং ভয়ের কারণ বিশেষ ছিল না। গ্যাঞ্চী কাছে হওয়ায়, এখানের অনেকে ভারতীয় সিপাহী দেখিয়াছে, তাহাদের এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের কুকুর দুইটি এতদিনে আমাকে চিনিয়া গিয়াছিল। কুকুরগুলির বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমি প্রথমে ভাবিতাম, ভোটীয়েরা নিশ্চয়ই উহাদের খুব খাওয়ায়; কিন্তু দেখিলাম প্রাতে সের-দুই গরম জলে দেড় ছটাক আন্দাজ সত্তু এবং সন্ধ্যায়ও তাহাই মাত্র ইহাদের আহার। তিব্বতী কুকুর মাত্রেরই দৈনিক খাদ্যের এই পরিমাণ। বস্তুতঃ ঐ দেশে সকল কুকুরই সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্ত থাকে, কেন না একদিন যাত্রা শুনিতে না যাওয়ায় আমি ঐ কুকুর দুইটিকে খাওয়াইয়া দেখিলাম এক-একটি প্রায় এক সেরের উপর সত্তু পার করিল। যেখানে আমরা ছিলাম সেই গৃহের মধ্যেও একটি বিরাট কুকুরের ছালে ভুষি ভরিয়া লট্‌কাইয়া দেওয়া ছিল। কোথাও কোথাও ঐরূপে য়াক ও ভল্লুকের ছাল ও টাঙান দেখিয়াছি, বোধ হয় ইহা তিব্বতী তুকতাকের অঙ্গীভূত। ভোটীয়েরা রাত্রে ছাদে কুকুর ছাড়িয়া দেয়। এক রাত্রে আমি ও আমার এক সঙ্গী ভুলক্রমে ছাদেই শুইয়াছিলাম। অতি ভোরে সঙ্গী উঠিয়া চলিয়া যায়, আমি শুইয়া থাকায় (না বুঝিতে পারায়) কুকুরগুলি

আমাকে আক্রমণ করে নাই, কিন্তু জাগিবামাত্র আমি বুঝিলাম উঠিলেই আমাকে কুকুরের সঙ্গে লড়িতে হইবে। সুতরাং অনেক দেরি হওয়া সত্ত্বেও, যতক্ষণ একজন বাড়ার লোক উপরে না আসিল, ততক্ষণ আমি চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

সুমতি-প্রজ্ঞ একদিন বলিয়াছিলেন এদেশের লোকে উকুন খায়। সেই সময় এই অশ্বতরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় সে এ-কথা অস্বীকার করে। একদিন ঐ সর্দ্দারেরই এক ধনী জ্ঞাতির তরুণী আমাদের বাসায় আসিল। ভোটীয়েরা স্নান না করায় উকুনের উৎপাত স্বাভাবিক। স্ত্রীলোকদের সাধারণ পরিচ্ছদের মধ্যে বাহিরে লম্বা পশমী ছুপা (চোগা), ভিতরে কোমরের উপরে রঙীন সূতা বা রেশমী জ্যাকেট, এবং কোমরের নীচে সূতা বা রেশমী লম্বা ঘাগরা। এই জ্যাকেট ও ঘাগরা শরীরে লগ্ন হওয়ায় ঐগুলিতেই উকুনের বাসা। ঐ তরুণী সেদিন তাহার জ্যাকেট খুলিয়া তাহা হইতে উকুন বাছিয়া খাইতে লাগিল। আগে একজন ভোটীয় আমায় বলিয়াছিল, এরূপ ব্যাপার এদেশে অতি সাধারণ এবং উকুন খাইতে টক লাগে।

৮ই জুলাই প্রাতরাশের পর আবার যাত্রারম্ভ হইল। সুরুতেই একটা অশ্বতর তাহার বোঝার বন্ধনী খুলিয়া ফেলায় কিছু দেরি হইল। গ্রাম হইতে প্রথমে দক্ষিণে, পরে পূর্ব্বদিকে যাওয়া হইল। এখানে একটি দেবালয় আছে, তাহার পাশেব সেচ-নালীর ধার দিয়া রাস্তা গিয়াছে। এই পথে, ক্ষেতগুলির পাশে পাহাড়ের ধারে ধারে অতি ধীরে চড়াই পথে চলিয়া বেলা বারটাব সময় স-চা গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামের নিকট এক পাহাড়ের মূলে "নেশা" নামক একটি ছোট মঠ আছে। এত দিন পরে অশ্বতরওয়ালারা নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করিল। উত্তর দিবার প্রবৃত্তি দমন করিলেও এরূপ রূঢ় ব্যবহারেব ফলে মনের মধ্যে বিবক্তি থাকিয়া গেল। কি ভাবে চলিলে তাহারা আমার উপর প্রসন্ন থাকে বা আমা হইতে অসম্ভব কিছু আশা না করে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এরূপ ব্যবহার ইহাদের শুধু নহে, ভোটীয় জাতিরই স্বভাবগত।

সন্ধ্যার সময় উহারা বলিল, কাল প্রাতে রওয়ানা হইয়া গ্যাঞ্চীতে চা-পান করিয়াই সেখান হইতে যাত্রা করিব। সেখানে ভুষি-চারার দাম বেশী, সুতরাং আরও আগে চলিয়া কোথাও থাকিব। সেই কথামত ৯ই জুলাই সূর্য্যোদয়ের পরেই চলিতে সুরু করিলাম। এদিকের সেচ-নালীর জল বেশী. ক্ষেতগুলির হরিৎশোভা নয়নমনোহর, নদীর ধারের বাবলা-বনের শোভাও সুন্দর। গ্রামের অবস্থা ভাল, বাড়ীগুলি দুই তলা ও দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। দেওয়ালে সাদা মাটির প্রলেপ, কালো কাঠের টুকরায় তৈরি ছাউনির কৃষ্ণরেখা, ছাদের উন্নত ধ্বজা এবং কবাট-জানালার সরল রেখা দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। সেচ-নালীর অন্তঃস্থিত প্রপাতস্থলে সত্তু পিষিবার "পঞ্চক্কি" (জলধারায় চালিত পেষণ-যন্ত্র) প্রায়

চারিদিকেই দেখা যাইতেছিল। সেচ-নালী মধ্য ভোটদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু এদিকের গুলি অধিক সুরক্ষিত ও নিপুণভাবে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। গ্রামের মধ্যেও ঐরূপ পঙ্‌ক্তি এবং বহু অর্ব্বুদকোটি মন্ত্রে পূর্ণ একটি বৃহৎ "মানী" জলশক্তিতে চালিত আছে দেখিলাম। মানীর উপরিভাগে বাহিরের দিকে একটি দণ্ড যুক্ত ছিল, মানী ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতি সম্পূর্ণ পরিক্রমায় একবার ঐ দণ্ড দিয়া উপরে লম্বমান ঘণ্টার জিহ্বায় আঘাত করিতেছিল এবং এইরূপে প্রতি চক্রের শেষে একবার ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে বহু অর্ব্বুদ মন্ত্র-জপের পুণ্য অর্জ্জিত হইতেছিল। এই মন্ত্রও সাধারণ নহে, ভারতের শ্রেষ্ঠতম মন্ত্রের এক কোটি ইহার একটির সমান, সুতরাং এক সেকেণ্ডে এই গ্রামে যে-পরিমাণ পুণ্য উৎপন্ন হইতেছিল, তাহা সামান্য গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি ভাবিতেছিলাম যে, যদি এই সমস্ত পুণ্যরাশি ঐ মানীস্থাপনকারী নিজের জন্য রাখে, তবে এক মুহূর্ত্তের পুণ্য ভোগ করিতেই তাহাকে বহু কল্পকাল ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইবে, এক মাসের পুণ্যের তো কথাই নাই! গণিতের এই দুরূহ সমস্যায় শ্রান্ত আমার মন এই ভাবিয়া শান্তি পাইল যে, এদেশে মহাযান প্রচলিত, সুতরাং ঐ পুণ্যের পুঁজি প্রাণীমাত্রেই পাইবে। কে বলিতে পারে, হয়ত এই ঘোর পাপসঙ্কটে-লিপ্ত ভূমণ্ডলে মনুষ্যসমাজ যে এতদিনে ভূগর্ভে বা সমুদ্রতলে বিলীন হয় নাই তাহার কারণ তিব্বতের এই হাজার হাজার "মানী"! অহো! যদি যন্ত্রবাদী দুনিয়ার সকলে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিত এবং আল্লা, খ্রীষ্ট, রাম, কৃষ্ণ এই সকল নাম প্রতি যন্ত্রচক্রে লক্ষ লক্ষ বার লিখিয়া রাখিত, যদি প্রতি ঘড়ির চাকায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্লোক অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে!···

দশটার সময় আমরা গ্যাঞ্চী পৌঁছিলাম। কাঠমাণ্ডুবের ধর্ম্মমান সাহুর অপার ধর্ম্মশ্রদ্ধার কথা তো সিংহলেই এক লদাখী মিত্রের নিকট শুনিয়াছিলাম। শীগর্চীতে শুনিয়াছিলাম যে, এখন কিছুদিনের মত তাহার এখানকার দোকান বন্ধ আছে। গ্যাঞ্চীতে তাঁহার দোকানের নাম গ্যো-লিং-ছোক-পা। তিব্বতে মহল্লা বা নম্বরের স্থলে প্রতি গৃহের এইরূপ পৃথক নাম থাকে। এখনও লাসায় পৌঁছিতে আট-দশ দিন বাকী, এইজন্য আমি ঘোড়াওয়ালাকে বলিলাম, আমি দ্বিপ্রহরে গ্যো-লিং-ছোক-পা-তে থাকিয়া কিছু আহার্য্য ও পাথেয়ের ব্যবস্থা করিব, তাহার পর তাহাদের সঙ্গে চলিব। আমি সেখানে গেলে পর কিছুক্ষণ বাদে ঘোড়াওয়ালারা জানাইল তাহারাও সেদিন গ্যাঞ্চীতেই থাকিবে, পরদিন যাত্রা করিবে।

গ্যাঞ্চী—লাসা ও ভারতের প্রধান পথের উপরে পড়ে, এই পথ কালিম্পং হইয়া শিলিগুড়ি চলিয়া গিয়াছে। এখানে ভারত-সরকারের বাণিজ্যদূত, নেপাল

সরকারের "উকিল" (রাজদূত) ও তাঁহার সঙ্গে সহায়ক-বাণিজ্যদূত, ডাক্তার এবং দু-একজন ইংরেজ অফিসার থাকেন। প্রায় একশত হিন্দুস্থানী সিপাহী-পল্টনও এখানে থাকে। গ্যাঞ্চার বিষয় পরে লিখিব, সুতরাং এখন এইটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট।

রাত্রে বর্ষা নামিল, এবং পরদিন (১০ই জুলাই) বেলা দশটা পর্য্যন্ত বৃষ্টি চলিল। গ্যাঞ্চীতেও সকালে আটটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত হাট বসে। আমি পথের জন্য কাঁচা মূলা, চিঁড়া, চিনি চাউল, চা, মিঠাই, সিদ্ধ মাংস ও মিষ্ট পরটা কিনিয়া লইলাম। পশ্চিম দিকের পর্ব্বতমালার একটি বাহু গ্যাঞ্চী প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার অন্তিম শিখরে গ্যাঞ্চীর জোঙ্ এবং তিন দিকে গাঞ্চীর বসতি। প্রধান বাজার ঐ পর্ব্বতবাহুর দক্ষিণ দিকে নীচে হইতে ঘুরিয়া পর্ব্বতের উপরিস্থিত গুম্বার ফটক পর্য্যন্ত লম্বা চলিয়া গিয়াছে। গ্যো-লিং-ছোক-পা যে-পথে স্থিত তাহার উপর দীর্ঘ মানীর দেওয়াল আছে। দ্বিপ্রহরে আমরা পর্ব্বতের ছোট টিলা পার হইয়া অন্য পারের বসতিতে আসিলাম। বস্তী হইতে বাহির হইবার পথে কোথাও কোথাও জল বহিয়া যাইতেছিল। পাশের ক্ষেতের বৃষ্টি-স্নাত গম ও জবের চারার হরিৎ আভা আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

পথে চীনা-সিপাহীদের থাকিবার স্থানের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। রাস্তার পূর্ব্ব দিকে ব্রিটিশ* দূতাবাসের পাটলবর্ণের বৃহৎ অট্টালিকা। এখানে প্রান্তর অতি বিস্তৃত, সুদূরপ্রসারী হরিৎবর্ণ ক্ষেত দেখা যাইতেছিল। আরও অগ্রসর হইলে পর টেলিগ্রাফের তারের কাঠের থামের সারি নজরে পড়িল। গ্যাঞ্চী পর্য্যন্ত ব্রিটিশ* তার ও ডাকঘর, ইহার পরে লাসা পর্য্যন্ত তিব্বত-সরকারের টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা আছে। ভোট-সরকারের ডাকঘর ফরী-জোঙ্ পর্য্যন্ত আছে। গ্যাঞ্চী হইতে এক মাইল পথ যাইতে যাইতে ভোটীয় ডাকবাহী দু-জন পিয়নের সঙ্গে দেখা হইল, তাহাদের হাতে ঘুঙুর-বাঁধা ছোট-মালা এবং পিঠে পীতবর্ণ পশমী ডাকের থলি। ঐ দু-জনের মধ্যে একজন দশ-বার বৎসরের বালকমাত্র। যেখানে গ্যাঞ্চী পর্য্যন্ত ইংরেজী ডাক লইতে দুইটি ঘোড়া লাগে, সেখানে তিব্বতী ডাক ঐ রকম দুইটি লোকে দুইটি ছোট পুঁটলিতে লইয়া চলিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় এদেশের লোকের ভোটীয় ডাকের উপর কতটা আস্থা। এদিকের ইংরেজী ডাকে ইন্সিওর (বীমা) করা যায় না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নেপালী সওদাগরেরা ঐ ডাক মারফৎ বহু মূল্যবান পদার্থ আদান-প্রদান করে এবং ভোটীয় ডাকে বীমা করা সম্ভব হইলেও তাহারা তাহার মারফৎ পারৎপক্ষে কিছুই পাঠায় না।

ঘণ্টাখানেক চলিবারপর আবারবৃষ্টিআরম্ভহইল, এবং সেই সময় দেখা গেল যে, আমাদের একটা কুকুর গ্যাঞ্চীতে ছাড়িয়া আসা হইয়াছে। কুকুরের মালিক গ্যাঞ্চা ফিরিয়া

* তখন ব্রিটিশ রাজত্ব ছিল।

গেল, আমরা অগ্রসর হইতে থাকিলাম। পথের দুই পার্শ্বে বিরি ও সফেদা বৃক্ষে ঘেরা গ্রাম এবং শস্যে ভরা ক্ষেত। পথে পর্ব্বতমালার একটি বাহু অতিক্রম করিতে হইল, তাহাতে চড়াই বেশী নহে, কিন্তু তাহার উপরের ফৌজী পরিখা সামরিক হিসাবে তাহার গুরুত্বের প্রমাণ দিতেছিল। পার হইলে পরে কাঁচা মাটির ছোট কেল্লার ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেল। কিছু দূর উত্তর-পূর্ব্ব মুখে চলিবার পর দি-কী-ঠো-মো পোঁছান গেল। সেখানে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ী। মালবহনের সঙ্গে চিঠিপত্র লইয়া যাওয়াও আমাদের সঙ্গীদের এক কাজ ছিল; ডাকের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে বন্‌জারা ব্যাপারীরা যেরূপ করিত। সেই গৃহস্থের বাড়ীর কাছে যাইতেই একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর আমাদের স্বাগত-সম্ভাষণ করিতে আসিল, কিন্তু ভোটীয়েরা এরূপ কুকুরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে কিনা সন্দেহ। বৃষ্টি পড়িতেছিল, অশ্বতরের পিঠ হইতে মাল নামাইতে আমিও সাহায্য করিতে লাগিলাম। শীঘ্র সে-কাজ শেষ করিয়া ছোলদারী তাঁবুর সারি খাটানো গেল। তাহার খোঁটায় অশ্বতর বাঁধিয়া তাহাদের সম্মুখে ভুষি ঢালিয়া সর্দ্দার ও আমি সেই ধনীর গৃহে চলিলাম। গৃহস্থের দরজার বাহিরে মোটা খোঁটায় মজবুত শিকলে বাঁধা অতি ভয়ানক এক কুকুর আমাদের দেখিয়াই গর্জ্জন ও লম্ফঝম্প করিতে লাগিল। দ্বারের ভিতর উপরে যাইবার সিঁড়ির পাশেও ঐরূপ আর একটি কুকুর বাঁধা ছিল। এই দুইটিই বিরাট কলেবর, নেকড়ে বাঘ ইহাদের কাছে কিছুই নয়। আমার ধারণা ছিল এইরূপ কুকুর অতি মূল্যবান, কিন্তু শুনিলাম দশ-পনের টাকায় এই জাতীয় কুকুরের বাচ্চার জোড়া কিনিতে পাওয়া যায়। ঘরের একটি ছেলে কুকুরের মুখ চাপিয়া ধরিলে আমরা উপরে গিয়া রন্ধনশালার গদীতে বসিলাম। সত্তু ও চা আসিল। আমি কিছু ঘোলও পান করিলাম। গৃহস্বামী লদাখের খববাখবর করিলেন। ঐ সময়ে গৃহস্বামার মঙ্গলার্থে পূজাপাঠ করিতে কতকগুলি ভিক্ষুও আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও "লদাখী ভিক্ষু"র কুশল প্রশ্ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের আড্ডায় ফিরিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গী কুকুর লইয়া ফিরিল। এই গৃহের কিছু উত্তরে একটি নদী, ওপারে চাষের উপযুক্ত অনেক জমি পড়িয়া আছে। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, কিছু তফাতে একটি স্তূপ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ গৃহস্বামী মালা ও মানী হাতে তাহার পরিক্রমায় চলিলেন, সঙ্গীরাও গৃহান্তরে গেল, আমি একেলা ঘরে রহিলাম। সে সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টপ্‌ টপ্‌ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। একেলা বসিয়া আমি ভাবিতেছিলাম, গ্যাঙ্চীও তো পার হইয়াছি, লাসা আর কয়দিনের পথ মাত্র; এই তো সেই পথ যাহার সম্বন্ধে নেপাল পর্য্যন্ত সব লোক ভয় দেখাইয়াছিল,

এখনও পর্য্যন্ত তো সেরূপ কিছু দেখি নাই, অল্প কয়দিন পরে রহস্যময় লাসায়ও এইরূপে পৌঁছিয়া যাইব এবং তখন বলিব যে মিথ্যাই লোকে এ পথের সম্বন্ধে এত ভয় দেখায়। ভয়ের সময় উত্তীর্ণ হইলে লোকে এইরূপই ভাবে, আমি যখন এইরূপে কল্পনারাজ্যে বিহার করিতেছি সেই সময় সেই ছাড়া-কুকুরটি আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া গর্জ্জন সুরু করিয়া দিল। বলা বাহুল্য তাহাকে দেখিয়াই আমার চিন্তাধারার সূত্র ছিন্ন হইল, আমি তাড়াতাড়ি লাঠি-হাতে বসিয়া পড়িলাম। দূর হইতে কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া সে চলিয়া গেল। খানিক রাত্রি হইলে, সঙ্গীর দল বিলক্ষণ ছঙ পান করিয়া ফিরিলে পরে, সকলে মিলিয়া তাঁবুর ভিতর নিদ্রার ব্যবস্থা করিলাম।

এগারো

তিব্বতের মত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত দেশ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা ভারতের উত্তর সীমায় স্থিত, কিন্তু এ-দেশের জনসাধারণ কেন, শিক্ষিত লোকেও তিব্বতের বিষয় খুবই অল্প জানেন। আমার এক বন্ধুকে তিব্বত হইতে চিঠি লিখিয়াছিলাম, পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিবার জন্য ডাকে আমায় কিছু কাগজ পাঠাইতে। তিনি পত্রোত্তরে লিখিলেন, ডাক অপেক্ষা রেলে পাঠাইলে মাশুল কম লাগিবে, সুতরাং রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম পাঠাইলে ভাল হয়। এই উত্তরে এ-দেশ সম্বন্ধে আমাদের ইংরেজী শিক্ষাজাত জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ তিব্বত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা কিছুই জানি না, লোকের ধারণা নাই যে, হিমাচলের পাদমূলস্থ ব্রিটিশ ভারতীয় রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক মাসের পথ চলিয়া বিশ হাজার ফুট উচ্চ কয়েকটি গিরিসঙ্কট পার হইলে তবে লাসা পৌঁছান যায়। কালিম্পং হইতে পথের দুই-তৃতীয়াংশ পার হইলে পর গ্যাঞ্চী; উহাই ভারতের শেষ ডাকঘর। ঐ পর্য্যন্ত ভারতীয় ডাকমাশুলে চিঠিপত্র ও পার্শেল ইত্যাদি যায়। লাসা পর্য্যন্ত টেলিগ্রামও যায় ভারতীয় দরেই।

সভ্য জগতে তিব্বতের এইরূপ অপরিচিত থাকার প্রধান কারণ ইহার দুর্গমতা। দক্ষিণ ও পশ্চিমে হিমালয়ের গগনভেদী বিরাট পর্ব্বতমালা, উত্তরে (লাসা হইতে এক শত মাইলের কিছু বেশী দূরে) বিশাল মরুভূমি; এই সকলই অতি দুর্গম। ভারত হইতে তিব্বত যাইবার প্রধান পথগুলি কাশ্মীর ও দার্জিলিং অঞ্চল হইতে গিয়াছে; দার্জিলিং হইতে লাসার দূরত্ব ৩৬০ মাইল। এ-দেশের অধিকাংশ স্থলই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,০০০ ফুটের উপরে, এইজন্য বৎসরের আট মাস এ-দেশের মাটি তুষারাচ্ছন্ন থাকে। তিব্বতই জগতের সর্ব্বোচ্চ জনপদ।

তিব্বত বিশাল দেশ। ইহা চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ-দেশের লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু সামাজিক প্রথাদিতে এক প্রান্তের আচার-ব্যবহারের সহিত অন্য প্রান্তের মিল নাই। তথাপি এ-দেশে ধর্মের প্রাধান্য অতি দৃঢ়। দেশের শাসক দলাই লামা ভগবান বুদ্ধের অবতার রূপে পরিচিত এবং লোকের বিশ্বাস যে, দলাই লামা সিংহাসনে বসিলে তাঁহার মধ্যে বুদ্ধদেবের আত্মা আবির্ভূত হন। সারা দেশ বৌদ্ধ মঠে পরিপূর্ণ। লাসায় এরূপ তিনটি মঠ আছে, যাহার প্রত্যেকটিতে চার-পাঁচ হাজার ভিক্ষু বাস করে। ইহা ছাড়া আরও অনেক মঠ আছে যাহাতে শত শত ভিক্ষু থাকে।

প্রাকৃতিক অবস্থানের ফলে তিব্বত অন্য দেশ হইতে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ পরিস্থিতির প্রভাবে এ-দেশীয়েরাও অন্য দেশের অধিবাসীর সহিত মেলা-মেশায় অনিচ্ছুক। তিব্বতীয় ভদ্রলোক সাধারণতঃ শান্ত শিষ্ট এবং আপনভাবে ভরপুর। বিদেশীয়ের সহিত সম্পর্ক রাখা ইঁহারা ভাল মনে করেন না। নিজেদের প্রাচীন ধর্মে ইঁহাদের অসীম শ্রদ্ধা, উপরন্তু প্রাচীন পন্থায় চাষবাস ও ক্রিয়াকর্ম্মাদি করিয়া সন্তোষের সহিত জীবনযাপন ইঁহারা সংসারের প্রধান লক্ষ্য মনে করেন। আধুনিক বিংশ শতকের সভ্যতা হইতে ইঁহারা যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চাহেন এবং সেই জন্যই এদেশে বিদেশীয়ের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা বিশেষ অতিথিবৎসল।

তিব্বতীয়েরা প্রচুর চা-পান করে। নৃত্যগীতেও ইহাদের বিশেষ উৎসাহ। নৃত্য প্রধানতঃ পুরুষেরাই করে, স্ত্রীলোকের মধ্যে নৃত্যের বড় চলন নাই। এ-দেশে স্ত্রীলোকের পর্দ্দা নাই, পুরুষের মত তাহারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া উপার্জ্জনের পথ দেখে।

তিব্বতে, বিশেষতঃ লাসা অঞ্চলে, প্রবেশ করা কি কঠিন ব্যাপার তাহা তিব্বত-যাত্রা সম্বন্ধীয় যে কোন গ্রন্থ পাঠেই বুঝা যায়। আমি ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে ভারতসীমান্ত হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া আষাঢ়ের শুক্লা ত্রয়োদশীতে লাসায় উপস্থিত হই। আমার এই যাত্রা আত্মতৃপ্তি অথবা ভৌগোলিক অনুসন্ধানের জন্য হয় নাই; এ-দেশের সাহিত্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন এবং উহা হইতে ভারতীয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মনৈতিক তথ্য আহরণের জন্য আমি এ-দেশে আসি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার আচার্য্য শান্ত-রক্ষিতের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলার আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময় পর্য্যন্ত ভারত ও তিব্বতের সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা ইতিহাস-প্রেমিক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারত তিব্বতকে ধর্ম্ম, অক্ষর ও সাহিত্যিক ভাষা দান করেন। ভারতীয়েরা এ-দেশে আসিয়া কিছু হিন্দী এবং বহু সহস্র সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ

করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের পরিমাণের ধারণা করিতে হইলে এখানে কংগুর ও অনুবাদ তংগুর নামে যে দুইখানি বিশাল সংস্কৃতগ্রন্থানুবাদ-সংগ্রহ প্রচলিত তাহা দেখিতে হয়। এই দুইখানি সংগ্রহে বিশ লক্ষের অধিক অনুষ্টুপ শ্লোক আছে। তিব্বতীয়েরা যে বচনগুলিকে ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বলিয়া মনে করে, কংগুর তাহারই সংগ্রহ ; ইহা মুখ্যতঃ সূত্র, বিনয় ও তন্ত্র এই তিনভাগে বিভক্ত। কংগুর এক শত বেষ্টনীতে বাঁধা, সেইজন্য ইহা শত-পুস্তক নামে কথিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সাত শত পুস্তকের সংগ্রহ আছে। কংগুর-সংগ্রহের কতক পুস্তক সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ হইতে গৃহীত। কংগুরস্থ অনেক গ্রন্থের টীকা, উপরন্তু দর্শন, সেব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যশাস্ত্র, মন্ত্রতন্ত্রের পুস্তক প্রভৃতি কয়েক শত গ্রন্থের ভাষান্তর তংগুরে আছে। এই সকল সংগ্রহ দুই শত পুঁথিতে নিবদ্ধ। ভারতীয় দর্শন নভোমণ্ডলের প্রখর জ্যোতিষ্ক আর্য্যদেব, দিঙনাগ, ধর্ম্মরক্ষিত, চন্দ্রকীর্ত্তি, শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতির মূল গ্রন্থ এই দুইখানি সংগ্রহে রক্ষিত আছে, যদিও ভারতে উঁহাদের কীর্ত্তির চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই ; কেবল তিব্বতী অনুবাদে তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। আচার্য্য চন্দ্রগোমীর চান্দ্র-ব্যাকরণ—সূত্র, ধাতু, উনাদি পাঠ, বৃত্তি, টীকা, পঞ্জিকাদির সহিত এখনও বিদ্যমান। "ইন্দ্রশ্চন্দ্র কাশকৃৎস্নঃ" শ্লোক অনুসারে অষ্ট মহাবৈয়াকরণ মধ্যে চন্দ্রগোমী একজন মহাবৈয়াকরণ ছিলেন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু তংগুর-সংগ্রহে তাঁহার লোকানন্দ নাটক, বাদন্যায় টীকা প্রভৃতি হইতে আমরা তাঁহার কাব্যে ও দর্শনশাস্ত্রে অধিকার ও ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়াছি। অশ্বঘোষ, মতিচিত্র (মাতৃচেতা) হরিভদ্র, আর্যশূর প্রভৃতি মহাকবির কত-না বিনষ্ট কীর্ত্তি তংগুর-সংগ্রহে কালিদাস, দণ্ডী, হর্ষবর্দ্ধন, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির সংস্কৃত ভাষায় সুলভ গ্রন্থাদির সঙ্গে একত্রে রক্ষিত আছে। এই অমূল্য সংগ্রহেই অষ্টাঙ্গহৃদয়, শালিহোত্র আদি বৈদ্যিক-গ্রন্থ টীকা-উপটীকার সহিত রহিয়াছে, ইহাতেই মহারাজ কনিষ্ককে লিখিত মতিচিত্রের পত্র, মহারাজ চন্দ্রকে লিখিত যোগীশ্বর জগদ্রত্নের পত্র, পালবংশীয় রাজা জয়পালের প্রতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পত্র ও অন্যান্য বহু অমূল্য পত্রাবলী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু বৌদ্ধ যোগী, অবধূত, বৈরাগীর বচন ও দোঁহা প্রভৃতির হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদ-সংগ্রহও ইহাতে সঞ্চিত আছে।

ঐ দুটি বিরাট সংগ্রহ ছাড়া ভোট ভাষায় নাগার্জ্জুন আর্য্যদেব, অসঙ্গ বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত, চন্দ্রকীর্তি, ধর্ম্মকীর্তি, চন্দ্রগোমী, কমলশীল, শীল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতদিগের জীবনচরিত এবং তারানাথ, বুতোন পদ্মকর পো বেডুরিয়া সেরপো, কুন্‌গ্যল প্রভৃতি লেখকের বহু "ছোজুঙ" (ধর্ম-ইতিহাস) আছে, যাহা হইতে ভারতীয় ইতিহাসের বহু গ্রন্থের আভাস ও প্রকাশ পাওয়া যায়। এইগুলি ছাড়াও অনেক

গ্রন্থ আছে যাহা হইতে তৎকালীন ভারতের সাক্ষাৎ পরিচয় না পাইলেও পরোক্ষভাবে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রন্থরাজির অধিকাংশই কৈলাস-মানসসরোবরের নিকটস্থ থোলিং গুম্বা ও মধ্য তিব্বতের সক্যা, সময়ে গুম্বা প্রভৃতি বিহারে অনূদিত হইয়াছিল। বিদেশীয়েরা ধ্বংস না করিলে আজও সে-সকল স্থানে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যাইত। এখনও খুঁজিলে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কিছু কিছু পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়।

* * * * *

সম্রাট অশোকের পুত্র যেমন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, ভোটদেশে আচার্য্য শান্তরক্ষিত কর্ত্তৃক তেমনি ধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। সত্য বটে শান্তরক্ষিতের আগমনের পূর্ব্বেই ভোট সম্রাট স্রোঙচন-সৃগেম-পো'র সময় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সম্রাটই (খ্রীঃ ৬১৮-৫০) নেপাল জয় করিয়া অংশুবর্ম্মার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন এবং চীন সীমান্তের বহু প্রদেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া চীন সম্রাটের রাজকন্যারও পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই রাণীই বৌদ্ধ ছিলেন এবং ইহাদের সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভোট দেশে প্রবেশ করে। লাসার প্রাচীনতম বৌদ্ধ মন্দিরদ্বয় রশেছে ও চীরে স্পোছে সম্রাট স্রোঙচনই নির্ম্মাণ করেন। তাহা হইলেও ঐ সময়ে তিব্বতে ভিক্ষু বিহারও ছিল না বা কেহ ভিক্ষু হয় নাই, এবং বৌদ্ধধর্ম্মেরও কোন দৃঢ় স্থিতি ছিল না, সে কীর্ত্তি আচার্য্য শান্তরক্ষিতের; তাঁহার প্রতিভায় ঐদেশে স্থায়িভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ লাগে। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত (তিব্বতী গ্রন্থের সূত্রে) পাঠকদিগকে দিলাম।

মগধের পূর্ব্বসীমাস্থিত অঙ্গপ্রদেশ পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ, মধ্যযুগে ইহার পূর্ব্বাঞ্চল সহোর নামে বিদিত ছিল। ভোটীয়েরা এই সহোরকে জহোর নামকরণ করিয়াছে। ইহার অন্যনাম ভঙ্গল বা ভগলরূপে পাওয়া যায়, সে নামের ছায়া ঐ প্রদেশের প্রধান নগরী ভগলপুরে আজিও পাওয়া যায়। এই প্রদেশে গঙ্গার তটে এক ছোট পাহাড়ের নীচে পালবংশীয় নৃপতি দেবপাল (খ্রীঃ ৮০০-৮৩৭) এক বিহার নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম নিকটস্থ রাজপুরী বিক্রমপুরী হইতে বিক্রমশীলা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ইহা উক্ত বিক্রমপুরীর নিকটে উত্তর দিকে ছিল। ভোটীয়-সাহিত্যে বিক্রমপুরীর অন্য নাম ভাগলপুর বলিয়া পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, উহা এক মাণ্ডলিক রাজবংশের রাজধানী ছিল এবং তাহাতে লক্ষ পরিবারের বসতি ছিল। যাহা হউক, যে রাজবংশ ভোটদেশের অন্যতম মহান্ ধর্ম্মপ্রচারক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অর্থাৎ অতীশের (জন্ম খ্রীষ্টাব্দ ৯৮২, মৃত্যু ১০৫৪) আবির্ভাবে গৌরবান্বিত, সেই রাজবংশেই সপ্তম শতকের মধ্যভাগে (অন্ত খ্রীষ্টাব্দ ৬৫০) আচার্য্য শান্তরক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন।

নালন্দার ভূমি তথাগতের চরণধূলাস্পর্শে বহুবার পবিত্র হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ এক বর্ষাঋতু এখানেই যাপন করিয়াছিলেন। ইহারই অতিসন্নিকটে নালক গ্রাম। নালক ভগবান বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ধর্ম্মসেনাপতি আর্য্য সারিপুত্তকে জন্মদান করে। এখানে বুদ্ধের জীবিতকালেই প্রাবারক শেঠ নিজের আম্রবন দান করিয়াছিলেন। এই স্থানের পবিত্রতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখানে পূর্ব্বকাল হইতেই বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতিতে (অর্থাৎ কনফারেন্সে) সর্ব্বাস্তিবাদ আদি নিকায় (সম্প্রদায়) স্থবিরবাদ হইতে বহিষ্কৃত হয়, ফলে সর্ব্বাস্তিবাদী ও অনুরূপ অন্য সাম্প্রদায়িকেরা নালন্দায় সভা স্থাপন করেন, সে কারণে নালন্দা সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের কেন্দ্রস্থল হয়। বৌদ্ধ মৌর্য্যকুলের ধ্বংস-সাধন করিয়া বৌদ্ধদ্বেষী ব্রাহ্মণমতাবলম্বী শুঙ্গবংশ ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধ সিংহাসন অধিকার করিলে, দেশের বিপরীত পরিস্থিতির ফলে সকল বৌদ্ধনিকায় মগধ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কেন্দ্রসমূহ দেশদেশান্তরে স্থাপিত করেন। সর্ব্বাস্তিবাদীরা মথুরার সন্নিকটে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে কেন্দ্রস্থাপন করেন এবং এই সময় তাঁহারা নিজের পিটক সংস্কৃতে রূপান্তরিত করায় তৎকালীন সর্ব্বাস্তিবাদ ইতিহাসে "আর্য্য সর্ব্বাস্তিবাদ" নামে পরিচিত হয়। পরে মহাকুষাণ রাজকুল ইহাতে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় ইঁহাদের কেন্দ্র মথুরা হইতে কাশ্মীর-গন্ধারে স্থানান্তরিত হয়। কাশ্মীর-গন্ধারের সর্ব্বাস্তিবাদই মূল সর্ব্বাস্তিবাদ নামে খ্যাত। সম্রাট কনিষ্ক এই সম্প্রদায়ের পক্ষে দ্বিতীয় অশোক ছিলেন। তিনিই তক্ষশীলায় ধর্ম্মরাজিকা স্তূপে "আচরিয়ণাং সর্ব্বতথবদিনং পরিগাহে" শব্দ অঙ্কিত করিয়া উহা মূল সর্ব্বাস্তিবাদের নামে উৎসর্গ করেন। কনিষ্কের সংরক্ষণকালে চতুর্থ মহতী বৌদ্ধধর্ম্মপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে মূল সর্ব্বাস্তিবাদ অনুসারে ত্রিপিটকের বিস্তৃত টীকা প্রস্তুত হয়। এই টীকার নাম "বিভাষা" হওয়ায় মূল সর্ব্বাস্তিবাদের নামান্তর "বৈভাষিক"।

এই মূল সর্ব্বাস্তিবাদ হইতেই মহাযানের উৎপত্তি। তাহাতে বৈপুল্য (পালি —বৈতুল্ল) অবতংসক আদি সূত্র নিজ সূত্রপিটক রূপে আসে। কেবলমাত্র বিনয়পিটক রূপে সর্ব্বাস্তিবাদের বিনয়ই থাকে। মহাযান হইতে বজ্রযান এবং ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভরাডুবি-যুগের সহজযান (১২শ শতক খ্রীঃ) নামক ঘোর বজ্রযান উদয় হইলে পরেও নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদন্তপুরা আদি মহাবিহারে মূল সর্ব্বাস্তিবাদের বিনয়পিটক স্বীকৃত হইত। ভোটীয় ভিক্ষুরা আজও ইহাকে মানেন এবং অতি গর্ব্বের সহিত বলেন যে তাঁহারা মূল সর্ব্বাস্তিবাদের বিনয়, বোধিসত্ত্ব (মহাযান) ও বজ্রযান এই তিনেরই শীল ধারণ করেন। এই উক্তির অর্থ অন্য লোকের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কঠিন, কেন-না যদিও যে-কোন লোক এক সহস্র প্রকার শীল ধারণ অনায়াসেই করিতে পারে, তথাপি পরস্পরবিরোধী আলোক ও অন্ধকার কি প্রকারে এক স্থানে বিরাজ

করিতে পারে তাহা ঐরূপ শীলধারিগণ প্রকাশ করিয়া বলেন না। বলা বাহুল্য, বিনয় ও বজ্রযান নিরতিশয় পরস্পরবিরোধী।

শান্তরক্ষিতের সময় নালন্দার মহিমা দিগন্তবিস্তৃত ছিল। উহার অল্পদিন পূর্ব্বেই য়ুয়ন্-চ্বাং ঐ স্থানে বিদ্যার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তখন ওখানে বজ্রযান বা তন্ত্রযানের প্রভাব। শান্তরক্ষিত ঐখানেই গৃহত্যাগ করিয়া আচার্য্য জ্ঞানগর্ভের নিকট মূল সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয় মতে প্রব্রজ্যা ও উপসংপদা (অনুমান ৬৭৫ খ্রীঃ) ও শান্তরক্ষিত নাম গ্রহণ করেন। নালন্দাতেই তাঁহার গুরুর নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ ত্রিপিটক অধ্যয়নের পর তিনি বোধিসত্ত্ব মার্গীয় (মহাযানিক) অভিসময়ালঙ্কার আদি পাঠ করিবার নিমিত্ত আচার্য্য বিনয় সেনের নিকট উপস্থিত হন। আচার্য্যের নিকট তিনি মহাযানমার্গের বিস্তৃত ও গম্ভীর উভয় ক্রমের সহিত আর্য্য নাগার্জ্জুনের* মাধ্যমিক সিদ্ধান্তও পাঠ করেন। উহারই উপর পরে তিনি সটীক "মধ্যমকালঙ্কার" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

চীনা ভিক্ষু ঈ-চিও নালন্দায় শান্তরক্ষিতের সমসাময়িক ছিলেন। খ্রীঃ ৬৭১-৯৫ এর মধ্যে প্রণীত তাঁহার পুস্তকে কিন্তু অন্য অনেক পণ্ডিতের নাম থাকা সত্ত্বেও শান্তরক্ষিতের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয় তখনও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই। পাঠ সমাপনান্তে শান্তরক্ষিত নালন্দাতেই অধ্যাপন-কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে হরিভদ্র ও কমলশীল পরে যশস্বী লেখক হন। মূল ভাষায় লুপ্ত হইলেও ভোটীয় অনুবাদরূপে তংগ্যুরে তাঁহাদের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। আচার্য্য শান্তরক্ষিতের অনেক দার্শনিক গ্রন্থও ঐ সংগ্রহে ভাষান্তর রূপে পাই; সংস্কৃতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কেবল অন্য পুস্তকে তত্ত্বসংগ্রহ বা উল্লেখরূপে তাহা বিদ্বৎসমাজের গোচরীভূত। আচার্য্য তন্ত্রেরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, যদিও মূল সংস্কৃতে এখন মাত্র দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়—"তত্ত্বসংগ্রহ-কারিকা" ও "জ্ঞানসিদ্ধি"।

ঐ সকল কার্য্য আচার্য্য শান্তরক্ষিতের ভারতবাসকালের কীর্ত্তি। ভোটদেশে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী অতি আশ্চর্য্য। ৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভোট সম্রাট্ স্রোঙ্-চন্-স্গেমের পঞ্চম উত্তরাধিকারী খ্রী-স্রোং-ল্দে-বচন্ সিংহাসন আরোহণ করেন, তিনি তখন বালকমাত্র। এই সম্রাটই তিব্বতের ধর্ম্মাশোক। সে-সময় চীন ও ভোটদেশে ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল এবং লাসায় ঐ কারণে অনেক চীনা বৌদ্ধ-ভিক্ষুর

* নাগার্জ্জুন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ কোশল (ছত্তিশগড়ে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অতি মহান্ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি অনেক নূতন বিচার ও তথ্যের প্রচলন করেন। তিনিই মহাযানের প্রবর্ত্তক।

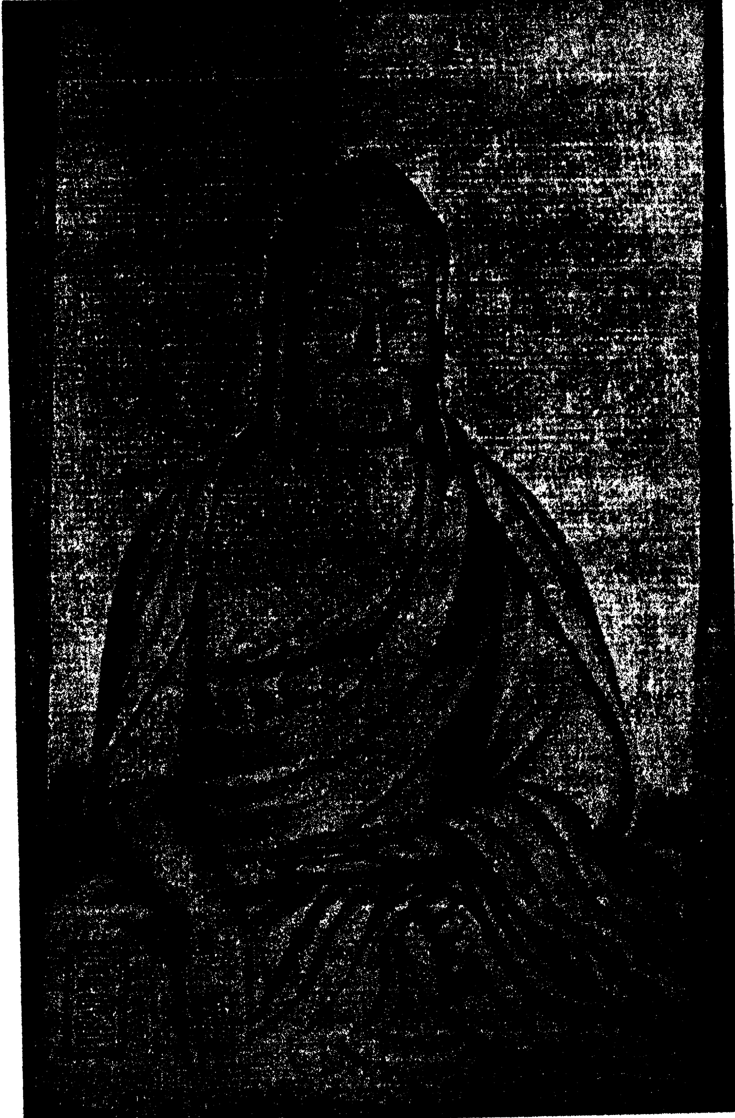
সমাগম হইত। সম্রাটের ধর্ম্মলিপ্সা তাহাতে তৃপ্ত না হওয়ায় তিনি ধর্ম্মে ও ধর্মগ্রন্থে জ্ঞানবান কোন আচার্য্যকে আনিবার নিমিত্ত ভারতে লোক পাঠান। ভোট রাজদূত প্রথমে বজ্রাসন অর্থাৎ বুদ্ধগয়া গিয়া সম্রাটের দরুণ পূজা নিবেদন করেন, পরে নালন্দায় যান। আচার্য্য শান্তরক্ষিত নেপালে আছেন, সেখানে এই সন্ধান পাইয়া নেপালে গিয়া তিনি আচার্য্যের সম্মুখে সম্রাটের ভেট রাখিয়া রাজার প্রার্থনা নিবেদন করেন। আচার্য্য স্বীকৃত হওয়ায় বহু সম্মানের সহিত লাসায় আনীত হন। সেখানে তাঁহার উপদেশ যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়, বিশেষতঃ তরুণ রাজা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। কিন্তু সভাসদবর্গ ও অন্য অনেকে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, ঐ সময়ে দেশে পীড়া ও অন্য যে সকল উপদ্রবের প্রকোপ চলিতেছিল, শান্তরক্ষিতের শিক্ষার ফলে স্থানীয় দেবদেবীদের রোষই তাহার কারণ বলিয়া প্রচার করেন। ইহাতে শান্তরক্ষিত নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (খ্রীঃ ৭২৪)।

তিনি চলিয়া আসিলে চীন দেশের সঙশী প্রদেশের বহু বিদ্বান বৌদ্ধ লাসায় আগমন করেন। দরবারে তাঁহাদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, রাজাও যথেষ্টরূপে প্রভাবিত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে রাজার পুনর্ব্বার বর্ষীয়ান ভারতীয় আচার্য্যকে আনিবার ইচ্ছা হয় এবং এইরূপে রাজ-নিমন্ত্রণে আচার্য্য শান্তরক্ষিত দ্বিতীয়বার লাসায় গমন করেন (খ্রীঃ ৭২৬)। ভোট ইতিহাসে লিখিত আছে যে, এইবার স্থানীয় দেবদেবীর রোষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি উড়িষ্যারাজবংশোদ্ভব আচার্য্য পদ্মসম্ভবকে আনয়ন করিতে সম্রাটকে অনুরোধ করেন। কথিত আছে আচার্য্য পদ্মসম্ভব আসিয়া মন্ত্রবলে ভোটদেশের দেবদেবী ডাকিনী-যোগিনী যক্ষিণী-সর্পিণী ভূতপ্রেত যক্ষবেতালআদিকে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে সহায়তা করার প্রতিজ্ঞায় উহাদের আবদ্ধ করিয়া ছাড়েন।

আচার্য্য তাহার পর সম্রাটের সাহায্যে লাসা হইতে দুই দিনের পথ দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র-তটে বসম্ যস্ (সম্-য়ে) বিহার নির্ম্মাণ (অগ্নি-স্ত্রী-শশবর্ষ = ৭৩৭ খ্রীঃ) আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে (ভূমি-স্ত্রী-শশবর্ষ = ৭৩৮ খ্রীঃ) তাহার নির্ম্মাণ শেষ করেন। সম্-য়ে বিহার উদন্তপুরী বিহারের নমুনায় তৈয়ারী এবং ইহা দ্বাদশপ্রাঙ্গণযুক্ত; ইহাই ভোটদেশের প্রাচীনতম বিহার। বিহার নির্ম্মিত হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচারের পর তিনি ভোট দেশে ভিক্ষু-আচার কিরূপে গ্রহণ করিতে হয় দেখাইবার জন্য দ্বাদশ জন মূল সর্ব্বাস্তিবাদীকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে জল-মেষবর্ষে (৭৪২ খ্রীঃ) য়ে শেস্ রঙ পো (জ্ঞানেন্দ্র) আদি সাতজন ভোটীয়কে ভিক্ষু করেন।

আচার্য্য শান্তরক্ষিত তাঁহার ভোটীয় শিষ্যবর্গের সহিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু দু-একটি ভিন্ন সেগুলির

কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কথিত আছে, আচার্য্য অন্তিম সময়ে শিষ্য শ্রী-স্রোঙকে ডাকিয়া বলেন যে, এদেশে অন্তর্বিবাদ আরম্ভ হইলে তাঁহার



শান্তরক্ষিত (খ্রীঃ ৭৪০—৮৪০)

ছাত্র কমলশীলকে যেন ভারতবর্ষ হইতে আনা হয়, তিনি বিবাদভঞ্জন করিয়া

দিবেন। আচার্য্য শান্তরক্ষিত তখন প্রায় শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, (আনুমানিক ৭৫০ খ্রীঃ), সে-সময় কোন দুর্ঘটনায় তাঁহার এই সুদীর্ঘ ও যশোময় যাত্রা সমূয়েতে শেষ হইয়া গেল। তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ আজও সমূয়ে'র এক চৈত্যে, অতীতে ভারতীয় পণ্ডিতদের বার্দ্ধক্য ও জরার প্রতি অবহেলা ও কর্ত্তব্যে দৃঢ়সঙ্কল্পের জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। তাঁহার দেহান্তের পর ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইলে রাজা আচার্য্যের উপদেশমত কমলশীলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে তিনি লাসায় আসিয়া শাস্ত্রার্থ প্রচার করিয়া বিবাদের শান্তি করেন।

আচার্য্য শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্থাপক বলিয়া ভোটবাসিগণ মানিলেও, সিংহলে যেরূপ মহেন্দ্রের স্মৃতিপূজার উৎসব হয়, আচার্য্যের উদ্দেশ্যে সেরূপ কিছু ভোটদেশে হয় না। কারণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না। ভোটদেশে ভগবান বুদ্ধের স্বাভাবিকতাপূর্ণ, মধুর, সরলহৃদয়স্পর্শী সূত্রের ততটা সম্মান নাই, যতটা ভূতপ্রেত-যাদুমন্ত্রের আছে। শান্তরক্ষিত যদিও তন্ত্রগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি গম্ভীর দার্শনিকই ছিলেন, সুতরাং তাহাতে ভোটবাসীদের ভূতশান্তিমন্ত্র-ক্ষুধার উপশম হয় নাই। পদ্মসম্ভব ও অন্য লোক পাইয়া বোধ হয় তাহা হইয়াছিল, এই কারণেই অতি বৃহৎ গুম্বা ছাড়া অন্য কোথাও পণ্ডিত বোধিসত্ত্বের (শান্তরক্ষিত) চিত্র বা মূর্ত্তি দেখা যায় না, যে-স্থলে পদ্মসম্ভবের চিত্র ঘরে ঘরে আছে।

বারো

বৌদ্ধধর্ম্মে চারিটি প্রধান দার্শনিক মত বা "বাদ" প্রচলিত আছে। যথা—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। বিভাষিকদিগের প্রধান গ্রন্থ কাত্যায়নী পুত্র লিখিত 'জ্ঞান-প্রস্থান"। এই শাস্ত্রের ছয় অঙ্গ। এতদ্ব্যতীত বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের উত্তরে লিখিত সঙ্ঘভদ্রের ন্যায়ানুসার গ্রন্থও ইঁহাদের শাস্ত্রের অন্তর্গত। সৌত্রান্তিকী-দিগের প্রধান গ্রন্থ আচার্য্য বসুবন্ধু রচিত "অভিধর্ম্মকোষ"। বৈভাষিক দর্শনের পরিচয় চীন ভাষায় এবং চৈনিক লিপিতে মাত্র পাওয়া যায়। বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষ কয়েকখানি টীকা ও ভাষ্যসহ ভোট ভাষায় বর্ত্তমান। যোগাচারিগণ বিজ্ঞানবাদী ও মাধ্যমিক শূন্যবাদী, যোগাচারের প্রধান আচার্য্য অসঙ্গ। তিনি বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অসঙ্গ পেশওয়ার নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শূন্যবাদের প্রধান আচার্য্য নাগার্জ্জুন। এই দুই মত মহাযানের অন্তর্ভূত। চীন জাপানের বৌদ্ধরা

বিজ্ঞানবাদী ও ভোটীয়েরা শূন্যবাদী ; শূন্যবাদ বজ্রযানের সহায়ক, সুতরাং ভোটদেশে তাহার প্রভাব স্বাভাবিক।

আচার্য্য শান্তরক্ষিত যদিও মাধ্যমিক সিদ্ধান্তের উপরে মধ্যমকালঙ্কারত্নপ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বিজ্ঞানবাদীই ছিলেন। ভোট ভাষায় লিখিত তাঁহার জীবনীসংলগ্ন তত্ত্ব সংগ্রহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। শান্তরক্ষিত তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ দার্শনিক মতের গম্ভীর বিচার-সংগ্রহ যে অপূর্ব্ব গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এই গ্রন্থে ৩৬৪৬ শ্লোক, ষড়্‌বিংশ অধ্যায় বা "পরীক্ষা" আছে।

* * * * *

ভোটদেশে ভারতীয় আচার্য্যদের মধ্যে শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক সম্মানিত। দীপঙ্করের তিব্বতীয় নাম "অতিশা", "জোবো" (স্বামী), বা "জোবো-জে" (স্বামী ভট্টারক)। ইঁহারা দুইজনেই সহোর প্রদেশের রাজবংশোদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ "অতীশা"কে বাঙালী প্রমাণ করেন। "বৌদ্ধ গান দোহা" নামক পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপে জালন্ধরী কাহ্ন সরজ আদি কবিদেরও বাঙালী দাঁড় করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমশিলার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে এ অঞ্চল "ভাগন" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল, উহার রাজধানী ছিল বর্ত্তমান কহল গ্রামের নিকটস্থ কোন স্থানে। দশম শতাব্দীতে রাজা কল্যাণশ্রী ইহার শাসক ছিলেন।* ঐ সময়ে বঙ্গের পালবংশের বিজয়ধ্বজা বঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশেই উড়িতেছিল, রাজা কল্যাণশ্রী তাঁহাদের অধীন ছিলেন। তাঁহার রাণী শ্রীপ্রভাবতী "কাঞ্চনধ্বজ" রাজপ্রাসাদে ভোটীয় জল-পুরুষ অশ্ব বর্ষে (৯৮২ খ্রীঃ) এক পুত্ররত্নের জন্মদান করেন। উত্তরকালে ইনিই ইতিহাসে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা কল্যাণশ্রীর পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ ও শ্রীগর্ভ নামক তিন পুত্রের মধ্যে ইনি মধ্যম। তিন বৎসর বয়সে কুমার চন্দ্রগর্ভ নাতিদূর বিক্রমশিলায় অধ্যয়ন করিতে গেলেন এবং এগার বৎসর বয়সে গণিত ও ব্যাকরণ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিলেন।

প্রারম্ভিক অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে কুমার ভিক্ষু হইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যার্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একদিন ভ্রমণকালে জঙ্গলের মধ্যে এক পাহাড়ে গিয়া শুনিলেন, সেখানে মহাবৈয়াকরণ পণ্ডিত জেতারি বাস করেন। কুমার তাঁহার নিকটে গেলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে?" কুমার উত্তর দিলেন, "আমি এই দেশের স্বামীর পুত্র।" জেতারির নিকট এই উত্তর অভিমানীর বাক্য বলিয়া মনে

* ইহা পণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়নের মত। ক. চ.

হওয়ায় তিনি বলিলেন, "আমার স্বামী নাই, দাস নাই, রক্ষকও নাই, তুই যদি ধরণীপতি তবে চলিয়া যা।" মহাবৈরাগী জেতারির কথা কুমার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন ; সুতরাং অতি বিনয়ের সহিত নিজের সঙ্কল্পের বিষয় তাঁহাকে নিবেদন করিয়া গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জেতারি তাঁহাকে নালন্দা যাইতে উপদেশ দিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে মাতাপিতার অনুমতি বিনা কেহ শ্রমণ অথবা ভিক্ষু হইতে পারে না। অতি কষ্টে অনুমতি লইয়া কয়েকজন অনুচর সহ কুমার চন্দ্রগর্ভ নালন্দা চলিলেন। বিহারে যাইবার পূর্ব্বে তথাকার রাজার নিকট গেলে তিনি কুমারের পরিচয় প্রাপ্তির পর বিক্রমশিলা ছাড়িয়া এতদূরে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রগর্ভ নালন্দার প্রাচীনত্ব ও অন্যান্য গুণাবলী ব্যাখ্যা করায় রাজা পরম সমাদরের সহিত নালন্দায় কুমারের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ভিক্ষু হওয়া সম্ভব নহে, কুমার সে সময় দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র ; সুতরাং নালন্দায় স্থবির বোধিভদ্র কুমারকে শ্রমণের দীক্ষা দান করিলেন। পীতবস্ত্র ধারণের সহিত তাঁহার নাম হইল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। সে সময় আচার্য্য বোধিভদ্রের গুরু অবধূতীপাদ (অন্য নাম অদ্বয়বজ্র, অবধূতীপা, মৈত্রীগুপ্ত বা মৈত্রপা) রাজগৃহে কালশিলার দক্ষিণে নির্জ্জনবাস করিতেছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ও সিদ্ধ ছিলেন। বোধিভদ্র দীপঙ্করকে লইয়া আচার্য্য অবধূতীপাদের নিকট গিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে দীপঙ্করকে তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য ছাড়িয়া আসিলেন। ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া তিনি উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর মন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষার জন্য সে সময়ের বিখ্যাত তান্ত্রিক, চুরাশী সিদ্ধের অন্যতম ও বিক্রমশিলা বিহারের উত্তর দ্বারের দ্বারপণ্ডিত, নারোপার (নাড়পাদ) নিকট গেলেন এবং একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। দীপঙ্কর ছাড়া প্রজ্ঞারক্ষিত, কনকশ্রী ও মনকশ্রী (মাণিক্য) ইঁহারাও নারোপার প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিব্বতের মহাসিদ্ধ মহাকবি জেচুন মিলা-রে-পা'র গুরু মর-বা লোচবাও নারোপার শিষ্য ছিলেন।

ঐ সময় বুদ্ধগয়ায় মহাবিহারের প্রধান এক বিদ্বান ভিক্ষু ছিলেন। ইঁহার নাম অন্য ছিল, কিন্তু বজ্রাসন, অর্থাৎ বুদ্ধগয়াবাসী ছিলেন বলিয়া ইনি বজ্রাসনীয় বলিয়াই খ্যাত। নারোপার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দীপঙ্কর বজ্রাসন-মতিবিহার নিবাসী মহাস্থবির মহাবিনয়ধর শীলরক্ষিতের সমীপে গিয়া তাঁহাকে গুরু করিয়া উপসম্পদা (ভিক্ষু-দীক্ষা) লাভ করিলেন।

একত্রিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর তিন পিটক ও তন্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু

তাঁহার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। এখন সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) আচার্য্য ধর্ম্মপালের সুখ্যাতি শুনিয়া শিক্ষালাভের আশায় তাঁহার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন ধর্ম্মপালের পাণ্ডিত্যগৌরবের খ্যাতি তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রবর্গ—রত্নাকরশান্তি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, রত্নকীর্ত্তি—এদেশে যথেষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর তাহার ফলে বুদ্ধগয়া ছাড়িয়া সমুদ্রপথে ভ্রমণের পর বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুনিলেন আচার্য্যদেবের সম্মুখে পৌঁছানই সুকঠিন ব্যাপার, সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া দীপঙ্কর বর্ষকাল এক নির্জ্জনস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই-একজন করিয়া ভিক্ষু তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং শেষে সুবর্ণদ্বীপীয় আচার্য্যের শিষ্যপদবাচ্য হইতে কোন বাধা রহিল না। দ্বাদশ বর্ষকাল আচার্য্য মহীপালের নিকট সকল শাস্ত্র—বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র, "অভিসময়ালঙ্কার", "বোধিচর্য্যাবতার" প্রভৃতি—অধ্যয়ন করিয়া, পরে রত্নদ্বীপ ও নিকটস্থ অন্যান্য দেশ দেখিয়া দীপঙ্কর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভারতে আসিয়া তিনি বিক্রমশিলা বিহারে রহিলেন। তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা দৃষ্টে তাঁহাকে ৫১ জন পণ্ডিতের উপর ১০৮টি দেবালয়ের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা ছাড়াও তাঁহার আচার্য্যবর্গের মধ্যে সিদ্ধ ডোম্বী, ভূতিকোটিপাদ, প্রজ্ঞাভদ্র ও রত্নাকর শান্তির নাম করা যাইতে পারে। উঁহারগুরু অবধূতীপা সিদ্ধাচার্য্য ডমরুপা'র শিষ্য; ডমরুপা মহান্ সিদ্ধ ও কবি কহ্নপা'র (কৃষ্ণাচার্য্যপাদ, সিদ্ধাচার্য্য জলন্ধরীপা'র শিষ্য) শিষ্য ছিলেন। কহ্নপা তাঁহার সময়ে উচ্চশ্রেণীর ছায়াবাদী হিন্দী কবি ছিলেন।

গুপ্ত-সম্রাটগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের যে স্থান, পালবংশে ধর্ম্মপালের নাম ও পদ-মর্য্যাদা তদ্রূপ ছিল। গঙ্গাতটে এক সুন্দর ছোট পাহাড় দেখিয়া মহারাজ ধর্ম্মপাল সেখানে বিক্রমশীলা বিহার স্থাপন করেন। এই পরাক্রান্ত নৃপতির কৃপাদৃষ্টি থাকায় এই বিহার অল্পদিনেই বিশালরূপ ধারণ করে। নালন্দার ন্যায় ইহাকে বহুকালব্যাপী ক্রমোন্নতি-সোপান অতিক্রম করিতে হয় নাই। এখানে অষ্ট মহাপণ্ডিত ও একশত আট পণ্ডিত এবং বহু দেশী-বিদেশী বিদ্যার্থী থাকিত। দীপঙ্করের সময় সঙ্ঘস্থবির ছিলেন রত্নাকর। অষ্ট মহাপণ্ডিতের মধ্যে ছিলেন—শান্তিভদ্র, রত্নাকরশান্তি, মৈত্রপা (অবধূতীপা), ডোম্বীপা, স্থবিরভদ্র, স্মৃত্যাকর সিদ্ধ (কাশ্মীরী) ও অতীশা (দীপঙ্কর স্বয়ং)। বিহারের ভিতর অবলোকিতেশ্বরের মন্দির ও পরিক্রমায় ছোট বড় ৫৩টি তান্ত্রিক দেবালয় ছিল। যদিও পালরাজ্যের মধ্যেই নালন্দা, উডন্তপুরী ও বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া)—অন্য এই তিনটি মহাবিহার ছিল, তথাপি বিক্রমশিলার উপরেই পাল

রাজাদের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হইল। সেই ঘোর তান্ত্রিক যুগে ইহা তন্ত্রমন্ত্রের বিরাট্ দুর্গবিশেষ ছিল। চুরাশী সিদ্ধের প্রায় সকলেই পালবংশের রাজত্বকালে উদ্ভূত এবং তাঁহাদের অধিকাংশই এই বিক্রমশিলা বিহারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিব্বতী লেখকদিগের মতে এই বিহারে সিদ্ধগণ নিজেদের দেবতা যক্ষ প্রভৃতির সাহায্যে ও মন্ত্রতন্ত্র বলিপ্রদান আদি অস্ত্রের বলে বহুবার বিহার আক্রমণকারী "তুরুস্ক" (তুর্ক-মুসলমান) দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ।

* * * * *

তিব্বত সম্রাট স্রোচন্-গম্বো, ঠি-স্রোং-দে-চন্ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার ফলে উহাদেরই বংশধর ঠি-ক্যি-দে-ঞীমা-গোন্ লাসা ছাড়িয়া ঙংরী প্রদেশে (মানসসরোবর হইতে লদাখের সীমা পর্যন্ত) চলিয়া গিয়া সেখানে রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁহারই পুত্র ম্ ঙং-দগু-খোরে নিজের দুই পুত্র দেবরাজ ও নাগরাজসহ ভিক্ষু হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র লহ্-লাসা-যেশে-ও'কে রাজত্ব প্রদান করেন (দশম শতাব্দী)। রাজা যেশে-ও (জ্ঞানপ্রভ) দেখিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিল হইতেছে, লোকে ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। তিনি অনুভব করিলেন যে, ইহার প্রতিকার না করিলে পূর্ব্বজগণ-প্রজ্জ্বলিত এই প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। প্রতিকার চেষ্টায় তিনি রত্নভদ্র (রিন্ ছেন-সঙ্-পো, পরে লো-ছেন-রিম্পো-ছে) প্রভৃতি ২১টি সদ্বংশজাত ভোটীয় বালককে দশবর্ষকাল স্বদেশে উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিয়া পরে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। সেখানে তাহারা পণ্ডিত রত্নবজ্রের নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকে, কিন্তু যখন ঐ একুশ জনের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন রত্নভদ্র ও সুপ্রজ্ঞ (লগ্-প-শে-রব) জীবিত অবস্থায় ফিরিলেন। তখন রাজা অতিশয় দুঃখিত ও নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাহাতেও রাজা নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, যখন ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তিব্বতীদের বাঁচিয়া থাকা মুস্কিল, তখন ভারত হইতে কোন উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতকে এখানে আনাই শ্রেয়ঃ। তিনি ইহাও শুনিয়াছিলেন যে বিক্রমশিলায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে এক মহাপণ্ডিত আছেন, তিনি ভোটদেশে আসিলে ধর্ম্মের স্রোত ফিরানো দুরূহ হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন লোককে প্রচুর স্বর্ণ দিয়া বিক্রমশিলা পাঠাইলেন। তাহারা সেখানে গিয়া দীপঙ্করকে সমস্ত জানাইল, কিন্তু তিনি তিব্বত যাইতে রাজী হইলেন না।

ভোটরাজ ইহাতেও হতাশ হইলেন না, তিনি আবার প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া ভারত হইতে কোনও মহাপণ্ডিতকে আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রাজকোষে যথেষ্ট সোনা ছিল না, সুতরাং তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি লোকজন

লইয়া সীমান্ত দেশে গেলেন। সেখানে তাঁহার প্রতিবেশী গর্-লোগ দেশের রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

পিতা বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া লহা-লাপ চং-ছুপ ও (বোধিপ্রভ) তাঁহার মুক্তির চেষ্টায় গর-লোগ দেশে গেলেন। কথিত আছে গর-লোগ-রাজ ভোটরাজের মুক্তির পরিবর্ত্তে বিস্তর স্বর্ণ চাহিয়াছিলেন। চং-ছুপ-ও যে পরিমাণ স্বর্ণ একত্র করিয়াছিলেন, তাহা যথেষ্ট নয় জানিয়া তিনি আরও স্বর্ণ সংগ্রহেব জন্য দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে একবার বন্দী পিতার সহিত দেখা কবিয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। রাজা যেশে-ও তাঁহাকে স্বর্ণশুল্ক দিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি জান আমি বৃদ্ধ, বড় জোর আর দশ বৎসর পরমায়ু আছে, যদি আমাকে উদ্ধার করিতে রাজকোষ শূন্য হয়, তবে ভারত হইতে পণ্ডিত আনা সম্ভব হইবে না এবং ধর্ম্মের সংস্কার হইবে না। ইহাপেক্ষা ধর্ম্মের জন্য যদি আমার দেহান্ত হয় এবং তুমি ঐ স্বর্ণ দিয়া ভারত হইতে পণ্ডিত আনাও তাহা অনেক ভাল। এই রাজাকেই বা বিশ্বাস কি, সে যদি স্বর্ণ লইয়া পরে আমাকে মুক্তি না দেয়? অতএব হে পুত্র, তুমি আমার চিন্তা ছাড এবং সমস্ত সোনা দিয়া অতিশা'র নিকট দূত পাঠাও। আশা আছে আমার বন্দীদশার কথা শুনিয়া ভোটদেশে ধর্ম্মেব চিবস্থিতির জন্যও তিনি আসিবেন। যদি তিনি একান্তই না আসেন, তবে উঁহার পরেব শ্রেণীর কোনও পণ্ডিতকে আনাও।" এই বলিয়া ধর্ম্মবীর যেশে-ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কবিয়া বিদায় দিলেন। ইহাই পিতাপুত্রের শেষ দেখা।

চং-ছুপ-ও দেশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃআজ্ঞানুসারে ভারতে দূত পাঠাইবাব ব্যবস্থা কবিতে লাগিলেন। উপাসক গুঙ্-সং-পা ইতিপূর্ব্বে ভারতে দুই বৎসর যাপন কবিয়াছিলেন। তিনিই এই ভার লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গী হিসাবে নগ্র-ছোনিবাসী ভিক্ষু ছুন-ঠিম-গাল-বা) শিলবিজয় ও অন্য কয়েকজনকে লইলেন। এইরূপে দশজনে বিপুল স্বর্ণসম্ভার লইয়া নেপালের পথে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিক্রমশিলায় পৌঁছিলেন; (ডোম-তোন রচিত গুরু-গুণ ধর্ম্মাকর—পৃঃ ৭৭) ইঁহারা বিক্রমশিলার সম্মুখে গঙ্গার ঘাটে যখন পৌঁছিলেন তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। খেয়ার নৌকা লোকে পরিপূর্ণ, সুতরাং মাঝি ইঁহাদিগকে পরের ক্ষেপে লইয়া যাইবে এই আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। ওপারে বিক্রমশিলার বিরাট প্রাকার ও দেউল দেখিয়াই তিব্বতীয় যাত্রীরা পথকষ্ট ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু খেয়া নৌকার দেরিতে তাঁহাদের সন্দেহ হইল, মাঝি আর বোধ হয় সেদিন ফিরিবে না। নির্জ্জন নদীতটে বিরাট স্বর্ণরাজি লইয়া তাঁহাদের ভয় হইতে লাগিল, সুতরাং তাঁহারা বালুর তলায় স্বর্ণ লুকাইয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময় মাঝি নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিল। যাত্রীরা

তাহাকে দেরির জন্য সন্দেহের কথা বলায় সে বলিল, "তোমাদের ঘাটে ফেলিয়া রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে আমি চলিয়া যাইতে পারি ?"

নদীপথে তাঁহারা মাঝির নিকট শুনিলেন, বিহারের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পশ্চিম দ্বারের সম্মুখস্থ ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপনের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময় বিহারের তোরণের উপরস্থ কক্ষবাসা ভোটভিক্ষু গ্য-চোন্-সেং তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিয়া, স্বদেশবাসী জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট খবরাখবর লইতে আসিলেন। কথাবার্ত্তায় তাঁহারা অতিশাকে লইতে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন যে ইঁহারা যেন প্রথমে বিদ্যার্থীরূপে বিহারে প্রবেশ করেন, কেন-না মূল উদ্দেশ্য সকলে জানিলে পরে অতিশাকে লইয়া যাওয়া দুরূহ হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, পরে সুযোগ বুঝিয়া তিনিই দূতের সহিত অতিশা'র সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের বাসনা নিবেদন করিতে পারিবেন।

তিব্বতীয় দূতগণের পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই বিক্রমশিলায় পণ্ডিত-সভা বসিল। গ্য-চোন্ সকল বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ করাইলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত আলাপের ফলে রাজদূত বুঝিলেন অতিশা'র স্থান কত উচ্চে।

আরও কিছুকাল পরে গ্য-চোন্ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের অতিশা'র গৃহে লইয়া নিভৃতে আলাপ করাইলেন। তিব্বতীয় দূতগণ অতিশাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে স্বর্ণরাজি নিবেদন করিয়া, ভোটরাজ যেশে-ও কি ভাবে বন্দী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্তিম কামনা কি ছিল সকল কাহিনী শুনাইলেন। দীপঙ্কর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, "নিঃসন্দেহ ভোটরাজ যেশে-ও বোধিসত্ত্ব ছিলেন। আমি তাঁহার কামনা ভঙ্গ করিব না, কিন্তু তোমরা জান আমার উপর ১০৮ দেবালয়ের তত্ত্বাবধানের ও অন্য অনেক কার্য্যের ভার আছে। এ সকলের ব্যবস্থা করিতে আমার ১৮ মাস সময় লাগিবে। তাহার পর আমি যাইতে পারিব। এখন এই স্বর্ণরাজি তোমরা রাখ।"

ভোট-রাজদূতগণ ইহা শুনিয়া অধ্যয়নের ছুতা করিয়া বিহারে রহিয়া গেলেন। অতিশা যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে একদিন সময় মত তিনি সঙ্ঘস্থবির রত্নাকরপাদকে সমস্ত কথা বলিলেন। রত্নাকর দীপঙ্করের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি একদিন ভোটীয় সজ্জনদের ডাকিয়া বলিলেন, "ভোট আয়ুষ্মন ! আপনারা বিদ্যার্থীরূপে বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কি সত্য যে আপনারা আসলে অতিশাকে লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছেন ? এ সময় অতিশা ভারতীয়দের চক্ষুস্বরূপ; দেখিতেছেন না পশ্চিম দিকে তুরস্কদের * উপদ্রব

* তখন মহম্মদ গজনবীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু মধ্য এশিয়ায় ইস্‌লাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘাত চলিতেছে।

চলিতেছে। যদি এই সময় অতিশা দেশান্তরে চলিয়া যান তবে এখানে ভগবানের ধর্ম্মসূর্য্যও অস্ত যাইবে।"

অতিকষ্টে সঙ্ঘস্থবিরের অনুমতি পাওয়া গেল। অতিশা স্বর্ণভেট গ্রহণ করিয়া তাহা চার অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশ পণ্ডিতদিগকে দান এবং দ্বিতীয় অংশ বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) নিবেদন করিলেন; তৃতীয় অংশ রত্নাকরের হস্তে বিক্রমশিলা সঙ্ঘের জন্য ও শেষ চতুর্থাংশ রাজার জন্য, ধর্ম্মকৃত্যের জন্য দান করিয়া, নিজের লোকজনকে ভোট-দূতদিগের সহিত পুস্তক ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যসহ নেপালের পথে পাঠাইলেন। পরে তিনি স্বয়ং "লোচরা" (ভারতীয় পণ্ডিতের সহায়ক তিব্বতীয় দোভাষী) ও অন্য লোকজন—সর্ব্বসমেত বারজন লইয়া বুদ্ধগয়া যাত্রা করিলেন।

বজ্রাসন ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ভ আদি বিংশতি জনের মণ্ডল লইয়া আচার্য্য দীপঙ্কর ভাবতসীমার নিকট এক ছোট বিহারে উপস্থিত হইলেন। দীপঙ্করের শিষ্য ডোম-তোন তাঁহার 'গুরু-গুণ ধর্ম্মাকর গ্রন্থে' লিখিতেছেন—

"স্বামীর ভোট প্রস্থানের সময় ভারতে (বুদ্ধ) শাসন অস্তাচলগামী। ভারতের সীমার নিকট অতিশা দেখিলেন, তিনটি ছোট অনাথ কুক্কুরশাবক পথের পাশে পড়িয়া আছে। ষষ্টি বৎসরেব বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রেরণায় নিজ মাতৃভূমির অন্তিমচিহ্ন স্বরূপ এই তিনটি কুক্কুরশাবককে নিজ চীবরে (ভিক্ষু পরিধান-বস্ত্র) উঠাইয়া লইলেন।"

তিব্বতে প্রবাদ, আজও ঐ তিনটি কুকুরের জাতি ডাঙ প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

ভাবত-সীমান্ত পার হইয়া অতিশা'র মণ্ডলী নেপালরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে নেপাল রাজধানীতে উপনীত হইলেন। নেপালরাজ মহাসমাদরে তাঁহাদের রাজ-অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং দীপঙ্করকে নেপালে থাকিবার জন্য অতি আগ্রহের সহিত অনুনয় করিলেন। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অতিশকে এক বৎসর কাল নেপালে থাকিতে হইল। সেখানে নানা ধর্ম্মাচরণের মধ্যে এক রাজকুমারকে তিনি ভিক্ষু-দীক্ষা দিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর মহারাজ নেপালকে এক পত্রও লিখিয়াছিলেন। তাহার ভোটীয় অনুবাদ এখনও তঞ্জুরে বর্ত্তমান।

নেপাল হইতে প্রস্থান করিয়া দীপঙ্কর যখন স্থং বিহারে উপস্থিত হইলেন, তখন ভিক্ষু গ্যা-চোন্-সেং-এর পীড়ার জন্য তাঁহাকে সেখানে কিছুদিন থাকিতে হইল। বহু চেষ্টাতেও ভিক্ষু গ্যা-চোন্‌কে বাঁচাইতে পারা গেল না এবং তাঁহার ন্যায় বিদ্বান বহুশ্রুত দোভাষীর বিয়োগে অপার দুঃখে ও নিরাশায় দীপঙ্কর বলিলেন, "আমার ভোটযাত্রা বিফল হইল, আমি দোভাষী বিনা সেখানে কি করিতে পারিব?" শীলবিজয় ও অন্য দোভাষীগণ তাঁহাকে অনেক কষ্টে প্রবোধ দিলেন।

বৃদ্ধ পণ্ডিতের পথকষ্ট নিবারণের জন্য ভোটরাজা চঙ্-ছুপ-ও নিজ রাজ্যে মহাযত্নে নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভোটবাসী জনসাধারণ তখন এই সূর্য্যপ্রভ মহাপণ্ডিতের দর্শনের জন্য লালায়িত। এইরূপে পথে ভোট জনসাধারণকে ধর্ম্মমার্গ দেখাইতে দেখাইতে তিব্বতীয় জল-পুরুষ-অশ্ব বর্ষে (চিত্রভানু সম্বৎসর= ১০৪২ খ্রীঃ) আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৬১ বৎসর বয়সে ডংরী অর্থাৎ পশ্চিম তিব্বত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজধানী যোলিঙ্ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভোটরাজা অনেক পথ আগাইয়া তাঁহাকে লইতে আসিলেন এবং নানা স্তুতিসহকারে অভ্যর্থনা করিয়া সমারোহের মধ্যে তাঁহাকে যোলিঙ্ বিহারে লইয়া গেলেন। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"—বাক্যের সার্থকতা প্রকাশ পাইল।

আচার্য্য দীপঙ্কর যোলিঙ বিহারে নয় মাস কাল অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি "বোধিপথ বিহার" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করান। ডংরী প্রদেশে যে তিন বৎসর যাপন করেন, তৎকালে অন্য বহু গ্রন্থের রচনা ও অনুবাদ শেষ করিবার পর ক্রম-পুরুষ-বানর বর্ষে (হেমলম্ব, ১০৪৪ খ্রীঃ) তিনি পুরুঙে উপস্থিত হন। এই স্থানে অতিশা'র প্রিয় শিষ্য, গৃহস্থ ডোমতোন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় হইতে অতিশা'র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই শিষ্য ছায়ার ন্যায় গুরুর অনুগামী ছিলেন এবং গুরুর দেহত্যাগের পর, "গুরু-গুণ ধর্ম্মাকর" নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার জীবন-চরিত লিখেন। ভোটদেশের কোন কোন স্থানে কিছুকাল ধরিয়া অবস্থান করিলেও আচার্য্য প্রায় অধিকাংশ সময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণয়ন অথবা অনুবাদের কার্য্য কখনও ক্ষান্ত থাকিত না। অগ্নি-পুরুষ-শূকর বর্ষে (সর্ব্বজিত, ১০৪৭ খ্রীঃ) সম্-য়ে বিহার এবং লৌহ-পুরুষ-ব্যাঘ্র বর্ষে (বিকৃত, ১০৫০ খ্রীঃ) তিনি য়ের্-বা গিয়াছিলেন ; এইরূপে চৌদ্দ বৎসর ভোটদেশে অবস্থানকালে তিনি তিন বৎসর ডংরী প্রদেশে, চার বৎসর উই ও চাং প্রদেশে এবং ছয় বৎসর য়ে-থঙ্ প্রদেশে কাটাইয়াছিলেন। ক্রম-পুরুষ-অশ্ব বর্ষের (জয়, ১০৫৪ খ্রীঃ) ভোটীয় নবম মাসের অষ্টাদশ তিথিতে (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ তৃতীয়া-চতুর্থী) য়ে-থঙ্ বিহারের তারা মন্দিরে ৭৩ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। প্রিয় শিষ্য ডোমতোন তখন তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন। লাসা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে, আমি এই অতিপবিত্রস্থান দর্শন করি। অতিশা'র সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মন্দিরের পরিবর্ত্তন অতি অল্পই হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য উহার বিশাল রক্ত-চন্দন স্তম্ভ। এখনও দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, ধর্ম্মকারক (কমণ্ডলু) ও খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত যষ্টি—ঐ মন্দিরে একটি রাজমুদ্রা-অঙ্কিত

পিঞ্জরে সুরক্ষিত হইয়া জগৎকে জানাইতেছে যে, সেদিন পর্য্যন্ত ভারতের বৃদ্ধ-অস্থিতে কি অদম্য সাহস ও কার্য্যক্ষমতা ছিল।

ভোটদেশের চারিটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই আচার্য্য দীপঙ্করকে একভাবে পূজনীয় জ্ঞান করে। শিষ্য ডোমতোন-পা প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরার মধ্যে চাঙ্‌-খ পা একজন শিষ্য হইয়াছিলেন, তদনুবর্ত্তী পীত টুপীধারী লামা-সম্প্রদায় ভোট-দেশে ধর্ম্ম ও রাজকার্য্য দুই ব্যাপারেই প্রধান। ইঁহারা নিজেদের অতিশা'র অনুগামী বলেন এবং অতিশা'র শিষ্যপরম্পরা কা-দম্‌-পা দিগের উত্তরাধিকারী নবীন কা-দম্‌-পা বলিয়া বর্ণনা করেন।

আচার্য্য দীপঙ্কর কৃত মূল সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থসকল লুপ্ত হইয়া গেলেও তাহার অনুবাদ এখনও তিব্বতী তঞ্জুরে সুরক্ষিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি ৩৫ খানি বা ততোধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার তান্ত্রিকগ্রন্থের সংখ্যা ৭০এর অধিক, যদিও তাহার মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র নিবন্ধও আছে। তিব্বতী ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কঞ্জুর-সংগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন লোচবার (দ্বিভাষী) সহায়তায় অনূদিত নয়খানি গ্রন্থ আছে, তঞ্জুরের সূত্র-বিভাগে এইরূপ অনুবাদের সংখ্যা ২১টি ও ইহার রত্ন-বিভাগে ৩০এর উপর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ আছে।

* * * * *

তিব্বতে শিক্ষা-প্রকরণ গৃহস্থ ও ভিক্ষু এই দুই শ্রেণীর জন্য বিভিন্নরূপে বিভক্ত আছে। ভিক্ষুদিগের শিক্ষার জন্য হাজার হাজার ছোট-বড় মঠ বা বিদ্যালয় আছে, তাহার কোন-কোনটিতে গৃহস্থ বিদ্যার্থী ব্যাকরণ, সাহিত্য, বৈদ্য-শাস্ত্র বা জ্যোতিষে শিক্ষালাভ করিতে পারে—এরূপ সৌভাগ্য ধনী বা অভিজাত বংশের ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা সত্য যে, কখনও কখনও সুশিক্ষিত ভিক্ষু পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে এবং গৃহস্থশ্রেণী এইরূপে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে। এবং ইহাও সত্য যে, মঠে শিক্ষিত ভিক্ষু ধনী গৃহস্থ বালকের শিক্ষক নিযুক্ত হয়, কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে যে সকল মঠে বৃহৎ বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে গৃহস্থমাত্রেই তাহাতে প্রবেশ করিতে পায় না।

তিব্বত ভিক্ষুর দেশ। ইহা সত্য নয় যে, সঙ্ঘের ভিক্ষুগণ, প্রধান বা মঠাচার্য্য-গণ দেশ শাসন করেন, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ গৃহত্যাগী-ভিক্ষুকশ্রেণীভুক্ত। কচিৎ এমন গ্রাম পাওয়া যায়, যেখানে দুই একটি ভিক্ষুও নাই বা যাহার পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-বাহুতে ছোট মঠ স্থাপিত হয় নাই। আট হইতে বারো বৎসর বয়সের মধ্যে ভিক্ষু-সঙ্ঘ প্রবেশার্থী বালকেরা মঠে প্রবেশ করে। অবতারী লামা—অর্থাৎ যাঁহাদের

লোকে কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মা বা বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা আরও অল্প বয়সে মঠে প্রবেশ করেন। এই সকল বালক প্রথমে ছোট ছোট মঠে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করে। প্রারম্ভে বিশেষভাবে সুন্দর অক্ষর—দাঁড়িযুক্ত ও দাঁড়িহীন—লিখনের অভ্যাস করানো হয়। হস্তলিপি অভ্যাসে অধিক সময় দেওয়ায় সুশিক্ষিত তিব্বতীদের লিখন প্রায়ই সুন্দর। পড়ার মধ্যে প্রধান কার্য্য শ্লোক কণ্ঠস্থ করা। তিব্বতী ভাষায় ব্যাকরণ, কাব্য, তর্ক, ধর্ম্মশাস্ত্র সবই শ্লোকবদ্ধ। ইহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেগুলির অভ্যাস ও স্মরণ দুইই সহজ হয়। সাধারণ গণনার অতিরিক্ত গণিত প্রায়ই শিখানো হয় না, কেবল যাহারা জ্যোতিষী বা সরকারী দপ্তরের উচ্চ কর্ম্মচারী হইতে চাহে, তাহারা বিশেষভাবে গণিত শিক্ষা করে। বিদ্যাশিক্ষায় বেত্রদণ্ডের সাহায্য খুবই লওয়া হয়। অবতারী লামা ভিন্ন অন্য ছাত্রমাত্রেই অধ্যাপকের সেবাপরিচর্য্যা করে, অন্যদিকে বহু অধ্যাপক অনেক দরিদ্র ছাত্রের ভরণপোষণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

লিখন-পঠনে কুশলতা-লাভ ও কিছু ধর্ম্মগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়। তাহার পর ব্যাকরণ, নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক শ্লোক পাঠ আরম্ভ হয়। এইরূপে চার পাঁচ বৎসর কাটিলে উচ্চশিক্ষার পথে যাওয়া যায়। যদি মঠে উপযুক্ত অধ্যাপক না থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে বড় মঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা-কেন্দ্রে যাইবার পূর্ব্বে মধ্যম শ্রেণীর কোনও মঠে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ বিদ্যাভ্যাস করা প্রয়োজন। তর্ক, বৌদ্ধদর্শন এবং কাব্যের প্রারম্ভিক গ্রন্থাদি এই সময় পড়ানো হয়। পুস্তকগুলি কণ্ঠস্থ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যদিও বিদ্যার্থিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পাঠ শিক্ষা করে, কিন্তু পরীক্ষা বা উচ্চশ্রেণীতে উন্নয়নের কোনই ব্যবস্থা নাই। ইহার পরিবর্ত্তে ছাত্রেরা দল বাধিয়া স্ব স্ব বিষয়ে শাস্ত্রার্থ প্রভৃতি লইয়া প্রতিযোগিতা করে এবং অধ্যাপক ছাত্রকে প্রশ্নাদি করেন। এক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর সন্তোষজনক না হইলে, সেই ক্ষণেই দণ্ডদান করা হয় এবং নূতন বিষয়ে পাঠ স্থগিত রাখা হয়। এক গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে, সেই বিষয়ে উচ্চতর গ্রন্থ পড়ানো হয়, এবং বিদ্যার্থী যদি চিত্রণ, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ বা কাষ্ঠ-তক্ষণ ইত্যাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহে, তবে তাহাকে সে শিক্ষাও দেওয়া হয়। সকল মঠেই এই সকল বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। উচ্চতম শিক্ষার জন্য চারিটি মঠে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রথম গম্-দন (লাসা হইতে দুই দিনের পথ), দ্বিতীয় ডে-পুং (লাসার নিকট, ১৪১৬ খ্রীঃ স্থাপিত), তৃতীয় সে-রা (লাসার নিকট, ১৪১৯ খ্রীঃ স্থাপিত), চতুর্থ টশী-লুন-পো (চঙ্ প্রদেশে, ১৪৪৭ খ্রীঃ স্থাপিত)।

তিব্বতের প্রাচীনতম মঠ সম্-য়ে লাসা হইতে তিন দিনের পথ। নালন্দার মহান্ দার্শনিক আচার্য্য শান্তরক্ষিত ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার স্থাপনা করেন, কিন্তু এখন ইহার

আর সে প্রাচীন গৌরব নাই। উপর্যুক্ত চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই মধ্য-তিব্বতে স্থিত। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বতিব্বতের তেরগী (১৫৪৮ খ্রীঃ স্থাপিত) ও চীন সীমান্তস্থিত অম্-দো প্রদেশের স্কু-বুম (১৫৭৮ খ্রীঃ স্থাপিত) এই দুইটিও প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র। এইসকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রচুর জায়গীর আছে, উপরন্তু যাত্রীরাও এই সকল মঠকে কিছু দান করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে। মঠ হইতে বিদ্যার্থিগণকে অবস্থামত আর্থিক সাহায্যও করা হয়। প্রতিভাশালী ছাত্রের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ম্-খন্-পো (অধ্যক্ষ—ডীন) ঐরূপে ছাত্রকে অতি স্নেহ ও যত্নের সহিত দেখেন এবং তাহার উন্নতিতে নিজের ও নিজ প্রতিষ্ঠানের গৌরববৃদ্ধি অনুভব করেন। মাঝারি ছাত্রকে অনেকটা নিজ পরিবারের বা গুরুর সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই সকল বিশাল শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে দূরদূরান্ত হইতে হাজার হাজার বিদ্যার্থী আসে। বৃহত্তর কেন্দ্র ডে-পুং। সেখানে সাত হাজার সাত শতাধিক বিদ্যার্থী আছে। তাহার পর সে-রা, যেখানে সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র বিদ্যালাভ করে। গন্-দন্ ও টশী-লুন-পো এই দুই কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে সাড়ে তিনহাজার ছাত্র আছে। টশীলামা দেশত্যাগী হওয়ায় টশী-লুন-পো কিছু নীচে নামিয়াছে। এই সকল বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের কথা পরে আরও বলিবার ইচ্ছা আছে। এই সকল স্থানে উত্তরের সাইবিরিয়া, পশ্চিমের অস্ত্রাখান (দক্ষিণ রুষ) ও পূর্ব্বাঞ্চলের চীন জেহোল প্রদেশের বহু বিদ্যার্থী দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবিদ্যালয়ের মত ইহাদের ছাত্রাবাস, পুস্তকালয় ও দেবালয় আছে, এবং প্রত্যেকটিতে পৃথক জায়গীর আছে—এমন কি ক্ষুদ্রতম ছাত্রাবাসেও।

উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন প্রগাঢ়তর হয়। তবে, গ্রন্থাদি মুখস্থ করার পারিপাট্য এখানেও চলে। আমাদের ছাত্রেরা ক্রিকেট ও ফুটবলে যে আনন্দ পায়, এখানকার ছাত্রেরা ন্যায় ও দর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থ করায় সেইরূপ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করে। এখানকার উ-সঙ্ বা মহাবিদ্যালয়ের ম্-খন্-পো (ডীন) যদিও উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত ও বিদ্বানগণ হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার কার্য্য প্রধানতঃ গের্-গেন্ (লেক্‌চারার) বা গে-শে (প্রফেসার)-গণই করিয়া থাকেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিদ্বন্মণ্ডলীর মত অনুকূল হইলে বিদ্যার্থী ল্যা-রম্-পা, অর্থাৎ ডক্টর, উপাধি পায়। তাহার পর সে নিজ মঠে ফিরিয়া যায় এবং যদি পঠন-পাঠনে তাহার অধিক ইচ্ছা থাকে, তবে সে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গে-শে বা গের্-গেন্ হইতেও পারে।

তিব্বতে ভিক্ষুণীদিগের শত শত মঠ আছে এবং সেখানে ভিক্ষুণীদিগেরও বিদ্যালাভের ব্যবস্থা আছে। এই সকল মঠ ভিক্ষু-মঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও দূরে অবস্থিত। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যদিও এগুলিতে আছে, কিন্তু কোনও ভিক্ষুণী-

বিশ্ববিদ্যালয় নাই এবং ভিক্ষুণী-বিদ্যার্থিনী ভিক্ষু-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেও পারে না। ইহাদের শিক্ষা প্রধানতঃ সাহিত্য, ধর্ম্ম ও পূজা-পাঠ সম্বন্ধীয় হইয়া থাকে।

যদিও গৃহস্থ-ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু মঠে উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের গৃহস্থের শিক্ষকতা করায় কোনও বাধা নাই। যে কোন গৃহস্থ-ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে গিয়া পুস্তক পাঠ করিতে পারে, কিন্তু ছাত্রাবাসে তাহার থাকা নিষিদ্ধ হওয়ায়, এই নিয়মে তাহার বিশেষ উপকার হয় না। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষু অতি অল্প ক্ষেত্রেই পুনর্ব্বার গৃহস্থ হয়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারী কার্য্যে তাহাদের চাহিদা খুবই বেশী। বিশেষ নিয়মানুসারে সরকারী প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে একজন গৃহস্থ ও একজন ভিক্ষু এইরূপ জোড়া জোড়া চাকুরী হওয়ায় ইহাদের উচ্চপদলাভ সহজেই হয়। উদাহরণ-স্বরূপ আমার বন্ধু কুশো-তন-দর ভিক্ষুর নাম করা যাইতে পারে, তিনি লাসার টেলিগ্রাফ অফিসের দুইজন অফিসারের অন্যতম।

ধনী বংশের বালক-বালিকা নিজ গৃহে লামার নিকট শিক্ষালাভ করে। বালিকাদিগের এই প্রারম্ভিক শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, তবে ভিক্ষুণী হইবার ইচ্ছা থাকিলে আরও কিছুদূর লেখাপড়া হইতে পারে। সাধারণ স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার অভাবই অধিক। ধনীদিগের বালকগণ বিশেষভাবে নিযুক্ত অধ্যাপকের নিকট পড়িতে পারে। সাধারণ শ্রেণীর বালকের পক্ষে বয়োজ্যেষ্ঠদিগের নিকট অধ্যয়ন বা গ্রামস্থ মঠের পাঠশালা ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার অন্য কোনও পথ নাই। লাসা, শীগর্চী ইত্যাদি নগরে কোন কোন পণ্ডিত নিজ নিজ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন—যেখানে অল্পব্যয়ে শিক্ষালাভ সম্ভব। এখানে শিক্ষার ক্রম ভিক্ষু-শিক্ষালয়েরই মত ; তবে দর্শন ও ন্যায় একেবারেই শিখানো হয় না। লাসায় সরকারী কাজকর্ম্ম শিক্ষার জন্য চী-খন নামক বিদ্যালয় আছে, সেখানে হিসাবকিতাব ইত্যাদি রাখার পদ্ধতি শিখান হয় এবং এই বিদ্যালয় হইতেই উপযুক্ত লোক সরকারী পদের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভোট-সরকার গ্যাঞ্চিতে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং অনেক সর্দ্দার তাহাদের বালকদিগকে সেখানে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রারম্ভেই অতি উচ্চ বেতনে ইংরেজ ও অন্য শিক্ষক নিয়োগ করায় তাহা বেশী দিন ইঁহারা চালাইতে পারেন নাই। দুই-চারিটি বিদ্যার্থীকে সরকারী খরচে ইংলণ্ডেও পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের শিক্ষাও আশানুরূপ না হওয়ায় সে পন্থাও স্থগিত আছে। সংক্ষেপে তিব্বতে শিক্ষার অবস্থা এইরূপ। অন্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষাপ্রকরণেও বহির্জগতের ছায়া এদেশে বিশেষ পড়ে নাই। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে-সকল ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে সেগুলিতে নূতন বাতাস বহিলে, তিব্বতে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-বিস্তারে বিশেষ সময় লাগিবে না।

উপস্থিত পর্ব্ব

পূর্ব্ব দিকে চীন হইতে পশ্চিমে লদাখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড তিব্বত দেশ। ইহা পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত এবং গড়ে সমুদ্র হইতে ১২,০০০ ফুট উচ্চে স্থিত। উচ্চতার দরুণ এখানে শীতের আধিক্য ও বায়ুমণ্ডল লঘু হওয়ায় এদেশে বৃক্ষ-গুল্মের অভাব আছে। মে-জুন মাসের গ্রীষ্মকালেও লাসার চারিদিকের পাহাড় তুষারাচ্ছাদিত থাকে, শীতকালের তো কথাই নাই! হিমালয়ের বিশাল প্রাচীর পথরোধ করায় ভারতীয় সমুদ্রের মেঘমালা এখানে স্বচ্ছন্দে পৌঁছে না, সেইজন্য এদেশে বৃষ্টি কম, তুষারপাতই অধিক। এ-দেশের শীত যেন অস্থিচ্ছেদ করিয়া দেহে প্রবেশ করে।

ঋতুর কঠোরতা হেতু দেশবাসীদিগকে অধিক পরিশ্রমী ও সাহসী হইতে হইয়াছে। সিংহলের ন্যায় এদেশে একটি সারোং-এ (লুঙ্গী) চলে না, এখানে বার মাসই মোটা পশমী পোষাকের প্রয়োজন। শীতকালে তাহাতেও কুলায় না, লোমযুক্ত পশুচর্ম্ম (পোস্তীন) ভিন্ন উপায় নাই। সাধারণ লোকে ভেড়ার চামড়া—লোম ভিতরে, চর্ম্ম বাহিরে রাখিয়া পরিয়া থাকে। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বন্য শৃগাল, নেকড়ে, নেউল ইত্যাদি নানা জন্তুর চর্ম্ম ব্যবহার করেন, সেগুলির মূল্য অধিক। সংক্ষেপে এদেশে সাধারণ কাপড়ে প্রাণধারণ করা অসম্ভব। চামড়া ও উলের বুট জুতা (শোম্পা), তাহার উপর গরম পাজামা, লম্বা গরম কোট (ছুপা) ও মস্তকে ফেল্ট-হ্যাট—ইহাই এদেশের পোষাক। ফেল্ট-হ্যাটের ব্যবহার পনর-ষোল বৎসর মাত্র চলিয়াছে, কিন্তু এখন উহার ব্যবহার বালক বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যেই প্রচলিত। ইউরোপ হইতে লক্ষাধিক পুরানো হ্যাট ধোলাই করিয়া কলিকাতায় আসে এবং সেখান হইতে স্বল্প মূল্যে এদেশে চালান হয়।

স্ত্রীলোকদিগের পায়ে শোম্পা জুতা থাকে। দেহে ছুপা কোট, কিন্তু তাহাতে হাত থাকে না, কোটের নীচে হাতযুক্ত সূতী বা আসামী এণ্ডির এবং সামনে কোমরের নীচে বিলাতী "এপ্রন" জাতীয় বস্ত্রখণ্ড থাকে যাহা ঝাড়নের কাজ করে। তিব্বতী স্ত্রী-লোকের শিরসজ্জায় ও ভূষণে অনেক যত্ন করা হয়। ভোটীয় গৃহস্থের সম্পত্তির অধিকাংশ তাহার স্ত্রীর মস্তকের উপর থাকে, ইহা বলা বিশেষ অত্যুক্তি নহে। শিরসজ্জার রূপ হইতে কোন্ স্ত্রীলোক কোন্ প্রদেশের তাহা বিচার করাও সহজ। টশী লামার প্রদেশের (চাঙ প্রদেশ) স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ ধনুকাকার। ইহা মূলতঃ একটি কাষ্ঠখণ্ডকে বাঁকাইয়া ও তাহাতে কাপড় জড়াইয়া তৈয়ারী করা হয়। ইহার উপর ফিরোজা ও প্রবালের গুচ্ছ ও লহর থাকে, ধনীগৃহে মুক্তার ব্যবহারও

নীচের অংশে প্রচুর হইয়া থাকে। গহনাতেও ফিরোজা ওপ্রবালের ব্যবহারই অধিক। লাসার স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ ত্রিকোণাকার, ইহার উপর মুক্তা প্রবাল ফিবোজা উপরন্তু পরচুলার বেণী-মালা কান হইতে পিঠ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। এই পরচুলাব কেশ চীনদেশ হইতে আসে এবং লাসার ও তাহার আশপাশের অধিক সভ্য অঞ্চলেব স্ত্রীলোকগণ এক এক জনে পঞ্চাশ-ষাট, এক শত দুই শত টাকা খরচ করিয়া এই বহু মূল্য অলঙ্কারে নিজেদের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কেশরাশি-সংলগ্ন বৃহৎ কর্ণভূষণ, গলায় ফিবোজাযুক্ত বৃহৎ চৌকোণ তাবিজদান—যাহা ভূত-প্রেত-নিবারণ-মন্ত্রে পরিপূর্ণ—তাবিজের পাশ হইতে বাহু ও কোমর পর্য্যন্ত ঝুলানো মুক্তাগুচ্ছ, ইহাই এদেশের স্ত্রীলোকেব গহনা। মুসলমান ভিন্ন অন্য সকল স্ত্রীলোকেই দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিয়া থাকে। শঙ্খটিতে হাত গলাইবার মত পথ থাকে মাত্র, কোন মতেই তাহাকে চুড়ি বা বালা বলা যায় না।



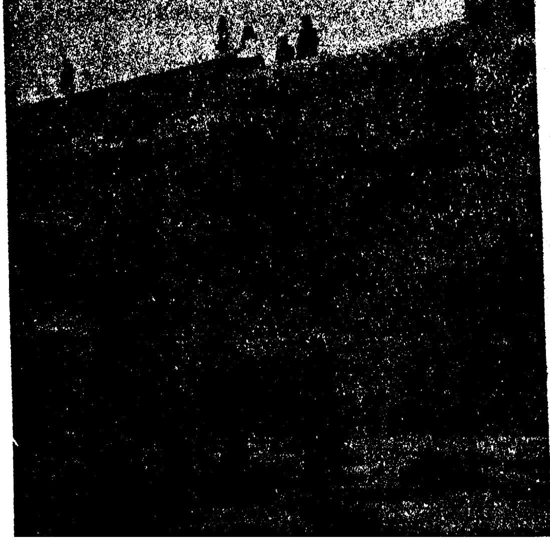
একটি সুসজ্জিত তিব্বতী-পরিবার

* * * * *

পশমই ভোটদেশের প্রধান আয়ের বস্তু। উল, কস্তুরী, লোমযুক্ত চর্ম্ম (ফর্), ইহাই এখানকার প্রধান রপ্তানীর মাল এবং রপ্তানীর পথ প্রধানতঃ ভারবর্ষের মুখে। গম, যব, যও (ওট্স), মটর ও সরিষা এদেশে কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। সম্বৎসরে একবার মাত্র ফসল হয়, তাহাও ভিন্ন উচ্চতায় ভিন্ন সময়ে পাকে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সর্ব্বত্রই ফসল কাটা হইয়া যায়। অক্টোবরে শরৎ ঋতুর আগমনে, গাছের পাতা পীতবর্ণ হইয়া ঝরিতে থাকে।

গম যথেষ্ট জন্মাইলেও ভোটীয়েরা রুটি খায় না। ইহারা গম যব ভাজিয়া পিষিয়া সক্তুতে (চম্বা) পরিণত করে, এবং রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা প্রধান খাদ্য।

লবণ, মাখন মিশ্রী ইত্যাদি গরম চায়ে দিয়া তাহাতে চম্বা ঢালিয়া হাতে মাখিয়া খাওয়াই ইহাদের প্রথা। প্রত্যেকের পৃথক পেয়ালা থাকে, ইহা প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত। এই পেয়ালাই তাহাদের রেকাব, থালা, গেলাস ইত্যাদির স্থান পূর্ণ করে। ভোজনের পর জিবদিয়া চাটিয়া পেয়ালা পরিষ্কার করিয়া বুকের কাছে চোগার ভিতর তাহা রাখা হয়। দেহ, মুখ, হাত প্রভৃতি ধৌত করা কদাচিৎ হয়, এমন কি বিহারের ভিক্ষুদেরও মুখ ও হাতের উপর ময়লার মোটা স্তর জমিয়া থাকে। ভোট-দেশে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যায় যাহারা আজীবন শরীরে জলক্ষেপ করে নাই।



সম্ভ্রান্ত তিব্বতীয়ের বাসভবন

চা ও চম্বা ভিন্ন ইহাদের প্রধান খাদ্য মাংস এবং অধিকাংশ স্থলে তাহা কাঁচা বা কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া খাওয়া হয়। মসল্লা ইত্যাদি দ্বারা মাংস পাক করার প্রথা সহরের ধনীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ এবং ইহাও চীন ও নেপালী অফিসার বা সওদাগরদিগের প্রভাবের ফল। অভিজাত বংশের ভোটীয়রা চীনদেশের রীতিতে দুইটি কাষ্ঠশলাকা চামচের মত ব্যবহার করিয়া ভোজন করে এবং তাহাদের খাদ্যের মধ্যে আটা ময়দাও স্থান পায়। চা এদেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে পান করে, এবং এই চা অধিকাংশই চীন দেশ হইতে আসে। চীনা চা চাপে জমাইয়া ইটের মত করা হয় এবং যদিও ইহা তিন মাসের পথ হইতে আসে, তবুও ভারতের চা অপেক্ষা অনেক সস্তা। এখানে চায়ে দুধ-চিনির ব্যবহার প্রচলিত নহে। প্রথমে সোডা ও লবণের সহিত চা খুব ফুটাইয়া পরে তাহা বাঁশের বা কাঠের চোঙায় ঢালিয়া মাখনের সঙ্গে মিশাইয়া লইলেই তিব্বতী চা প্রস্তুত হইল। ইহা দেখিতে দুধ-মিশানো চায়েরই মত।

চৌদ্দ

এদেশে অতিথিসৎকারের প্রথম পর্যায়ে শুষ্ক মাংস, চা বা কাঁচা মদ (ছঙ) দেওয়া হয়। চা এখানে ঘরে ঘরে সদাসর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং গৃহস্থ, ভিক্ষু, দোকানদার, সেনানায়ক সকলেরই ইহা সর্ব্বক্ষণ প্রয়োজন। যব পচাইয়া মদ তৈয়ারী করা হয় এবং যদিও এক-আধ হাজার ভিন্ন অন্য সকলেই তিব্বতীয় বৌদ্ধ, তথাপি পীতটুপী-পরিহিত গেলুক্-পা সম্প্রদায় ভিন্ন সকলেই অবাধে মদ্য পান করে। মদ্য বিনা ইহাদের পূজা হয় না, এমন কি গেলুক্-পা ভিক্ষুরাও পূজার সময় দেবতার প্রসাদ হিসাবে সামান্য পরিমাণে মদ্যপান করিয়া দেবতার ক্রোধ নিবারণ করে। এদেশে উপোসথ, পঞ্চশীল বা অষ্টশীল ইত্যাদি ব্রত বা নিয়মের কোন জ্ঞানই নাই, অতি শিশুও প্রতিদিন মদ্যপান করে; বস্তুতঃ জগতে এরূপ মদ্যপায়ী জাতি আর আছে কিনা সন্দেহ!

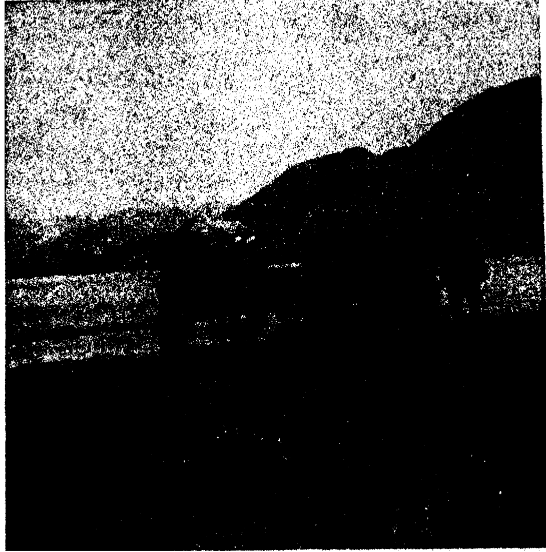
.এদেশের উলের কাপড় মোটা, মজবুত ও সুন্দর। এখনও কাপড় বুনার প্রথা পুরাকালের মতই আছে, সুতরাং অল্প ওসারের কাপড়ই তৈয়ারী হয়, বড় বহরের তাঁত খাটান হয় না।' মোজা, দস্তানা, গেঞ্জি প্রভৃতি এখানে বিশেষ হয় না, কেবলমাত্র লাসায় নেপালী সওদাগরদিগের প্রভাবে আজকাল ঐসব জিনিষ অল্পস্বল্প তৈয়ারী হইতেছে এবং তাহাও নিকৃষ্ট ধরণের। এদেশের উল স্বভাবতঃই নরম ও চিক্কণ এবং সেই জন্য প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার পশম ভারতে রপ্তানী হওয়ায় কাপড়ের দর কিছু চড়িয়াছে, তবে এই চড়া দরও বিদেশের তুলনায় সস্তা।

শিক্ষা বা অন্য অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইলেও ললিতকলায় তিব্বতবাসীর দক্ষতা ও অনুরাগ প্রশংসনীয়। লাসার নিকটস্থ অঞ্চলে বিস্তর আখ্‌রোট বৃক্ষ জন্মায়, তাহার কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ় এবং মসৃণ। ধনীর গৃহে ও মঠে-বিহারে আখ রোট-কাষ্ঠের উপর সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য্য ইহাদের কলানৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। ত্রিপিটক ও অট্ঠকথার ন্যায় বৃহৎ পুস্তকগুলিও ঐ আখ্‌রোটের পাটায় খোদাই করিয়া ছাপা হয়।

এদেশের চিত্রকলার সহিত আমাদের অজন্টা ও সিগিরিয়ার শুদ্ধ আর্য্য-চিত্রকলার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। তিব্বতীয়েরা বর্ণসমাবেশে বিশেষ কুশলী, তবে এখন বিদেশী রঙ প্রচলিত হওয়ায়, চিত্রাবলী পূর্ব্বের ন্যায় স্থায়ী হইবে কিনা সন্দেহ। এই চিত্রণ-প্রথাও বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে নালন্দা ও বিক্রমশীলা হইতে এদেশে আসিয়াছিল। নিয়ম ও রীতির বন্ধনে বাঁধা বলিয়া তিব্বতীয় শিল্পে আর সেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য নাই। ভোটীয়-চিত্রকর-অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি গতানুগতিকতায় কল্পিত প্রতিমাযুক্ত চিত্র-মাত্রে পর্যবসিত হয় ইহা সত্য, তবুও বর্ত্তমান ভারত বা সিংহলের তুলনায় সে শিল্পের স্থান যে এখনও অনেক উচ্চে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশের চারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য তাহার সার্ব্বজনীনতায়। ধাতু বা মৃন্ময়-মূর্ত্তি প্রায় সবই অতি সুন্দর। এই বিষয়ের শিক্ষার্থী এখনও প্রাচীনকালের ন্যায় বহু

বৎসর শিল্পাচার্য্যের সেবাশুশ্রূষা করিয়া শিল্পত্বে ব্রতী থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের শিল্প ও কলার পুনর্জ্জাগরণে ইহাদের বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে, যদিও এদেশেব শিল্পেব ধারা এখন পূর্ব্বকালের ন্যায় স্বচ্ছন্দ ও উন্মুক্ত নহে। সত্য-বটে, গৃহ,গৃহস্থ ও বস্ত্র—সকলেরই উপব একটা পুরু ময়লার আবরণ, তৎসত্ত্বেও তিব্বতীয়-গৃহসজ্জাব রুচি নিকৃষ্ট বলা যায় না। ঘরেব ছাদে ও জানালায় ফুলের টবের সারি, ঘরেব ভিতবে রঙীন ঝালব, আভ্যন্তরীণ গৃহগাত্রে রঙীন রেখাঙ্কন, জানালায় জালিদার কাগজ বা কাপডেব পাল্লা, চায়ের চৌকীব উপর নানা বর্ণের আলপনা—এ সকলই ইহাদের কলা-প্রেমেব পবিচয় দেয়।

খাদ্যের পর্য্যায়ে মাংস-মাখন এবং বস্ত্রেব জন্য উল-পশম ভোটীয়েব পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। সেই জন্য এদেশে কৃষি অপেক্ষা পশুপালন অধিকতব উপযোগী। ভেড়া, ছাগল ও চমবী (য়াক্) এখানকাব প্রধান গৃহপালিত পশু। ভেড়া ও ছাগল—মাংস,চামড়া ও পশমেব সংস্থান ভিন্ন ভারবহনকার্য্যেও উপযোগী, বিশেষতঃ দুর্গম স্থলে। চমরী দুধ, মাখন, মাংস ও মোটা পশম দেয়, উপবন্তু উনিশ-কুড়ি হাজাব ফুট উচ্চে—যেখানে বায়ুমণ্ডল অতি ক্ষীণ—বিলক্ষণ বোঝা লইয়া অনায়াসমন্থবগতিতে সেই সকল দুর্গম পর্ব্বতে যাইতে পাবে। এদেশে ঘোড়া, অশ্বতর ও গাধা বিস্তর আছে, কিন্তু ভেড়ার পরই চমবী এদেশেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পশু। এদেশে রেল, মোটর বা অন্য যান নাই, সুতরাং সকল জিনিষই পশুপৃষ্ঠে লইতে হয়। ঘোড়াগুলি ছোট বটে, কিন্তু পর্ব্বত-পথের বিশেষ উপযোগী এবং সতেজ ও সুন্দর। অশ্বতররা মঙ্গোলীয়া ও চীনদেশের সীলিঙ্গ অঞ্চল হইতে আসে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে কুকুরের স্থানও



তিব্বতের একটি দৃশ্য

আত উচ্চে। পশুপালকের প্রধান সহায় এই বিশ্বস্ত জন্তু। এদেশের অধিকাংশ কুকুরই কৃষ্ণবর্ণ ও নীলচক্ষু। আকারে ইহারা নেকড়ে অপেক্ষা বৃহৎ, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভল্লুকের ন্যায় লম্বা কর্কশ লোমে আবৃত এবং ইহারা স্বভাবতঃই হিংস্র। পশুপালকদিগের পক্ষে কুকুর অত্যাবশ্যক এবং গৃহাদির রক্ষণাবেক্ষণে ইহারা অতুলনীয়। একটি কুকুর সঙ্গে থাকিলেই গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, কেননা অপরিচিত লোকের সাধ্য নাই তাহার এলাকায় পা দেয়। তিব্বতে আগন্তুকের পক্ষে এইরূপ কুকুরের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিব্বতীয়েরা মাংসের সঙ্গে অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া সূপ করিয়া খায়; সুতরাং সকাল-সন্ধ্যায় সামান্য সত্তু-গোলা খাইয়া এই সকল প্রভুভক্ত কুকুর দিবারাত্র রক্ষণকার্য্য করে। শিকলে বাঁধা বাঘের মতই ইহারা ভীষণ এবং ইহাদের নিকট যাওয়া বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করার মতই বিপজ্জনক। এই সকল বৃহৎ রক্ষী-কুকুর ছাড়া লোমাবৃত ছোট ও সুন্দর কুকুর লাসা ও অন্যস্থানের ধনীদিগের গৃহে থাকে। এখানে তিন টাকায় যে কুকুর পাওয়া যায়, দার্জ্জিলিঙে ষাট-সত্তর টাকায়ও তাহা পাওয়া দুষ্কর।

* * * * *

নেপাল ও তিব্বতের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। ঐ সময় ভোটরাজ স্রোঙ-চন্-গম্বো এক দিকে নেপালে নিজ বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সেখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, অন্য দিকে চীন-সাম্রাজ্যের বহু প্রদেশ তিব্বতের অধীনে আনিয়া এবং চীন-সম্রাটকে কন্যাদানে বাধ্য করিয়া চীন-রাজকুমারীকেও পরিণয়পাশে আবদ্ধ করেন। শোনা যায়, ইহার পূর্ব্বে ভোটদেশে লিখনপদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল, স্রোঙ-চন্ সম্ভোটাকে অক্ষর-লিখন শিক্ষার জন্য নেপাল প্রেরণ



তিব্বতে নেপালীদের একটি সমাবেশ

করেন এবং তিনিই সেখানে উহা শিক্ষা করিয়া প্রথম তিব্বতী অক্ষর নির্ম্মাণ করেন। নেপাল-রাজকুমারার সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে প্রবেশ করে এবং ক্রমে রাজনৈতিক জয়কে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরাজয়ে পরিণত করে। আজিও নেপাল-দুহিতা তারাদেবী এদেশে অবতারের ন্যায় পূজা পাইতেছেন। তিব্বতের সভ্যতার দীক্ষায় প্রধান সহায়ক যে নেপাল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নেপাল-উপত্যকার পুরাতন অধিবাসী নেবারদিগের ভাষা তিব্বতী ভাষার অনুরূপ এবং ভাষাতত্ত্ববিদেরা উহাকে তিব্বত-বর্ম্মা ভাষার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিব্বতী "সিউ মা রী" (কেহ নাই) নেবারীতে "সু-মারো"। ইঁহাতে অনুমান হয় যে তিব্বত ও নেপালের সম্বন্ধ প্রাগৈতিহাসিক।

সম্রাট স্রোঙচন লাসায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহার শতবর্ষ পরে ভোটরাজ স্রোঙ-দে-চন্ নালন্দা হইতে আচার্য্য শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারত হইতে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাহা দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিজয়ে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতির ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত অবারিত ছিল। সে-সময় বর্ত্তমান কালের দার্জ্জিলিং-লাসা পথ জানা ছিল না। ধর্ম্মপ্রচার বা বাণিজ্য ব্যাপার সবই নেপালের পথে হইত এবং এইরূপে বহু শতাব্দী যাবৎ নেপাল ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও বাণিজ্য এই দুই কার্য্যেই নেপাল মধ্যবর্ত্তী রূপে বিরাজ করিয়াছে। সংস্কৃত হইতে ভোট ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদে নেপালী পণ্ডিতদিগের হাত, ভারতীয় বা কাশ্মীরা পণ্ডিতদিগের মত সিদ্ধ না হইলেও শান্তিভঙ্গ, অনন্তশ্রী, জেতকর্ণ, দেব পুণ্যমতি, সুমতি-কীর্ত্তি প্রভৃতি নেপালী বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নাম স্মরণীয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে বহু গ্রন্থের, বিশেষতঃ তন্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও অধিক পরিচয় না পাওয়ার কারণ বোধ হয় সে সময় ভারত হইতে উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত পাওয়া সহজ ছিল।

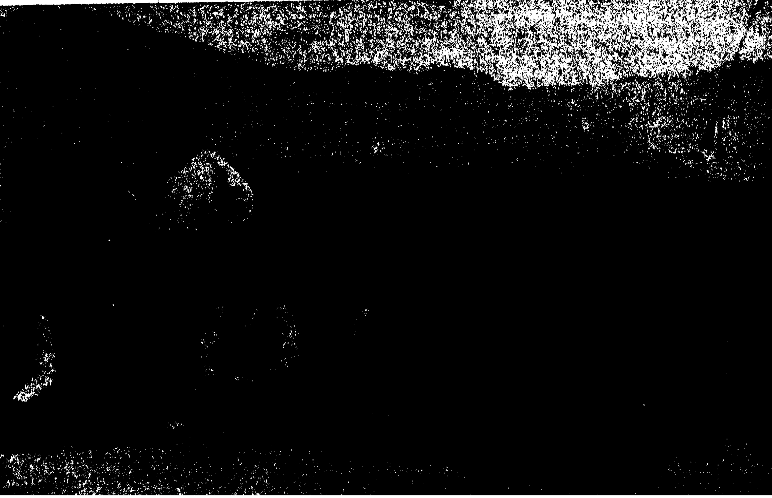
ইহাতে সন্দেহ নাই যে লাসায় রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে নেপালী বণিকেরা আসে। তিব্বতের ইতিহাসের প্রধান উৎস ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ধর্ম্মগ্রন্থে বাণিজ্য-ব্যাপারের স্থান বড় নাই, সুতরাং ইহাদের বিশেষ উল্লেখ তাহাতে পাওয়া সম্ভব বা স্বাভাবিক নহে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের ক্যাপুচিন সম্প্রদায় ১৬৬১ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাসায় প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের পাদরীদিগের বৃত্তান্তে সেকালের নেপালী সওদাগরদিগের লাসায় থাকার কথা এবং কয়েকজন নেপালীর খ্রীষ্টান হওয়ার কথা লিখিত আছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ "মিশন" লাসায় ঐ পাদরীদিগের গীর্জ্জার একটি ঘণ্টা হস্তগত করে। ঐ বৃত্তান্ত লিখিত হওয়ার

৪৫ বৎসর পরে নেপালী সওদাগরদিগের উপর অত্যাচারের অভিযোগেই নেপালরাজ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন।

আজকাল তিব্বতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেপালী ব্যাপারীদিগের কয়েকটি বিশেষ অধিকার আছে। ঐ সকল অধিকার ১৭৯০ এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে দুই বার নেপাল-তিব্বতে যুদ্ধ হয় তাহারই ফল। প্রথম যুদ্ধে নেপালী সৈন্যদল গিরিসঙ্কট জয় করিয়া লাসা হইতে সাত দিনের পথ দূরে শীগর্চীতে (টশী-লুন-পো) পৌছায়। এমন সময় অগণিত চীন-সেনা তাহাদের আক্রমণ করিয়া হটাইতে হটাইতে নেপালে কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ায় নেপাল ও তিব্বত উভয়েই চীন-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া শান্তিস্থাপন করে। এই যুদ্ধ-বিজয় উপলক্ষে উৎকীর্ণ চীন-সম্রাটের অনুশাসন এখনও লাসায় পোতলার (দালাই লামার প্রাসাদ) সম্মুখে বর্ত্তমান। নেপালের বর্ত্তমান মহামন্ত্রী-বংশের সংস্থাপক মহারাজা জঙ্গ্ বাহাদুরের সময় (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধকালে নেপালরাজের সেনাদল সীমান্তস্থিত গিরিসঙ্কট পার হইবার পূর্ব্বেই চীন-সম্রাটের মধ্যবর্ত্তিতায় কয়েকটি সর্ত্তে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ভারত-সরকারকে প্রতিবর্ষে নেপালরাজসদনে দশ হাজার টাকা দিতে হয়। শান্তিস্থাপনের সর্ত্ত-মধ্যে এই চারিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) বিপদকালে পারস্পরিক সাহায্যের অঙ্গীকার, (২) ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপারীদিগের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার, (৩) লাসায় নেপালী রাজদূত নিয়োগের ব্যবস্থা এবং (৪) তিব্বতে নেপালী ন্যায়াধীশের দ্বারা নেপালী প্রজার বিচারের অধিকার। এইরূপে, ইয়োরোপীয়েরা চীনদেশে যে-অধিকার পরে লাভ করে এবং যাহা দূর করিতে সম্প্রতি চীন এত চেষ্টা করিতেছে, তিব্বতে নেপাল ঠিক সেইরূপ বহির্দ্দেশীয় প্রভুত্ব (extra territorial rights) লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে লাসায় নেপালী ব্যবসায়িগণ দশটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের এক-এক জন সর্দ্দার নির্ব্বাচিত হইত, এবং প্রত্যেকটি সঙ্ঘের একটি করিয়া বৈঠকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই দলপতিদিগের নাম "ঠাকুলী" ও বৈঠকের স্থানের নাম "পালা"। যদিও সংখ্যায় এখন সাতটি মাত্র সেই "ঠাকুলী" আছে এবং যদিও দুইয়েরই পূর্ব্ব-মাহাত্ম্য বা অধিকার হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি তাহাদের "পালা" এখনও বর্ত্তমান। লাসার নেপালী বণিকেরা প্রায় সকলেই তান্ত্রিক-বৌদ্ধ, সুতরাং এই সকল পালায় তাহাদের তান্ত্রিক পূজার স্থান আছে এবং সেই হেতু প্রায় প্রত্যেকটিতেই লাসায় লিখিত শত শত বৎসরের পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি দশ-বিশখানি করিয়া আছে। এখন নেপাল-সরকারের পক্ষ হইতে লাসায় একজন

রাজদূত (বকীল), একজন ন্যায়াধীশ (ডিঠা) এবং কিছু সৈন্য আছে। ইহা ছাড়া গ্যাঞ্চী, শীগর্চী, নেনয়ু (কুতী) ও কেরঙ্ তেও নেপালী প্রজার বিচার ও তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য এক-এক জন ডিঠা আছে। নেপালী বলিতে কেবলমাত্র নেপালী ব্যবসায়ী বুঝায় না, উপরন্তু তাহাদের ভোটীয়-রক্ষিতা-জাত সন্তানদিগকেও ধরা হয়। এইরূপে লাসায় খাঁটি নেপালীর সংখ্যা দুই শতের অধিক না হইলেও, সেখানকার নেপালী প্রজার সংখ্যা কয়েক হাজার। নেপালের নিয়ম অনুসারে নেপালীর পুত্র জন্মাইলেই সে নেপালের প্রজা, যদিও এইরূপ ভোটীয়া স্ত্রীর বা



তিব্বতে নেপালের কয়েকজন ব্যবসায়ীর আস্তানা

স্ত্রীর পুত্র-কন্যার তাহার সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার নাই। নেপালী সওদাগর ইচ্ছা করিলে কিছু দিতে পারে নতুবা তাহাদের প্রাপ্য কিছুই নয়। সন্তান জন্মাইবার পর পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়া স্ত্রীকে দূর করিয়া দেওয়া নেপালী সওদাগরদিগের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার। তিব্বতে বহুভর্তৃক বিবাহের প্রচলন থাকায় ভোটীয় পুরুষের সহিত ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করাও তিব্বতের নেপালী বাসিন্দাদিগের সাধারণ প্রথা। নেপালের রাজ-নিয়ম অনুসারে কোন নেপালী তাহার স্ত্রীকে তিব্বতে লইয়া যাইতে পারে না, এই কারণেই এত দুর্নীতির সৃষ্টি। অন্য অনেক বিষয়েও এখানে আগন্তুক নেপালী দেশের আচার-ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপারের কথা বলা যাইতে পারে। নেপালে ছুঁৎমার্গের জ্ঞান যথেষ্ট আছে, এখানে সে বালাই দেখা যায় না; অবশ্য মদ্যপান-বিষয়ে দুইটি দেশের লোকের মধ্যে

প্রভেদ দেখা যায় না। পাচক তো ভোটীয়া হয়ই, উপরন্তু মুসলমানের রুটি খাওয়ায় ইহাদের কোন আপত্তি নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নেপালী ব্যবসায়ী চমরীর মাংস খাইতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাহারা বলে, চমরী "গাই" নহে—যদিও নেপালে ইহা সম্ভব নহে। এই সকল ব্যাপারই নেপালে ভয়ানক অপরাধ বলিয়া গণ্য। সাধারণতঃ এই সব ব্যবসায়ীর পক্ষে তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে দেশে ফিরিবার সুযোগ হয় না, এবং ফিরিবামাত্রই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে সকলেই বাধ্য।

নেপালী নেবারগণ ব্যবসায়ে বিশেষ পটু। যদিও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অভাবে ইহারা সুযোগ-অনুরূপ ব্যবসায়ের প্রসার করিতে পারে নাই, কিন্তু এই দেশের যানবাহন আদান-প্রদানের অবস্থার কথা ভাবিলে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে, ইহাদের ব্যবসায়নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কলিকাতায় নেপালী সওদাগরদিগের অধিকাংশ কুঠির শাখা আছে, অনেকের শীগর্চী, গ্যাঞ্চী, ফরি-জোঙ, কুতী ইত্যাদি স্থানেও শাখা আছে। এই ব্যবসায়ের আদান-প্রদানের মধ্যে আমদানী—প্রবাল, মুক্তা, বারাণসী ও চীনের রেশমী বস্ত্র, বিলাতী ও জাপানী সূতার কাপড়, কাচের দ্রব্য, খেলনা প্রভৃতি। রপ্তানীর হিসাবে "ফর্", কস্তুরী, উল, পশম এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য আমদানীর জিনিষ-গুলির উৎপত্তিস্থলের সহিত কারবারের উপায় না জানায় ইহারা কলিকাতায় সে সব কিনিয়া এখানে বেচে। ইহাদের সৌভাগ্য যে সেরূপ উদ্যোগী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে নাই, কেননা এখানকার মুসলমান ব্যাপারীদিগেরও কারবারের ধারা এই প্রকার। চীনের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে-সঙ্গে চীনা ব্যাপারীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে তো এদেশে প্রবেশ করাই অসম্ভব।



তিব্বতে সম্ভ্রান্ত নেপালীদ্বয় ও তাঁহাদের মধ্যে একজনের ভোটীয় স্ত্রী

• নেপালী ব্যবসায়ীর মধ্যে এমন কিছু সাধনা আছে যাহাতে সে অল্প পরিশ্রমেই উন্নতি করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধর্ম্মমান সাহুর কুঠির কথা বলা যায়। এই কুঠি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে লাসায় স্থাপিত হয়, এখন ইহার শাখা গ্যাঞ্চী, ফরি, কাঠমাণ্ডু, লদাখ ও কলিকাতায় আছে। প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার আমদানী-রপ্তানী ইহাদের বাঁধা ব্যাপার, মূলধনের প্রমাণও প্রচুর। ইচ্ছা করিলেই চীন, জাপান, মাঙ্গোলিয়া, চীনা তুর্কিস্থান, সিংহল ইত্যাদি স্থানে ইনি কারবার চালাইতে পারেন, কিন্তু সেদিকে চেষ্টা বা উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেপালীরা অতি সৎ এবং ইহাদের ব্যবহার ভাল। উপরন্তু ধর্ম্ম একপ্রকার হওয়ায়, ইহারা লামাদিগকে সম্মান করে এবং মঠে ও মন্দিরে পূজাপাঠ ও দক্ষিণা প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে ইহারা ভোটীয়দিগের মতই। এই সকল কারণে এবং ইহারা 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধ হওয়ায়, এদেশে ইহাদের স্থান ভারতে মাড়োয়ারীর বা সিংহলে গুজরাটি মুসলমানের তুল্য। বেশভূষা ও খাদ্য-প্রকরণেও পূর্ব্বে ইহারা ভোটীয়দিগের অনুকরণ করিত। সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে একদল "নবীন" হ্যাট-কোট-বুট ইত্যাদি পরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

* * * * *

১৯০৪ সালের ব্রিটিশ মিশনের পর হইতে তিব্বতের প্রধান বাণিজ্য-মার্গ কালিম্পং (দার্জ্জিলিঙের নিকট) হইতে লাসার পথে হইয়াছে। ইহা গ্যাঞ্চী পর্য্যন্ত ইংরেজের রক্ষণাধীন এবং গ্যাঞ্চীতে ব্রিটিশ ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। গ্যাঞ্চীর পর ভোট-সরকারের নিজস্ব ডাক, টেলিফোন ও তার বিভাগ আছে। কিছু চা ও চীনা রেশমী কাপড় ভিন্ন প্রায় সমস্ত আমদানী-রপ্তানী এই পথেই হইয়া থাকে। এই পথের এক দিকে (পশ্চিমে) কিছু দূরে নেপাল, অন্য দিকে (পূর্ব্বে) কিছু দূরে ভুটান। লাসায় নেপালী উকীলের মত ভুটানেরও উকীল থাকে। তিব্বতী ও ভুটানী ভাষা অত্যন্ত নিকট-সম্পর্কিত; ইহাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মপুস্তক এক। ভুটান হইতে কালিম্পং, লাসার পথ ও লাসা উভয়ই নেপাল অপেক্ষা অনেক নিকটে এবং বাণিজ্যব্যাপারে নেপাল ও ভুটান দুইয়েরই অধিকার এক প্রকার। এ সকল সুবিধা সত্ত্বেও ভুটানীরা যে তিব্বতের সহিত ব্যবসায়ে নেপালীদিগের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধির অভাব। ভুটানীদেরও প্রধান ব্যবসায়ক্ষেত্র তিব্বতে, কিন্তু নেপালী ও লদাখী মুসলমানদিগের মত দোকানপাট ইহাদের কিছুই নাই। ইহারা নিজেদের দেশের জিনিষ লাসার বাজারে আনে এবং তাহার বিনিময়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই দেশের পথ দেখে। ইহাদের বাণিজ্যে

বিনিময়ের বস্তু প্রধানতঃ একদিকে আসাম ও ভুটানের এণ্ডী রেশম, অন্যদিকে তিব্বতী পশম ও উলের কাপড়।

লাসার বাজারে শীতের দিনে দেশ-বিদেশের লোক দেখা যায়। উত্তরে মঙ্গোলিয়া-সাইবিরিয়া, পূর্ব্বে চীন ও পশ্চিমে লদাখ এবং নিজ-তিব্বতের প্রতি কোণ হইতে লোকজন ঐ সময় লাসায় আসে। ভুটানীরাও এ সময় অনেকে এখানে আসে। বিশাল দেহ, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে মুণ্ডিত শির, দীর্ঘ চোগা ও নগ্ন পদ (বিশেষ শীত ছাড়া)—দূর হইতেই তাহাদের জাতিত্ব নির্ণয় করিয়া দেয়। ভোটীয় ভাষায় ভুটানী-দিগের নাম ব্রুগ্-পা (চলিত উচ্চারণে ডুগ্পা) ও তাহাদের ভাষার নাম ব্রুগ্-য়ুল। ভুটানীরা ধর্ম্মে ঘোর তান্ত্রিক এবং তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মে এক সম্প্রদায়ের নাম ডুগ্পা। লাসায় ভুটানী দূতাগার ও ফৌজ দুই-ই আছে, কিন্তু প্রজার সংখ্যা ও কার্য্য-পরিমাণ অনেক কম বলিয়া নেপালী দূতাগারের সহিত তাহার তুলনা হয় না।

* * * * *

তিব্বতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট স্রোঙ-চন্-গম্বো নেপালবিজয় ও নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার কন্যা তারাদেবীকে বিবাহ করার পর হইতে এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ইতিহাস ও বাণিজ্যের ধারার সহিত সমানে চলিয়া আসিতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে নেপালের মহারাজ জঙ্গবাহাদুর তিব্বতে যুদ্ধাভিযান করেন। এই অভিযানের প্রারম্ভে বহু সাফল্যলাভ সত্ত্বেও চীন-সম্রাট মধ্যস্থ হওয়ায় জঙ্গবাহাদুরকে নিবৃত্ত হইতে হয়, তবে ইহার ফলে অন্য বহু অধিকারের সহিত নেপাল প্রতি বৎসর ভেটস্বরূপ ৪০ হাজার টাকা তিব্বত হইতে পাইয়া থাকে। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত এই দুই দেশের সম্বন্ধ মৈত্রীপূর্ণই আছে, কিন্তু ১৯২৯ সালে কয়েকটি ঘটনায় ইহাদের মধ্যে এরূপ মনান্তর হয় যে, যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে।

নেপালীদিগের বক্তব্য ছিল যে, (১) ভোটীয় অফিসর ও সেনাগণ অকারণ নেপালীদিগের উপর উৎপাত করে। উদাহরণ স্বরূপ, তাহারা বলে যে নেপালের পূর্ব্বপ্রান্তের নিকটস্থ ধনকুটা নামক স্থানের ভোটীয় প্রজাগণ ভোটীয় সৈনিক ও অফিসরের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া দেশ ছাড়িয়া নেপালের সীমানার ভিতরের এক গ্রামে গিয়া বসতি করে। ইহার পর নেপাল-সরকারকে না জানাইয়া ভোটীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণ সীমানা পার হইয়া ঐ গ্রাম লুট ও সেখানকার নূতন পুরাতন সকল প্রজার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে। (২) গ্যাঞ্চীতে নেপালী দূতাবাসের একজন সিপাহীকে কোন তিব্বতী প্রজা হত্যা করে, কিন্তু বহুবার বলা সত্ত্বেও ভোট-সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। (৩) তিব্বতে কারবারী নেপালী মাত্রেরই তিব্বতী স্ত্রী আছে, এবং নেপালীগণ নিজ অবস্থামত তাহাদিগকে সুখে-স্বচ্ছন্দে

রাঁখে। লাসার রাজকর্ম্মচারিগণ নেপালীদিগকে বিশেষভাবে জব্দ করার জন্য এই সকল স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করাইয়া তাহাদিগের দ্বারা সরকারী গৃহনির্ম্মাণের জন্য পাথর বহাইয়াছে। (৪) নেপালের উত্তর অঞ্চলে বহু ভোটভাষা-ভাষী প্রজা আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়কার্য্যে তিব্বতে বাস করে। বাহ্যদেশিক অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য তিব্বতী কর্ম্মচারিগণ ক্রমাগত তাহাদিগকে তিব্বতী প্রজারূপে গণনা করেন। এইরূপ ব্যবহারের জ্বলন্ত উদাহরণ-স্বরূপ লাসার শর্বা-গেল-পো ব্যাপারীর কথা তাহারা বলে। শর্বা-গেল-পো ধনী ও উন্নতিশীল ব্যবসায়ী ছিল। নেপালীদিগের মতে সে নেপালের প্রজা এবং সে নিজেও ঐ ধারণায় প্রবৃত্ত হইয়া ভোট দেশের উচ্চ কর্ম্মচারীর এবং পরাক্রান্ত লোকদিগের সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিত। ঐ সকল পরাক্রান্ত লোক এইরূপ টীকা-টিপ্পনীর বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কিছুদিন পরে ইহারা চক্রান্ত করিয়া দলাই লামার কাছে আবেদন করে যে, শর্বা-গেল-পো ভোট রাজ-সরকার সম্বন্ধে কটুকাটব্য করিয়াছে। সেই সঙ্গে উহাবা শর্বার জন্মস্থানবাসী কয়েকটি শত্রুকে হাত করিয়া তাহাদের দিয়া বলায় যে, শর্বা বস্তুতঃ ভোট-প্রজা, নেপালী নহে। ফলে শর্বা তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার ও ভোটীয় কারাগারে আবদ্ধ হয়। লাসার নেপালী রাজদূত এ-বিষয়ে ভোট-সরকারকে বুঝাইতে অসমর্থ হওয়ায়, নেপাল-সরকার স্বয়ং জানান যে শর্বা নেপালী প্রজা। ভোট-সরকার তাহার উত্তরে বলেন যে, সে ভোট-প্রজা; সুতরাং তাহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেপাল-সরকারের নাই। ইহাতে নেপাল-সরকার ভোট-সরকারকে শর্বার জন্মস্থানে নিজে কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাহার প্রজাস্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। ভোটরাজ এই অনুরোধ অবহেলা করেন এবং ইতিমধ্যে শর্বা প্রায় দুই বৎসর জেলে পচিতে থাকে।

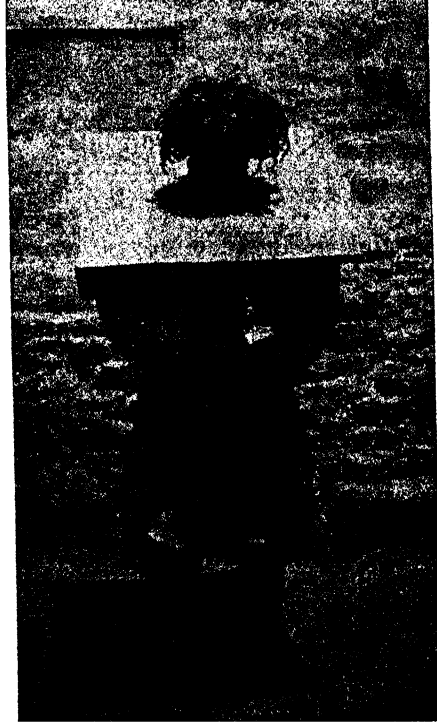
১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি লাসায় পৌঁছাই, সে সময় শর্বা জেলে বা গারদে আবদ্ধ ছিল। আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিপাহী-রক্ষিগণ অসাবধান থাকায় সে পলাইয়া নেপালী দূতাবাসে আশ্রয় লয়। ১৪ই আগষ্ট আমি নেপালী দূতের সহিত দেখা করিতে গিয়া আঙ্গিনায় এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষকে ঘুরিতে দেখি, শুনিলাম সে-ই শর্বা-গেল-পো। সর্বার পলায়নে যে-সকল ভোট-রাজপুরুষ তাহার উপর অপ্রসন্ন ছিল, তাহারা বিশেষ লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রথমে তাহার রক্ষী সিপাই ও কর্ম্মচারীদিগের দণ্ড দেন, এবং পরে মহাগুরুর (দলাই লামার) নিকট আবেদন-অনুরোধের চূড়ান্ত করেন। ফলে নেপাল রাজদূতের নিকট আদেশ আসে যে, "শর্বাকে এই মুহূর্ত্তে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর।"

পনরো

শর্বাকে ভোট-সরকারের হস্তে অর্পণ করার কড়া হুকুম আসিলে নেপাল-রাজদূত নাচার অবস্থায় পড়িলেন। লাসায় ছোটবড় প্রায় এক শত নেপালী কারবার আছে, তাহাদের মালিকের দল এই ঘটনার ফেরে মহা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বক্তব্য ছিল যে, যদি শর্বাকে সমর্পণ করা না হয় তবে ভোট-সরকার জোর-জবরদস্তি করিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে নেপাল রাজদূত ও তাঁহার অনুচরদিগকে ধরিতে-বাঁধিতে অথবা মারিতে হয়ত কিছু সময় লাগিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য নেপালী প্রজার ধন-প্রাণ দুই-ই শেষ হইতে এক প্রহরও লাগিবে না। এই রকম অবস্থায় ২৩শে আগষ্ট প্যারেড-কালে ভোটীয় সৈনিকদিগের নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। সহরে রাষ্ট্র হইয়া যায় যে, সৈন্যেরা নেপাল দূতাবাসে শর্বাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছে। আর যায় কোথায়? মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত নেপালী সন্ত্রস্ত ও ব্যস্তভাবে দোকানপাট বন্ধ করিয়া ছাদে উঠিয়া লুটপাট ও অত্যাচারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে সময়ের কথা বলিবার নয়। আমি নিজে নেপালীদিগের সঙ্গে ছিলাম এবং অধিকাংশ লোকেই আমাকে নেপালী বলিয়া জানিত। সুতরাং আমি নিজে নেপালীদিগের মনের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।

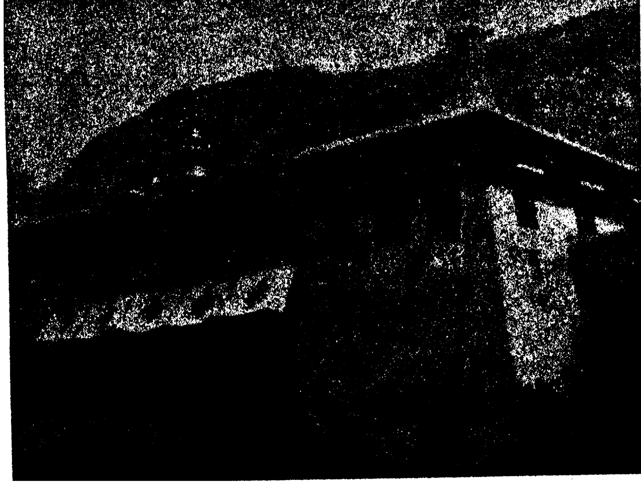
বেলা দুইটার সময় দোকানপাট বন্ধ হইল। আমাদের লোকজন যেন মহাপ্রলয় আগতপ্রায় ভাবিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। যাহা হউক, সেই দিন ও রাত বিনা উপদ্রবে কাটিয়া গেলে, পরদিন আবার দোকান খোলা হইল। এই ভাবে অনিশ্চিতের মধ্যে কয়দিন কাটিল। ২৭শে আগষ্ট বেলা বারটায় আমি ছু-শিং-শর (যে কুঠিতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম) দোকানের ছাদে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম দক্ষিণ দিক হইতে দোকানের সারি দ্রুত বন্ধ হইয়া আসিতেছে। যে-সকল নরনারী পথের উপর বেসাতি বিছাইয়া ছিল তাহারা কোন প্রকারে নিজেদের জিনিষপত্র উঠাইয়া ঘরের দিকে ছুটিতেছে, কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর্য্যন্ত সময় পাইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে কোন সরকারী লোকের কাছে শোনা গেল যে, শর্বাকে ধরিতে নেপালী দূতাবাসে ভোট সৈন্যদল গিয়াছে। শুনিয়াই নেপালীরা বলিল এইবার লুট আরম্ভ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় সকল নেপালী সওদাগরই বৌদ্ধ এবং সেই কারণে ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন অনেক ভোটীয় বন্ধু আছে যাহারা ভয় অপেক্ষা ভরসারই পাত্র। কিন্তু লুট করে গুণ্ডায়, সুতরাং লুটের সময় সে-সব বন্ধু নিজেদের সম্পত্তি সামলাইতেই ব্যস্ত থাকিবে, তখন নেপালী বন্ধুদের সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইবে কে?

সন্ধ্যার মুখে সঠিক খবর পাওয়া গেল যে, নেপাল-রাজদূত শর্বাকে ভোট-সরকারের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার সশস্ত্র চেষ্টা করেন নাই। চারিদিকে রাজদূতের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা শোনা গেল। দুই-তিন শত নেপালীকে সজ্জিত করার মত গোলাবারুদ ও বন্দুক রাজদূতের হাতে ছিল, বস্তুতঃ চেষ্টা করিলে নেপাল-রাজদূত তাঁহার পঁচিশ-ত্রিশজন সৈনিক এবং এই দুই-তিন শত অন্য নেপালী প্রজার সাহায্যে ভোট-সরকারকে বিলক্ষণ বেগ দিতে পারিতেন, কেননা নেপালীরা ভোটীয়দিগের তুলনায় অনেক অধিক যুদ্ধকুশল এবং দূতাবাস সহরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাহার উপর গোলা চালাইলে সহরের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী: এ অবস্থায় সহস্রাধিক নেপালী প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করিয়া করা যায় ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান সমস্যা। শর্বাকে কিছুকালের জন্য বাঁচাইতে এতগুলি প্রজার ধনে-প্রাণে সর্ব্বনাশ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং শর্বাকে ভোটীয়দিগের হস্তে অর্পণ করা হইল। তাহার উপর শাস্তিবিধান হইল দুই শত বেত্রাঘাত। বেতের আঘাতে তাহার দেহ কাটিয়া মাংস পর্যান্ত উঠিয়া গেলেও জ্ঞান যতক্ষণ ছিল সে একবারও শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া কাতরতা প্রকাশ করে নাই। এইরূপ নির্দ্দয় প্রহারের ফলে ১৭ই সেপ্টেম্বর শর্বা-গেল-পো মারা যায়।


তিব্বতী কষেদী, লাসা

এদিকে লাসার বাজার বন্ধ হওয়ায় কেবল সহরে নয় দূরস্থ অঞ্চলেও নানা প্রকার গুজব রটিয়া উপদ্রবের আশঙ্কা বাড়িতেছিল। শর্বা পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার হওয়ার পর সহরের কর্তৃপক্ষ কড়া হুকুম জারী করিলেন যে, দোকান বন্ধ করিলে বা গুজব রটাইলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। এই বিজ্ঞাপনের ফলে বাজার আর বন্ধ হইল না। এদিকে পূর্ব্ব হইতেই উভয়পক্ষের রণসজ্জা হইতেছিল, এখন তো যুদ্ধ আসন্নপ্রায় দেখা

গেল। তিব্বতে সংবাদপত্র নাই, সমস্ত খবরই মুখে-মুখে প্রচারিত হয়। তবে ইহা বলিলে ভুল হইবে না যে, এইরূপ উড়া-খবর বিলাতী খবরের কাগজের খবর অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ৩১শে আগষ্ট সংবাদ আসিল যে, নেপাল ও তিব্বতের এই বিবাদে সিকিমের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মধ্যস্থ হইতে আসিতেছেন। পরদিন শোনা গেল যে, দলাই লামা তাঁহাকে তিব্বত-প্রবেশের অনুমতি দেন নাই। আমি দর্জ্জীর দোকানে শীতবস্ত্রের বরাত দিতে গিয়া শুনিলাম, ভোট-সরকার সহরের যত জিন কাপড় খরিদ করিয়া লইয়াছেন। সহরে জোর গুজব রটিল যে, চীন ও রুষ তিব্বতের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছে। নেপাল হইতে খবর পাওয়া গেল যে ধনকুটা, কুতী, কোরোং প্রভৃতি অঞ্চলে যে চারটি পথে তিব্বতে প্রবেশ করা যায়, সে-সকল পথ মেরামত করাইয়া সৈনিকদিগের ছাউনি ফেলা হইয়াছে এবং অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লাগাইবার জন্য টেলিগ্রাফের তার ও থাম মজুত রাখা হইয়াছে।



লাসা সহরের একটি অংশের দৃশ্য

লাসা সহরের কথা আর বলিবেন না! রোজ সকাল দশটায় রাজপথে পল্টনের কুচকাওয়াজ চলিয়াছে। সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল বর্ণনার অতীত। প্রায় সকলেই ইউরোপীয় সৈন্যের পরিত্যক্ত রাইফেলে সুসজ্জিত, কিন্তু দেখা গেল বন্দুক ছুঁড়িবার সময় সকলেই চক্ষু বুজিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। ছোট ছেলের দল তো সারাদিনই পথে পথে "রাইট-লেফ্‌ট" করিয়া বেড়াইতেছে, আবার সৈন্যদের মধ্যেও দুই-তিনজন করিয়া

স্থানে স্থানে এইরূপ "রাইট—লেফ্ট" চালাইতেছে। এই মন্ত্রে ইহাদের এত আস্থার কারণ এই যে, ভোট-সৈন্যদলের যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার ভোটীয় প্রোফেসরবর্গ প্রায় সকলেই গ্যাঞ্চীতে দুই-তিন সপ্তাহ থাকিয়া পাশ্চাত্ত্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত (!) করিবার সময় ইহা শিক্ষা করিয়াছে। এদিকে কলিকাতা হইতে প্রত্যেক নেপালী কুঠিতে প্রত্যহই লাসা ছাড়িয়া যাইবার জন্য "তার" আসিতে লাগিল। ২০শে সেপ্টেম্বর ছু-শিং-শর কুঠির অধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিরত্নমান সাহু লাসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ও যাইবার কালে ছোট ভাই ও অন্য সকলকে বলিয়া গেলেন যে, অমুক সঙ্কেতযুক্ত তার পাইলেই সকলে যেন চলিয়া যায়, কুঠি বা দোকানে যে লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী আছে তাহা রক্ষা করিবার কোন চেষ্টায় তাহারা যেন দেরি না করে। এই মরসুমে লাসায় মঙ্গোলীয়া হইতে বহু মুসলমান সওদাগর আসে, শোনা গেল যে এইবার তাহারা বিক্রয়েব জন্য যত অশ্বতর আনিয়াছিল, সবই ভোট-সরকার স্বয়ং ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

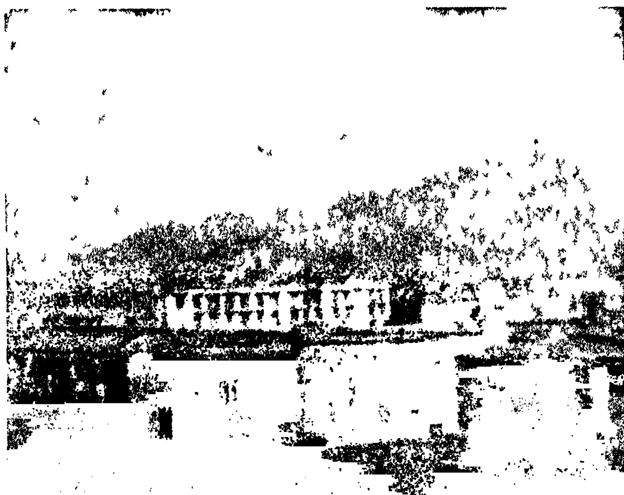
৩রা অক্টোবর শুনিলাম ফৌজের জন্য লাসায় লোক-গণনা চলিয়াছে।

এদিকে দুই সরকারে তারযোগে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। অক্টোবরের গোড়ায় ত্রিরত্নমান তাহার ভাইকে সব ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার জন্য কলিকাতা হইতে তার-যোগে খবর পাঠাইলেন। ভাই জ্ঞানমান সাহু যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু এদিকে থাকিলে কি ভীষণ ব্যাপার হইতে পারে তাহাও স্পষ্টই বুঝিতেছিলেন। ইতিমধ্যেই কিছু সৈন্য নেপাল সীমান্তে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ছোটবড় জায়গীরদারদিগের জমিদারী-অনুযায়ী লোক-লস্কব আসিতেছিল। তিব্বতে কৃষিযোগ্য জমির প্রায় সবই এইরূপ জায়গীরে বিভক্ত এবং যুদ্ধের সময় এই সব জায়গীরদার (তাহাদের মধ্যে অনেক মঠাধিকারীও আছে) নিজেদের এলাকার আয়তন মত সেপাই যোগাইতে বাধ্য। ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ অভিযানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এইরূপ জায়গীরের সেপাই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে আনিয়াছিল, কিন্তু সে অস্ত্রশস্ত্র আজকালকার যুদ্ধের উপযোগী নহে জানিয়া এখন অস্ত্র-সরবরাহের ভার খোদ ভোট-সরকারই হাতে লইয়াছেন। যাহা হউক এই ফৌজের সেপাই দেখিয়া পুরাণ-বর্ণিত বাবা ভোলানাথ মহাদেবের পল্টনের কথা মনে পড়িল। কোথাও ষাট বৎসরের পিতামহ বন্দুক কাঁধে চলিয়াছেন, তাঁর পাশেই নাতির বয়সী পনেরো বছরের ফাজিল ছোকরা, কাহারো পরনে ছেঁড়া চোগা, পায়ে শততালিযুক্ত বিলাতী গোরার বুট, কেহবা এই শীতের মধ্যে চাল দেখাইবার জন্য খাঁকী রঙের পল্টনী পুরানো সুতী কোট-প্যাণ্টের সঙ্গে ছেঁড়া ভুটীয়া জুতা পরিয়া চলিয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর কয়েকটি পল্টন সামান্তে চলিয়া গেল। প্রতি দশ-দশজন সেপাই-

পিছু একটি তাঁবু ও চায়ের জন্য বিরাট তামার পাত্র দেওয়া হইল। একজন ভোট-ফৌজী অফিসর বলিলেন, "লাসায় যে-সকল সৈনিক আছে, তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উৎসুক এবং এখানে থাকায় অসন্তুষ্ট।"

আমি বলিলাম' "ইহাদের বীরত্ব প্রশংসনীয়, মৃত্যু ইহাদের নিকট নববধূতুল্য।" তিনি বলিলেন, "ছাই বীরত্ব। ইহারা জানে লাসা হইতে তিন চারি দিনের পথ গেলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চম্পট দেওয়া সহজ। এখানে থাকা-খাওয়ার কষ্ট, পলাইলে লুটপাটের সুবিধা আছে। এদেশে পুলিশ পাহারাও নাই, সুতরাং নিজ ঘরে ফিরিলে পরে পলাতক সেপাই গ্রেপ্তার হইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমদেশের লোক পূর্ব্বদেশে পলাইলে তাহাদের চিনিবেই বা কে, ধরিবেই বা কে?"



লাসা সহরের সম্ভ্রান্ত অংশের অপর একটি দৃশ্য

২০শে নবেম্বর সিংহল হইতে ভদন্ত আনন্দের পত্রে পড়িলাম, তিব্বতের এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থা শুনিয়া আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য্য উপাধ্যায় শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাস্থবির আনন্দকে খবর লইতে বলিয়াছেন যে, আমাকে লাসা হইতে লইয়া যাইবার জন্য এরোপ্লেন পাঠানো সম্ভব কিনা। আমি বন্ধুদের বলিলাম, "মন্দ হয় না, যদি এখানে হাওয়াই জাহাজ আসে। এদেশের লোককে রেলগাড়ী কি ব্যাপার বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় তাহা এক প্রকার ঘরবাড়া যাহা দৌড়াইতে পারে। যাদুর খেলা ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া এরোপ্লেন তো বুঝাইতে পারা যাইবে না।"

ভোট-সরকারের টেলিগ্রাফের মেরামতাদি কার্য্যে সাহায্যের জন্য ভারতীয়

ডাক-বিভাগের একজন অফিসর শ্রীযুক্ত রোজমেয়র এই সময় লাসায় ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় একদিন বলিলেন যে, ভারত সরকার তাঁহার এই দুই বন্ধুর মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে দিবেন না। কথাটা সঙ্গত, কিন্তু এক দিকে চীন ও রুষের নিকট সাহায্যলাভের স্বপ্নে বিভোর হইয়া ভোট-সরকার ব্যাপার গুরুতর করিয়া তুলিতেছিল, অপর দিকে এই সব প্রতিকূল আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নেপালরাজ তিব্বতের উপর প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ঘটনার স্রোত মোটেই মিটমাটের দিকে ছিল না। রুষের সাহায্যের প্রসঙ্গে আমি একদিন এক ভোট-রাজকর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলাম, "সে দেশের সঙ্গে আপনাদের তো তার বা ডাকের কোন ব্যবস্থা নাই, কাজে এই আপনাদের চিঠি মস্কো পৌঁছিতে পৌঁছিতে নেপালীরা সারা তিব্বতে ছুটিয়া বেড়াইবে।"

এদিকে গুজবের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। একবার খবর রটিল যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে। বীরগঞ্জ (নেপাল) হইতেও এক টেলিগ্রাম আসিল, "নেপালের সঙ্গে সম্বন্ধ উত্তম, কোন ভয় নাই, কাজ চালাও।" সকল নেপালী এই



লাসা সহরের একটি সঙ্কীর্ণ অংশ

খবর পাইয়া আশ্বস্ত হইতেছে, এমন সময় আবার সংবাদ আসিল যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। ইতিমধ্যে নেপালের মহামন্ত্রী মহারাজা চন্দ্র শমসের স্বর্গারোহণ করিলেন। এক সপ্তাহ পরে ২রা ডিসেম্বরে এ-খবর লাসায় পৌঁছিতে সহরময় বলাবলি চলিল, "দেখেছ লামাদের মন্ত্রবল, কি ভয়ানক পুরশ্চরণের ক্ষমতা।" তাহার পরেই ভারতে মহাসমরের সময় সৈনিকেরা যেমন স্টেশনের মিঠাইয়ের ঝুড়ি লুট করিয়াছিল, লাসার সৈনিকেরাও

তেমনিই আরম্ভ করিল। একজন সেপাই খাওয়ার পরে খাবারের দোকানে পয়সা না দিয়া চলিয়া আসিতেছিল, দোকানী দামের প্রশ্ন তুলিতেই দেশরক্ষক বীর তাহার পেটে ছোরার আঘাত দিয়া প্রশ্নের উত্তর দিল।



লাসার বাজার

১৯৩০ সালের ১৮ই জানুয়ারী শোনা গেল যে, চীন-রাষ্ট্রপতির পত্র লইয়া দূত আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঁচ-শ সৈনিকের শোভাযাত্রার এবং যেরূপ পূর্ব্বকালে চীন-সম্রাটের পত্রবাহী দূতের জন্য করা হইত তদ্রূপ নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিলাম, পত্রে তিব্বত ও চীনের সহস্র বৎসরের সম্বন্ধের কথা তুলিয়া পুনর্বার সে-সম্বন্ধ দৃঢ় স্থাপনের জন্য ন্যানকিন-এ প্রতিনিধি পাঠাইবার কথা বলা হইয়াছে। এক সপ্তাহ পরে এক ভোটীয় কুমারী চীনের সাহায্যবার্ত্তা লইয়া আসিলেন। ইনি জাতিতে তিব্বতীয়া হইলেও চীনের প্রজাতন্ত্রের (কুয়োমিণ্টাঙ্গের) সদস্য ছিলেন। মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিব্বতীয়েরা কি হইতে পারে, ইনি ছিলেন তাহারই নিদর্শন।

এখন চীনের এই ভাব ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল। বহির্জগতে খবর পৌঁছান সম্ভব যদি না হইত, তবে নেপালীরা তিব্বত জয় করিলে কিছু হইত না, কিন্তু এখন ঐরূপ ঘটিলে চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রে রটিবে যে নেপাল ইংরেজেরই অস্ত্রবিশেষ, সুতরাং ঐরূপ ব্যাপারে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। ৭ই ফেব্রুয়ারী খবর আসিল যে, দুই বিবাদীর মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকার সরদার-বাহাদুর লে-দন-লাকে পাঠাইতেছেন। এদিকে সন্ধি ও যুদ্ধের উদ্বেগ-উচ্ছ্বাসে তিন মাস কাটিয়াছে; ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধির প্রমাণ আরও পাওয়া গেল, যখন লাসা হইতে বাহিরে যাইবার সকল পথে সৈনিক পাহারা বসিল এবং কড়া হুকুম জারী হইল যে, কোন নেপালী প্রজা লাসার বাহিরে যাইতে পারিবে না। এতদিন পথে বন্দুক-হাতে সিপাহী চলিতেছিল, এখন তোপ কামান

দেখা দিল। গ্যাঞ্চী, শীগর্চী সকল সহরেই এই অবস্থা, সে-কথা পরে জানা গেল। লাসার নেপালীরা এতদিন সন্ধির আশায় এদেশ ছাড়ে নাই, নেপাল ও কলিকাতা হইতে লাসা ত্যাগের জন্য জরুরী আদেশ-অনুরোধ সবই তাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, এখন অবস্থা দেখিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিল। ভোটীয়েরা বলিতে লাগিল, "চীনাদূত যখন আসিয়াছে তখন আর ভয় কি? আমরা এখন আর অসহায় নই।"

আজ শুনিলাম লে-দন-লা লাসা হইতে দুই দিনের পথ চুশুর পৌছিয়াছেন, কিন্তু সন্ধির কোন আশা দেখা গেল না। শোনা গেল মহাগুরু (দলাই লামা) পূর্ব্বেই লে-দন-লার উপর অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন সন্ধির কথা দূরে থাক তাহার সহিত দেখা করিতেও স্বীকার হইলেন কিনা সন্দেহ। নেপালীরা অদৃষ্টের উপর সকল বরাত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল। অপর দিকে খবর আসিল যে, নেপালের নূতন রাণা ভীম শমসের ফাল্গুনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় দিয়া তিব্বতের কাছে জবাবদিহি তলব করিয়াছেন।



লাসা সহরের একটি বিস্তৃত পথ

১৬ই ফেব্রুয়ারি সরদার-বাহাদুর লে-দন-লা লাসায় পৌঁছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় শোনা গেল, তিনি তিন ঘণ্টাকাল মহাগুরুর সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার পর ভোট-মন্ত্রিদলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। তারপর প্রতিদিনই এইরূপ মহাগুরুর সহিত বাক্যালাপের খবর আসিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধির কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। সে বৎসর ১লা মার্চ্চ, মাঘী-প্রতিপদে ভোটীয় নব-বৎসর আরম্ভ হইল, কিন্তু লোকের মুখে বা মনে কোন আশার ছায়া পাওয়া গেল না। চারিদিকে অন্ধকারই দেখা গেল।

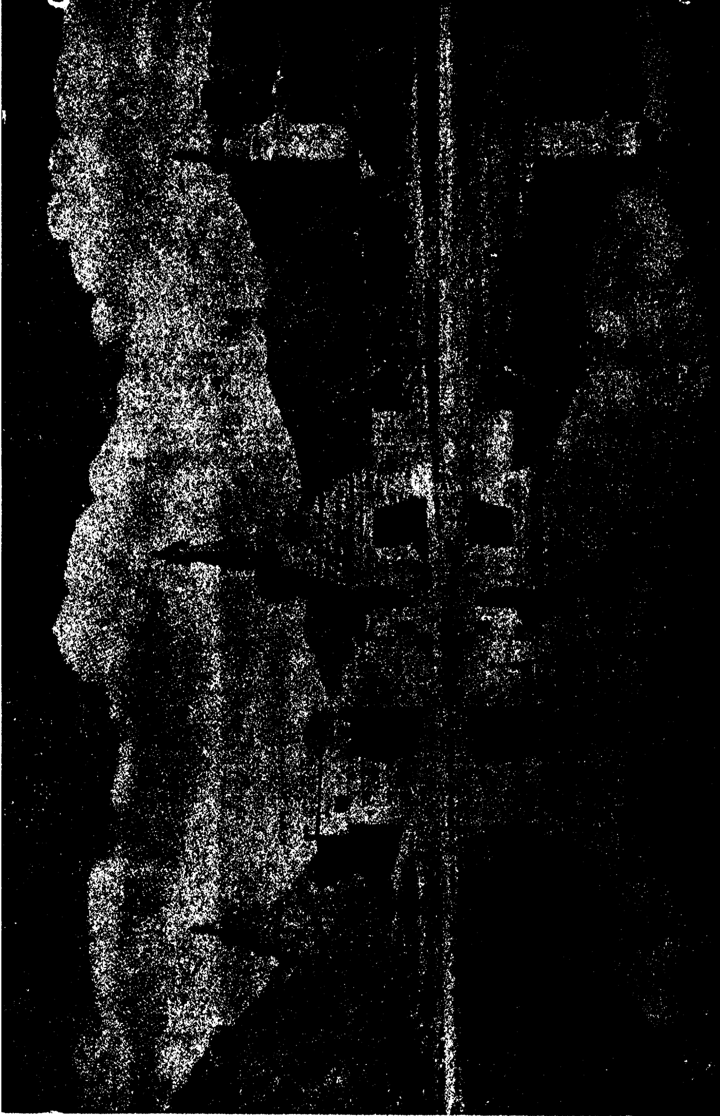
১১ই মার্চ্চ শুনিলাম, সরদার-বাহাদুরের চেষ্টা সফল হইয়াছে, ভোট-সরকার নেপাল-রাজকে সন্ধিপত্র পাঠাইতেছেন, কিন্তু ১৬ই মার্চ্চ শুনিলাম তিনি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। পরদিন সে খবরও খণ্ডিত হইল। ১৮ই মার্চ্চে আমার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম, "যুদ্ধের সম্ভাবনাই অধিক, তবে বহু বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন সন্ধি হইবে।" ১৯শে মার্চ্চ নেপালী ব্যাপারীদের কাছে কলিকাতা হইতে অনুরোধ আসিল, "সমস্ত ছাড়িয়া যে-কোন উপায়ে পলাইয়া আইস।" সব-শেষে ২২শে মার্চ্চ ভোট-সরকার ঘোষণা করিলেন যে, সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এই ঘোষণায় নেপালী প্রজাদের আনন্দের অবধি রহিল না। ৩০শে মার্চ্চ পথ-ঘাট খুলিয়া দেওয়া হইল।

তিব্বতে এই সাতমাসব্যাপী যুদ্ধের বাদল কাটিবার প্রধান কারণ সরদার-বাহাদুর লে-দন-লার যোগ্যতা ও ধৈর্য্য। তিব্বতীয়দিগের কার্য্যকলাপ, বিচারক্ষমতা, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ছিল, উপরন্তু তিনি জাতি ও ধর্ম্মে সিকিমী ভোট, সুতরাং তিব্বতীয় জাতির নাড়ীজ্ঞান তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তাহাদের সকল বিশেষত্বও তাঁহার জানা ছিল। যে-সময় তিনি লাসায় আসেন, সে-সময় যুদ্ধ অনিবার্য্য বলিয়াই সকলে জানিত এবং তিনি যে সন্ধি-স্থাপনে সমর্থ হইবেন এ-কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই। তিনি তিব্বতে না আসিলে কি হইত জানি না, কিন্তু সাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা ও অপরাধী কর্ম্মচারীদের দণ্ডদান আদি নেপালরাজ-নির্দ্দিষ্ট সন্ধি-সর্ত্তসমূহ যে ভোট-সরকার স্বীকার করিতেন না ইহাতে সন্দেহ নাই। লে-দন-লা ইংরেজ হইলে 'নাইট' খেতাব পাইতেন এবং বহুতর পারিতোষিক যে তাঁহার করতলগত হইত ইহা নিশ্চয়, কেননা এই সন্ধি না হইলে চীন-রুষ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজের মনোমালিন্য ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আমি এই সকল ঘটনার বিবরণ যাহা দিয়াছি তাহা অন্য পাঁচজনের মতই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কেবল প্রভেদ এই ছিল যে, "অন্ধের দেশে কানা রাজা" হিসাবে প্রত্যহই অনেকে আমার পরামর্শ লইতে আসিত। যাহা হউক, এই সন্ধির ফলে সহস্রাধিক নেপালী প্রজা এবং তাহাদের সঙ্গে আমিও ধনে-প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম।

* * * * *

আমি লাসায় উপস্থিত হই ১৯২৯ সালের ১৭ই জুলাই এবং ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল ঐ রহস্যময়ী নগরী ছাড়িয়া চলিয়া যাই। মহাগুরু দলাই লামার নিকট হইতে লাসায় থাকিবার অনুমতিলাভের পর আমার লেখাপড়ার কাজ আরম্ভ হয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল এদেশে তিন বৎসর থাকিয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়া চীন জাপান ঘুরিয়া দেশে ফেরা। তিব্বতে আসিবার পূর্ব্বে পুস্তকের সাহায্যে এদেশের ভাষা কিছু শিখিয়াছিলাম এবং লাসার পথে শুধু ভোট ভাষায় কথাবার্ত্তা চালাইতে

চেষ্টা করায় এদেশের কথ্য-ভাষার উপর কিঞ্চিৎ অধিকারও জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল লিখিত ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত কবা। কেনা না, তাহার মধ্যেই

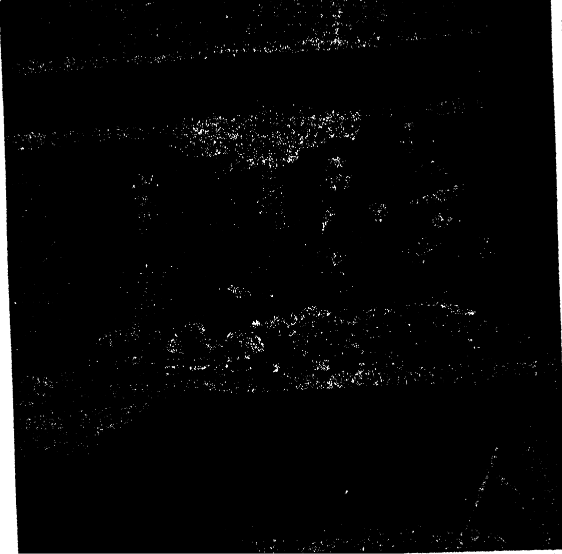


লাসার উত্তর ধারে একটি প্রাচীন বিহারের স্তূপ

আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষাব অনেক প্রাচীন অমূল্য বত্ন সুরক্ষিত আছে। সুতরাং আমি ঠিক করিলাম যে, যে-সব গ্রন্থেব সংস্কৃত ও তিব্বতী উভয় সংস্করণই পাওয়া যায়,

সেইগুলি প্রথমে পড়িয়া ফেলিব। আমার কাছে বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থের সংস্কৃত সংস্করণ ছিল, তাহার ভোটীয় অনুবাদ ক্রয় করিতে একদিন বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এক জায়গায় কতকগুলি লোক পুঁথির রাশি লইয়া বসিয়া আছে। ইহারা পর্-বা অর্থাৎ ছাপাওয়ালা এবং পুস্তকবিক্রেতা।

মুদ্রণ-প্রথার প্রথম আবিষ্কার হয় চীনদেশে। শীলমোহরের পদ্ধতিতে কাঠের ফলকে অক্ষর খোদাই করিয়া বোধ হয় ইহার সূচনা হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভোট-সম্রাট স্রোঙ-চন-গম-পো চীন-রাজকন্যাকে বিবাহ করিলে চীন ও তিব্বতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি সে সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং তাহার ফলে বেশভূষা, পানভোজন আদি সমস্ত আধিভৌতিক ব্যাপারে তিব্বত চীনদেশের নিকট ততটা ঋণী—আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ভারতের নিকট তাহার ঋণ যতটা। এই ঘনিষ্ঠতার পথেই তিব্বতে চৈনিক ছাপার বিদ্যা আসে। ইহা তিব্বতীয়েরা কোন্ সময় আয়ত্ত করে তাহা বলা কঠিন, তবে বিশ লক্ষ শ্লোকযুক্ত কঞ্জুর (ব্ কঙ্-হগ্যুর=বুদ্ধবচন-অনুবাদ) এবং তঞ্জুর (স্তন্-হগ্যুর=শাস্ত্র-অনুবাদ) নামক দুই বিরাট সংগ্রহ (দুই এক হাজার শ্লোক ভিন্ন যাহাদের সমগ্র অবশিষ্ট অংশই ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ) পঞ্চম দলাই লামা সুমতিসাগর (খৃঃ ১৬১৬-১৬৮১) কাষ্ঠফলকে খোদাই করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আজকাল প্রায় সকল মঠেই ঐরূপ মুদ্রণ-ফলক আছে। সামান্য দক্ষিণা দিলেই পর্-বা অর্থাৎ মুদ্রাকরগণ নিজেদের পরিশ্রম, কাগজ ও কালির খরচে সেইগুলি হইতে পুস্তক ছাপিতে পায়। ইহারাই পুস্তক বিক্রেতা। জো-খঙ নামে লাসার প্রধানতম ও প্রাচীনতম মন্দিরের উত্তর দ্বারের পাশে ঐরূপ কুড়ি-পঁচিশটি পর্-বার দোকান আছে।



একটি তিব্বতীয় মঠে বহু পুঁথিপত্রের সংগ্রহ

ভোট-সাহিত্য অধ্যয়নের সময় আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে পাঠের

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও ভোট শব্দ-প্রতিশব্দ সংগ্রহ করিব, পরে যাহাতে ভোট-সংস্কৃত মহাকোষ লিখিতে পারি। ১৩ই আগষ্ট হইতে ঐ কার্য্য আরম্ভ করিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই বোধিচর্য্যাবতার, স্রগ্ধরাস্রোত্র, ললিতবিস্তার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, অমরকোষ প্রভৃতি আটখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলাম। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক আমার ছিল, অন্যগুলির হস্তলিখিতপ্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি ছু-শিঙ-শাকে মন্দিরে পাই। তখনও আমার সূত্র, বিনয়, তন্ত্র, ন্যায় প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক এবং বহু শত ছোট-বড় নিবন্ধ দেখা বাকী, কিন্তু যথাসময়ের পূর্ব্বেই আমাকে ভারতে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। আমার শব্দকোষে পঞ্চাশ হাজার শব্দ-সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল, পনরো হাজার শব্দ মাত্র তখন সংগ্রহ হইয়াছে, যদিও কোন মুদ্রিত তিব্বতী-ইংরেজী কোষে এত শব্দ এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।

শব্দ-সংগ্রহের সময় আমি কঞ্জুর ও তঞ্জুর দেখিতে আরম্ভ করিলাম। লাসা নগরের মরু-মঠের কর্ম্মনিষ্ঠা প্রসিদ্ধ। ইহা চোঙ-খ-পার গদীতেআসীনগঠি-রিন্-পোছের অধীন। আমি মঠের হস্তলিখিত তঞ্জুর পাঠের অনুমতি পাইয়া সেখানে গেলাম। কিন্তু একে পুস্তকাগার অন্ধকার, তাহার উপর অক্টোবরের শীতে সর্দ্দি-কাশি সুরু হইল, সুতরাং দুই-তিনদিন সেখানে যাইবার পরই গ্রন্থগুলি নিজের বাড়ীতে লইবার অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি পাইলে পনেরা-কুড়ি খণ্ড করিয়া পুস্তক ঘরে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম। সমগ্র সংগ্রহ ২৩৫টি বেষ্টনীতে বদ্ধ।

আমার আশ্রয় ধর্ম্মমান সাহুর গৃহে তাহার বৈঠকখানার পাশে ছিল। বহুদিন থাকিতে হইবে জানিয়া আমার নিকট খরচ গ্রহণ করিতে সাহুকে রাজী করাইলাম। আমার ঘরটিতে সকালের রোদ আসিত, সুতরাং অপেক্ষাকৃত গরম ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শীতের প্রকোপ বুঝিয়া লাসার পুরানো বাজার হইতে ২০-৩০ সাং দিয়া একটি মঙ্গোলীয় পোস্তীন কিনিলাম, ভিতরে ছাগলের বাচ্চার লোমযুক্ত চামড়া, বাহিরে মোটা লাল চীনা-রেশম কাপড। যতই মোটা হউক এখানকার শীতের পক্ষে পশমী কাপড় তুচ্ছ। ঐ পোস্তীনের উপর মোলায়েম লম্বা পশমযুক্ত চুকটু, মাথায় উলের কানটোপ—এই সবে দেহের শীত নিবারণ হইল বটে, কিন্তু অক্টোবর-শেষের দারুণ শীতে আঙুল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। উটের পশমের মঙ্গোলীয় দস্তানা পরিয়া লেখাপড়া চলিত। ডিসেম্বরের দ্বিপ্রহরে তাপমান ৪০° ফারেনহাইট মাত্র উঠিত, জানুয়ারীর মাঝামাঝি তাহা ২০° ডিগ্রিতে দাঁড়াইল। দিনে-দ্বিপ্রহরে এইরূপ শীত, রাত্রে কিরূপ হইত বুঝিতেই পারেন। জল তো জমিয়াই যাইত, ফাউন্টেন পেন ব্যবহারের পূর্ব্বে লেখাও অসম্ভব হইয়া উঠিল, কেননা শীতে দোয়াতের কালি জমিয়া থাকিত। অক্টোবরেই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল এবং

মাসখানেকের মধ্যে বৃক্ষলতাগুল্ম সব শুকাইয়া গেল, শ্যামলতার লেশমাত্রও দেখা যাইত না।

* * *

তিব্বতের রাজধানী লাসা এখন ব্রিটিশ, রুষ ও চীন রাজনীতির লীলাক্ষেত্র। লাসার সে-রা, ডে-পুঙ প্রভৃতি মঠে রুষ-এলাকার মঙ্গোলরা বাস করে, তাহাদের সকলে বা অধিকাংশই যে রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যস্ত সে কথা বলা চলে না। তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাহাদের দ্বারা রাজনীতির গুপ্ত-চাল চলিতে পারে। আমি যে-সময় লাসায় ছিলাম সেই সময় একজন রুষ-মোঙ্গল অতিশয় আড়ম্বরের সহিত তথায় জীবনযাপন করিতেছিল, পরে জানিয়াছিলাম যে সে 'শ্বেত' রুষ, 'লাল' বলশেভিক নহে। ব্রিটিশ-সরকারের তরফে একজন রায়-বাহাদুর প্রকাশ্যে এবং আরও অনেকে গুপ্তভাবে চরের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। লাসায় পৌঁছিবার পরই প্রকাশ করিয়াছিলাম যে আমি ভারতীয়, চিঠিপত্রেও আমার সকল কথাই সোজা ভাবে লেখা থাকিত, সুতরাং আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে দেরি হইল না। তবে আমি ছিলাম সাংস্কৃতিক বিদ্যার্থী, সুতরাং তিব্বতীয়দের সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চা করার সময় বা ইচ্ছা আমার হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত রোজমেয়র সাহেবও প্রথম-সাক্ষাতে আমি কি করিতেছি সে-সম্বন্ধে বহু প্রশ্নাদি করেন, কিন্তু পরে তিনি আমার প্রতি সজ্জনের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আমাকে পর্‌সি-ল্যাণ্ডনের সদ্য-ছাপা "নেপাল" গ্রন্থের দুই খণ্ড ধার দিয়া ঋণী করিয়াছিলেন। উক্ত প্রামাণ্য পুস্তকে আমি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া উপকৃত হই।

মহাসমরের পূর্ব্বে তিব্বতীয়েরা যখন চীনাদিগকে বিতাড়িত করে, তখন সে-দেশে ইংরেজের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। তাহারও কিছুদিন পূর্ব্বে দলাই লামা লাসা ছাড়িয়া ভারতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সে-সময় ইংরেজ সরকার তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। এই সকল ব্যাপারের জন্য দলাই লামা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকায় ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজ এ-দেশে অতি প্রভাবশালী ছিলেন। চীনাগণ বিতাড়িত হইলেও ভোটবাসিগণ জানিত যে, চীনারা যখন নিজের দেশের ব্যাপার হইতে মুক্ত হইয়া এদিকে নজর দিতে পারিবে, তখন তাহাদের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য হইবে। সেই দিনের প্রতীক্ষার মাঝে পুলিস ও ফৌজ শক্তিশালী করিবার এক চেষ্টা হয়। পুলিসের ব্যবস্থা করিতে সর্দ্দার-বাহাদুর লে-দন-লা দার্জ্জিলিং হইতে এখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। চীন আম্বান (রাজ-প্রতিনিধি) যে য়া-মী প্রাসাদে ছিলেন, তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পূর্ব্বে এ দেশে পুলিসের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সর্দ্দার-বাহাদুরকে উর্দ্দী অর্থাৎ ইয়ুনিফর্ম্ম হইতে

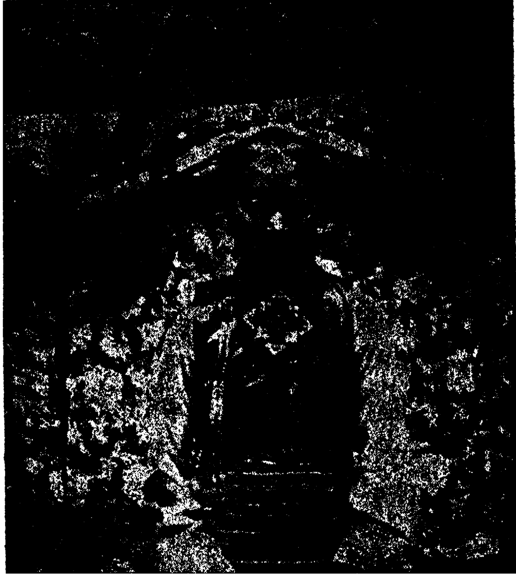
আরম্ভ করিয়া সকল জিনিষের গোড়াপত্তন করিতে হয়। যাহা হউক, পুলিসের ব্যবস্থা করিতে এতটা ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় নাই, বিপদ হইল সেনাদল সংগঠনে। তিব্বত বিরাট দেশ, কাশ্মীর হইতে চীন, এবং বর্ম্মা হইতে রুষ ও চীনা-তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত ইহার সীমা বিস্তৃত, এ-হেন এলাকার রক্ষার জন্য কমপক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সৈন্য আবশ্যক। প্রাচীন প্রথা ছিল যুদ্ধের সময় জায়গীরদারদিগের সিপাহীদলগুলির একত্র সমাবেশ করা, কিন্তু আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত চীনা-সৈন্যের সম্মুখে সেরূপ 'পাড়াগেঁয়ে' ভূতের সমষ্টি কয় মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু সেনাদলকে সুশিক্ষিত ও সংগঠিত করিতে যে অর্থবলের প্রয়োজন তাহাই বা আসে কোথা হইতে? সমস্ত দেশের জায়গা-জমি ছোট-বড় জমিদারীতে বিভক্ত, অধিকাংশ বড় জায়গীর মঠগুলির অধিকারে। মঠ হইতে টাকা চাওয়ায় তাঁহারা জানাইলেন যে, ধর্ম্মকর্ম্ম পূজাপর্ব্বের খরচই তাঁহারা কুলাইতে পারেন না, টাকা দিবেন কিরূপে? এই উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া ভোট-সরকার চাপ দেওয়ায় মঠের অধিকারিগণ খোঁজ লইয়া বুঝিলেন এ-কার্য্য ইংরেজ-রাজদূতের প্রেরণায় হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইংরেজ-প্রীতির স্রোত তৎক্ষণাৎ বিপরীতমুখী হইল, সার্ চার্লস বেল এক বৎসর লাসায় থাকিয়া বিফল হইয়া ফিরিলেন। এদিকে টাকার জন্য জোর তাগিদের ফলে ভোট-সরকার ও টশী লামার মধ্যে মনান্তর হওয়ায়, টশী লামা (পন-ছেন-রিম্পোছে) দেশ ছাড়িয়া চীনদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন, আজিও তিনি প্রবাসে আছেন। ব্রিটিশ-সরকার ভোট-ফৌজের জন্য মহাযুদ্ধে পরিত্যক্ত কয়েক সহস্র পুরানো রাইফেল সরবরাহ করিয়াছিলেন, এখনও তাহার সম্পূর্ণ দাম পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

সর্দ্দার-বাহাদুর পুলিসগঠনে এত দিন কোন বাধা পান নাই, এখন এই বিপরীত হওয়ার ঝাপটা তাঁহাকেও ব্যস্ত করিল। পুলিসদল সুসজ্জিত করিবার জন্য তিনি তাহাদের লম্বা টিকি কাটাইয়াছিলেন। ভোটদেশে লামাগণ মুণ্ডিতকেশ, অন্য সকলেই মধ্যযুগের ইউরোপীয় বা উনবিংশ শতাব্দীর চীনাদের মত বেণী ধারণ করে, সুতরাং এক অজ্ঞাত কবি গান বাঁধিলেন "লেদন লামা ম-রে—পু-লিস্ ডাবা ম-রে—য়া-মী গোম্বা ম-রে—ট-শর…" ইত্যাদি, অর্থাৎ "লে-দন্ লামা নহেন, পুলিসেরা ভিক্ষু নহে, য়া মী প্রাসাদ মঠও নহে, তবে চুল কাটান কি কারণে?" এইরূপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান-গীতের সুরে দেশ ছাইয়া গেল। ভোটদেশে খবরের কাগজের বদলে এইরূপ গানের পালায় সরেস খবর সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। লাসার শো-গঙ নামে এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনী বংশ আছে। তাহার বর্ত্তমান কর্ত্তা লাসায় সরকারী 'দে-পোন' অর্থাৎ জেনারেল ছিল। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও শো-গঙ অন্যতে আসক্ত হয়। তাহার স্ত্রী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সমাজে ও

আদালতে টানাটানি করিয়া শো-গঙকে সর্ব্বস্বান্ত করে। পূর্ব্বেকার রাজসিক ঠাট ছাড়িয়া লাসার এক কোণে একটি ছোট বাড়ীতে সেই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া শো-গঙ দিন কাটাইতে থাকে। এই সময় কোন গুপ্ত কবি সমস্ত ব্যাপারটিকে গানের পালায় বাঁধিয়া সাধারণে প্রকাশ করে। সমাজে ও আদালতে এত টানাটানি সত্ত্বেও শো-গঙ অম্লানবদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু পথে-ঘাটে ঐ গানের গর্‌রায় তাহার পক্ষে বাড়ীর বাহির হওয়া পর্য্যন্ত কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

* * * * *

লাসার ডাকঘর ও তার-ঘর একই ভবনে অবস্থিত। যেখানে এই বাড়ীটি আছে সেখানে পূর্ব্বে স্তন্‌-দ্‌গে-গ্লিং নামে প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। উক্ত মঠের এবং বর্ত্তমান অন্য তিনটির (কুন্‌-লদে-গ্লিং, ছে-মো-গ্লিং, ছে-ম্‌ছোগ-গ্লিং) মোহন্তগণ দলাই লামার নাবালক অবস্থায় ভোটদেশ-শাসনের অধিকার পায়। বিগত চীন-ভোট যুদ্ধের সময় এই মঠের মোহন্ত চৈনিকদের সাহায্য করে, ফলে মোহন্তের প্রাণদণ্ড এবং প্রত্যেকটি ইট খুলিয়া মঠের অস্তিত্ব লোপ করা হয়। একদিন তার-ঘরে গিয়া খবর পাইলাম তাহার পাশে লাসার রাজবৈদ্য (এবং লাসার বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ) থাকেন। দেখা করিয়া বুঝিলাম তিনি জ্যোতিষী ও সারস্বতে অধিকারী। ইনি তখন বাৎসরিক পঞ্জিকার কাষ্ঠ-ফলক খোদাই করাইতে-ছিলেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, যদিও, সংস্কৃত ভাষার এক অক্ষরও ইঁহার জানা নাই, তবুও সারস্বতের সমস্ত সূত্র এখনও ইঁহার কণ্ঠস্থ। এইরূপ আর এক বিদ্বানের সহিত আলাপ হইয়াছিল যাঁহার সমস্ত চান্দ্র-ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ।



তিব্বতী রমণীর বিচিত্র শিরোভূষণ

ডে-পুঙ মঠ আগেই দেখা হইয়াছিল, ১২ই অক্টোবর সে-রা মঠ দেখা স্থির করিলাম। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এক মাস এদেশে ঘুড়ি উড়াইবার সময়। এ-

ব্যাপারে নেপালীরা বিশেষ পটু, বোধ হয় তাহারাই এ-খেলা এদেশে অনিয়াছে (কিম্বা চীনদেশ হইতে এই দুই দেশই শিখিয়াছে)। এদেশে আমাদের দেশের মত প্রত্যেক খেলার বিভিন্ন মরশুম আছে। ঘুড়ি কাটা গেলে তাহা ধরিতে সকলে ছুটাছুটি করে। একদিন শুনিলাম ঐরূপ ঘুড়ি ধরায় এক ঢাবা (সাধু) ও এক সিপাহীতে ঝগড়া হওয়ায় সিপাহীপ্রবর ঢাবাকে এক পাথরের আঘাতে চিরদিনের জন্য ক্ষান্ত করিয়াছে।

সে-রা মঠ লাসা হইতে তিন মাইল উত্তরে। ফসল কাটা শেষ হইয়াছে, শূন্য মঠের পাশ দিয়া চলিলাম। স্থানে স্থানে চমরী ও বলদ দিয়া মাড়াইয়া শস্যের তুষ ছাড়ানো হইতেছে। ভোটবাসী সাধারণতঃ প্রসন্ন-মন, সুতরাং ফসল ঝাড়া, ঘুড়ি ওড়ানো, চা প্রস্তুত করা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই গানের ঢেউ উঠিতেছে।

শস্যের ক্ষেতের সারি পার হইবার পূর্ব্বেই বিস্তৃত হাতা-যুক্ত এক বিরাট অট্টালিকা দেখা দিল। চীনা শাসনের আমলে ইহা চৈনিক ভিক্ষুদিগের বাসস্থান ছিল। তখন লোকজনে ইহা গম্‌গম্ করিত, এখন নির্জ্জন পুরী। বালুময় প্রান্তর পার হইয়া পাহাড়ের মূলে পৌঁছিলাম, সামনে বিখ্যাত সে-রা বিহার। ডে-পুঙ-এর ন্যায় ইহাকেও পাঁচ-ছয় হাজার লোকের আবাস-যোগ্য ছোট সহর বলা চলে। জম্-যঙ নামে মহান্ চোঙ-খ-পার এক শিষ্য ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডে-পুঙ বিহার নির্ম্মাণ করেন। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্য এক শিষ্য শাক্য-যে-শে সে-রা বিহার স্থাপন করেন। তাঁহার তৃতীয় শিষ্য এবং প্রথম দলাই লামা গেং-দুন্-গ্যাং-ছো ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে টশী-লুন-পো মঠ স্থাপিত করেন।



ঘোটকসহ জনৈক তিব্বতীয় মহিলা

সে-রা মঠে সাড়ে পাঁচ হাজার ভিক্ষুর বাস, তবে ছাত্র-সংখ্যার হিসেবে ইহার স্থান ডে-পুঙের নীচে। এখানে পাঁচজন অধ্যক্ষ (মখন্-পো) আছেন, কিন্তু ড-ছঙ (গ্রব-ছঙ অর্থাৎ বিদ্যালয়খণ্ড) তিনটি মাত্র, 'গ্যে' (গ্যেং-ব্যেস্-ম্‌খস্-মঙ্), 'ম্যে' (স্মদ-

থোস্‌-বসম্‌-গ্লিং) ও 'ঙগ্‌-পা'। সে-রা মঠে ৩৪টি খম্‌-সন্‌ আছে। এই খম্‌-সনগুলি অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির মত। উপর্য্যুক্ত বিদ্যালয় বিভাগগুলির মধ্যে 'গ্যে'তে ২২টি খম্‌-সন্‌ ও 'ম্যে'তে ১২টি খম্‌-সন্‌ আছে। ঙগ্‌-পা-তে বিশাল পাঠশালা আছে, সেখানে বিশেষ তন্ত্র পড়ানো হয়, কিন্তু খম্‌-সন্‌ একটিও নাই। ডে-পুঙ মঠে ঐরূপ ৩৯টি খম্‌-সন্‌ আছে, উহা দুইটি বিদ্যালয় খণ্ডে বিভক্ত। কেম্ব্রিজ বা অক্স-ফোর্ডের কলেজগুলির মতই খম্‌-সনে ছাত্রদের পড়িবার ও থাকিবার স্থান আছে। নিম্নপদস্থ অধ্যাপক-দিগের নাম গে-গ্‌র্থেন (লেক্‌চারার) ও উচ্চ শ্রেণীস্থদিগের নাম গে-শে (প্রোফেসর)। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এলাকায় স্থানে স্থানে চারি দিকে দেওয়ালে-ঘেরা ফলের বাগান আছে, সেখানে বসিয়া ছাত্রেরা পাঠ কণ্ঠস্থ করে, কখনও বা



একটি বৃহৎ বিহারের প্রবেশদ্বার

ধর্ম্মকীর্ত্তির 'প্রমাণবার্ত্তিক' ইত্যাদির শাস্ত্রার্থ বিচার করে। স্মরণ রাখা উচিত, যদিও এই বিহার নালন্দা ও বিক্রমশিলা ধ্বংস হইবার দুই শত বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত তবুও উহাদেরই ছাঁচে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভোট-ছাত্রগণ বিক্রমশিলা মহাবিহারে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিল, সম-য়ে বিহার তো একেবারে উডন্তপুরী বিহারের নমুনায় নির্ম্মিত। এইরূপে উক্ত বিহারকে অনেক বিষয়ে নালন্দা-বিক্রমশিলার জীবন্ত নিদর্শন বলা চলে। আজও পড়াইবার সময় সেখানকার অধ্যাপকবর্গ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-পরম্পরায় প্রাপ্ত বসুবন্ধু দিঙনাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি সম্বন্ধীয় অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। দুঃখের বিষয়, এখন এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অর্দ্ধেক একেবারে নিষ্কর্ম্মা, বাকী অর্দ্ধাংশের শিক্ষা তাহাদের মতিগতি ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়-প্রবেশকালে ছাত্রদের ড-ছঙে নাম লিখাইতে হয় এবং নিয়মিত রূপে সকলের সঙ্গে পানভোজনাদি করিতে হয়,

কিন্তু অধ্যয়নে মন দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। জন কয়েক ছাত্র ও অধ্যাপকের বিদ্যোৎসাহ আছে সন্দেহ নাই, সেটা কিন্তু এখন অপবাদে দাঁড়াইয়াছে। এই সকল ড-ছঙের অধ্যক্ষ খন্-পো'গণ পূর্ব্বকালে যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত হইতেন, কিছুকাল যাবৎ ঐরূপ যোগ্যতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আমার লাসা-বাসকালে সে-রা মঠে একটি খন্-পোর পদ খালি হয়। সে-রা মঠের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ (ন্যায়শাস্ত্রে সে-রা সমস্ত তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে) এক মঙ্গোল গে-শে-কে তাঁহার ছাত্রেরা এই পদের প্রার্থী হইতে বলে। বলা বাহুল্য উমেদার অনেকে ছিলেন, এবং ঐ পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে শাস্ত্রার্থ-প্রতিযোগিতায় মঙ্গোল গে-শেই বিজয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বাচন ও নিয়োগের সিদ্ধান্তের অধিকার স্বয়ং দলাই লামার হস্তে, সেখানে মহাগুরুর মোসাহেবদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। মঙ্গোল বিদ্বান্ তাঁহার ছাত্রদের বলেন যে, তিনি যতদূর উচিত ততটা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উৎকোচ দিয়া খন্-পো হওয়া তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ। শেষে কি হইল জানি না, কিন্তু সকলেই বলিত যে অন্য কেহ রৌপ্য-অর্থবলে শাস্ত্রকে পরাজিত করিয়া ঐ পদ পাইবে। আমি নিজে স্নদ্-ড-ছঙের খন্-পোর নিকট একদিন গিয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত যে খন্-পো নিয়োগে যোগ্যতার কোন প্রশ্ন আসে না।



একটি মঠের একজন মঠাধ্যক্ষ ও তাঁহার দুইজন সহকারী

এখনও এই সকল বিহারে প্রাচীন সভ্যতা এবং সুদীর্ঘ ইতিহাসের সজীব ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যদি ইহাদের ত্রুটি দূর করা যায় তবে এখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়মিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, তখন ইহাদের দ্বারা রাষ্ট্রের সেবা ও উপকার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই হইবে। প্রত্যেক বিহারের অধিকারে বিশাল

জমিদারী আছে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইহাদের অধিকার যথেষ্ট, সুতরাং রাজনৈতিক ব্যাপারেও মঠাধ্যক্ষদিগের পরামর্শের মূল্য কম নহে। বড় বড় মঠের মন্দিরে-দেবালয়ে এক মণ দুই মণ ওজনের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অসংখ্য দীপ দিবারাত্র জ্বলে এবং দেবমূর্ত্তির ভূষণে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের সহিত মণি-মুক্তার রাশি ঝলকিত হইতে থাকে। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, মঠাধ্যক্ষগণ বিষয় ব্যাপারেই সমস্ত সময় না দিয়া যদি অবসরের কিয়দংশও যথাকর্ত্তব্য পালনে ব্যয় করিতেন তাহা হইলে এই বিহারগুলি কিরূপ বিদ্যার আকর হইয়া উঠিত। মঠের বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বিনয়কারিকা, অভিসময়ালঙ্কার, অভিধর্ম্মকোষ, মাধ্যমিকারিকা ও প্রমাণবার্ত্তিকা পড়ানো হয়।

* * *

সে-রা'য় থাকিতে, ১৩ই অক্টোবর খবর পাইলাম যে, রে-ডিঙ মঠের অবতারী লামা এখানে বিদ্যালাভের জন্য রহিয়াছেন। অতিশার প্রধান শিষ্য ডাম-তোন-পা গুরুর মৃত্যুর পর ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মঠ স্থাপন করেন। লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ মঠে ভারত হইতে আনীত সংস্কৃত পুঁথির বেশ বড় রকমের সংগ্রহ আছে; কিন্তু বিশেষ খোঁজ করিয়া জানিলাম মঠের নিকটস্থ প্রস্তর স্তূপের একটি বিশিষ্ট আকার থাকায় লোকে তাহাকেই প্রস্তরময় পুঁথির রাশি বলে। যাহা হউক, এ সমস্যার যথার্থ-সমাধানের জন্য এই অবতারী লামার সঙ্গে আলাপ করিলাম। অবতারী লামার বয়স আঠার-উনিশ বৎসর মাত্র, তাঁহাকে বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া মনে হইল। এদেশে অবতারী লামার শিক্ষাদীক্ষা ভারতের রাজকুমারদের মত হইয়া থাকে। অবস্থা-অনুযায়ী ভৃত্য ও অনুচরবর্গ সহ ইঁহারা মহা আড়ম্বরে জীবনযাপন করেন এবং শিক্ষকের সঙ্গেও রাজকুমারের মতই ব্যবহার করেন, সুতরাং লেখাপড়া কতটা হয় বুঝিতেই পারেন। অবতারী লামা বলিলেন, "পুঁথি বেশী নাই, তবে এক হাত লম্বা ও এক বিঘৎ পরিমাণ একটি মোটা পুলিন্দায় অতিশার স্বহস্ত-লিখিত তালপত্রের পুঁথি আছে; ইহা ডোম-তোন-পা স্বয়ং মঠে দান করেন। আমি দেড় বৎসর বাদে মঠে ফিরিয়া যাইব, আপনি আমার সঙ্গে যদি যান তবে সে সবই আপনাকে দেখাইব।" এতদিনে প্রামাণ্য খবর পাওয়া গেল। যাইবার জন্যও মন উৎসুক হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেড় বৎসরের পূর্ব্বেই আমাকে দেশে ফিরিতে হইল। ঐ পুঁথিগুলি সত্যই যদি অতিশার হাতে লেখা হয়, তবে তন্মধ্যে তাঁহার রচিত হিন্দী গীত থাকাও সম্ভব।

২৪শে নভেম্বর, ভোটীয় দশম মাসের নবমী তিথিতে সে-রা সংস্থাপক জম-যঙের মৃত্যুতিথি ছিল। সে রাত্রে সারা সহরে ও আশপাশের পর্ব্বতগাত্রে বহু দীপ জ্বালানো হইয়াছিল। পর দিন স্বয়ং মহান্ চোঙ-খ-পার মৃত্যুতিথি, সুতরাং সেদিন সহর ও নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর ছোট-বড় মঠগুলি দেওয়ালীর মত দীপমালায় সুসজ্জিত

• হইয়াছিল। মহান্ সংস্কারকের সম্মান যোগ্যভাবেই দেওয়া হয়। পথে-ঘাটে দীপশোভা দেখিতে বহু লোক আসে, দুঃখের বিষয় সেই রাত্রে যাহারা একেলা বা দুই-একজন সখীর সহিত বাহির হইয়াছিল, এইরূপ অনেক স্ত্রীলোকের উপর অশেষ অত্যাচার হয়। এইরূপ দুরবস্থার কারণ বোধ হয় সহরে লড়াইয়ের জন্য যে-সব সৈন্য একত্র করা হইয়াছিল তাহাদের উপর নিয়ম বা শাসনের অভাব।

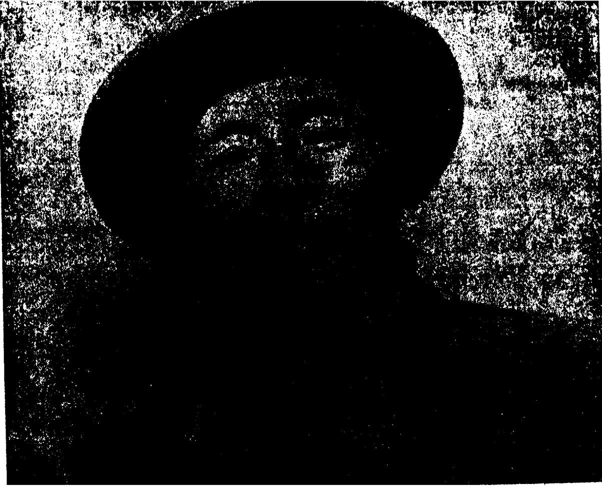
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একজন নূতন নেপালী ডিঠা অর্থাৎ ন্যায়াধীশ এখানে বদলী হইয়া আসিলেন। ইনি ইংরেজী জানিতেন, আমার সঙ্গে আলাপ হইলে ইনি ইঁহার পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। ছেলেটি মেধাবী, আমার নিকট পুস্তক ছিল না, সুতরাং লিখিয়া পাঠাভ্যাস করিত। এই সময় আমার আর একজন ছাত্র জুটিল। এ-ব্যক্তি চীনা, অর্থাৎ ইহার পিতা চীনদেশীয় ছিলেন; বিশুদ্ধ চীনা তো এখন এদেশে নাই বলিলেই হয়। এই লোকটি অন্য অর্দ্ধ-চীনা বালকদের পড়াইয়া এবং সরকার-তরফে চীনা চিঠিপত্র অনুবাদ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন করিত। আমার সঙ্গে ব্যবস্থা হইল আমি তাহাকে ইংরেজী শিখাইব, সে তাহার বদলে আমাকে চীনা শিখাইবে।

ষোল

তিব্বতে খবরের কাগজ নাই। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে "মৌখিক বার্ত্তাবহ"তে এমন অনেক গুজব ও খবর রাষ্ট্র হয় যাহাতে জনসাধারণের মন তুষ্ট হয়। ১৯শে জানুয়ারী খবর পাওয়া গেল যে, জনৈক চি-টুঙ (ভিক্ষু অফিসর) এবং তাহার প্রিয়পাত্রী "কনছি লম্মর" গ্রেপ্তার হইয়া লাসায় আসিয়াছে। এই চি-টুঙ তিন বৎসর যাবৎ সপ্তম দলাই লামার স্তূপাগারের অধ্যক্ষ ছিল। এখানকার নিয়ম যে কোন দলাই লামার দেহান্ত হইলে পোতলা প্রাসাদের কোন গৃহে তাঁহার জন্য বৃহৎ স্বর্ণরৌপ্যময় স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয় এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে যে-সব মণিমুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য ভেট দেওয়া হইয়াছিল সে-সবই সেই স্তূপমধ্যে প্রোথিত ও রক্ষিত থাকে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এইরূপ প্রত্যেক স্তূপে একজন ভিক্ষু কর্ম্মচারী (চি-টুঙ) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম দলাই লামা সুমতিসাগর (১৬১৬-১৬৮১ খ্রীঃ) ভোটরাজ্য নিজ অধিকারে পাইয়াছিলেন। তখন হইতে বর্ত্তমান ত্রয়োদশ দলাই লামা মুনিশাসনসাগর (থুব-বৃস্তন্-র্গ্যা-ম্ছো, জন্ম ১৮৭৪ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত আটজন দলাই লামা দেশে অধিকার পাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সপ্তম দলাই লামা ভদ্রকল্পসাগর (স্কল্-বসঙ-র্গ্যা-ম্ছো, জন্ম ১৭০৮ খ্রীঃ) পূর্ণরূপে সংসার-বিরাগী সাধু ছিলেন। চিত্রে ইঁহার হস্তে শাসন-চিহ্ন চক্রের বদলে পুস্তক দেওয়া

আছে ; ইনি প্রাসাদ ছাড়িয়া, কোন রাজসেবক বা অনুচর সঙ্গে না লইয়াই পর্ব্বতে বাস করিতেন। চীন ও তিব্বত—উভয় দেশেই ইঁহার সম্মান সমরূপ ছিল।

সপ্তম দলাই লামার স্তূপে রক্ষিত মহামূল্য ধনরত্নাদি গত তিন বৎসর উক্ত চি-টুঙ-এর হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে দার্জিলিং হইতে কয়েকটি ভুটিয়ানী সুন্দরী রূপ-জীবিকার চেষ্টায় ও-দেশে যায়। তাহাদের মধ্যে কন্‌ছি লম্মর ও এই চি-টুঙের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা সকলেই জানিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, কন্‌ছি প্রকাশ্যভাবে পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যেব মুক্তাময় শিরোভূষণ পরিয়া বেড়াইলেও, উচ্চতম অধিকারীদিগেব সন্দেহ হয় নাই যে, উক্ত চি-টুঙ স্তূপ হইতে মণিরত্ন বিক্রয় কবিতেছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, তিন বৎসর পব যখন তাহার বদলীর সময় ঘনাইয়া আসিল, তখন সে প্রাণ বাঁচাইবাব জন্য পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। সে এবং কন্‌ছি লম্মব নির্ব্বোধেব মত ঘোড়ায চড়িয়া চীনদেশের পথে রওয়ানা হয়। যদি তাহাবা দার্জ্জিলিং যাইবাব চেষ্টা কবিত তবে দশ দিনের মধ্যেই তাহাদেব কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইত, কেননা, তাহাবা পলাইবাব তিন সপ্তাহ পবে উচ্চতম কর্ম্মচারী-দেব হুঁস হয় যে, ঐ চি-টুঙ কার্য্য-স্থলে নাই। আরও নির্ব্বোধের মত তাহারা প্রায় দুই সপ্তাহ লাসা এবং আশপাশের জায়গায়, বন্ধু বান্ধবের ঘরে, পানাহারে ও প্রমোদে কাটায়। যখন খবর পাওয়া গেল যে খোঁজ আরম্ভ হইয়াছে, তখন তাহারা চীনদেশের পথে, লাসা হইতে তিন-চাব দিনের রাস্তায়, এক নির্জ্জন পর্ব্বতময় অঞ্চলে লুকাইয়া থাকে। কয়েক দিন লুকাইয়া থাকিবার পর খাদ্যের সন্ধানে এক গ্রামে যাইবার সময় দুইজনেই গ্রেপ্তার হয়।



জনৈক সম্ভ্রান্ত তিব্বতীয ভদ্রলোক

লাসায় আসিলেই প্রথমে দুইজনের উপর নির্ম্মমভাবে বেত চলিতে আরম্ভ

করে। চি-টুঙ ও কন্ছি সহজে কিছু কবুল করে না, বরঞ্চ বন্ধুবান্ধবের রক্ষার চেষ্টাই করে। কিন্তু "মারের চোটে ভূত ছাড়ে," সুতরাং নিরন্তর প্রহারের ফলে তাহারা লোকজনের নাম বলিতে আরম্ভ করে। দামী জিনিষের অধিকাংশ ততদিনে কলিকাতা—কি হয়ত সমুদ্র-পারে লণ্ডন-প্যারিসে—পৌছিয়া গিয়াছে। একটি অতি মূল্যবান মুক্তার মালা লইয়া এক সওদাগর লাসা ছাড়িয়া নেপালে চলিয়া যায়, সেই মালার প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তবে অল্পস্বল্প করিয়া যে সকল মণিরত্ন চি-টুঙের বন্ধুবান্ধবের নিকট ছিল, তাহাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। পঞ্চাশ-ষাট টাকার জিনিষের জন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। এইরূপ যখন চলিতেছে, তখন (৪ঠা এপ্রিল, সন্ধ্যায়) আমি ছু-শিঙ্ কুঠিতে আমার ঘরে বসিয়া রাজপথে অনেক ঘোড়া চলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, মহাগুরুর সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী দো-নির-ছেনপো এবং তা-লামার সঙ্গে নেপাল-রাজদূত ও সৈন্যসামন্ত সকলেই মোতীরত্ন সওদাগরের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। চি-টুঙ এখানে একটি বহুমূল্যবান পেয়ালা দেওয়ার কথা বলিয়াছিল এবং এখন স্বয়ং তল্লাসীর ব্যাপারে সাহায্য করিয়া সেটি বাহির করিয়া দিল। শোনা গেল, পলাইবার সময় উহারা দুইজনে দুই রাত্রি ঐ দোকানে একটি বড় সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। মোতীরত্ন গ্রেপ্তার হইয়া নেপালী গারদে চলিল। লাসার প্রধান থানার কোতোয়াল ও মোতীরত্নের একই স্ত্রী ছিল, কোতোয়াল ও তাহার স্ত্রীও জেলে চলিল।

* * *

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার এদেশে থাকা বা না-থাকা সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই। লঙ্কা হইতে পত্র পাইয়াছিলাম যে, আমাকে পুস্তক-ক্রয়ের জন্য টাকা পাঠানো হইবে, আমি ক্রয় শেষ করিয়াই যেন চলিয়া আসি। প্রথমে আমি সে প্রস্তাবে রাজী হই নাই, কিন্তু যখন চার মাসেও কোন বিহারে থাকিবার ব্যবস্থা হইল না, এবং নেপাল-তিব্বত যুদ্ধের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, তখন আমি সেই প্রস্তাবই সমর্থন করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যখন নিরাশায় মন ক্লিষ্ট তখন নৈরাশ্যই চতুর্দ্দিকে, যখন আশার সঞ্চার আরম্ভ হয় তখন তাহাও অতিমাত্রায় আসে! পুস্তক-ক্রয় ও প্রত্যাগমনে স্বীকৃতি-পত্র পাঠাইবার পরেই মহান্ত আনন্দ লিখিলেন যে, আমার প্রথম পত্র সিংহলের এক প্রসিদ্ধ দৈনিক "দিন্-মিন্" (দিনমণি) প্রকাশ করিয়াছে এবং জানাইয়াছে যে, তাহারা প্রতি পত্রের জন্য ১৫৲ টাকা বা ততোধিক দিতে প্রস্তুত। প্রতি সপ্তাহে একটি লেখা লিখন ও প্রকাশ কোনটাই দুরূহ নহে এবং তাহাতেই আমার অর্থ-সমস্যার সমাধান সম্ভব। পরের পত্রেই আমাকে পুস্তক-ক্রয়ের জন্য টাকা শীঘ্রই পাঠানো হইতেছে এই সংবাদ আসিলে

আমাকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এমন সময় (১১ই ফেব্রুয়ারী) আচার্য্য নরেন্দ্র দেব লিখিলেন যে, কাশী বিদ্যাপীঠ আমাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি ও পুস্তক-ক্রয়ের জন্য ১৫০০৲ টাকা দেওয়া মঞ্জুর করিয়াছেন, সুতরাং আমার এদেশে বাস ও অধ্যয়নের আর কোনও সমস্যাই নাই। লাসায় এখন তিন বৎসর থাকিয়া অধ্যয়ন করার কোনই বাধা রহিল না, কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা তিন সপ্তাহ দেরিতে হওয়ায় আমাকে প্রতিশ্রুতি মত ফিরিতে হইবে। কিরূপে এই সমস্যা পূরণ করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় লঙ্কা হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে, ছু-শিঙ্ কুঠির কলিকাতাস্থ শাখায় ২০০০৲ টাকা তারযোগে পাঠান হইয়া গিয়াছে।

এখন পুস্তক-সংগ্রহেই মনোনিবেশ করিলাম। তিব্বতী টঙ্কার মূল্য কমিতেছিল, সুতরাং আমার খরিদ করা সহজ হইল। আমার পুস্তক-ক্রয়ের কথা প্রচার হইলে ক্রমেই নূতন, পুরাতন, হস্তলিখিত, মুদ্রিত সকল প্রকার পুস্তক এবং দুই-চারিখানি চিত্রপটও নানা দিক্ হইতে আসিতে লাগিল। প্রথমে আমি চিত্র-ক্রয়ে রাজী ছিলাম না, কেননা আমার চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বা সংগ্রহেচ্ছা কোনটাই ছিল না, কিন্তু দুই-দশটি দেখিতে দেখিতে সেদিকে আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন ঐরূপ তেরটি চিত্রপট আমার কাছে আসিল। বিক্রেতা প্রতি চিত্রের জন্য এক দোর্জে (২৫৲ টাকা) মূল্য চাহিল। নেপালী বন্ধুরা বলিলেন, দাম বেশী চাহিতেছে, কিন্তু দুই-একদিন পরে সেগুলি হাতছাড়া হইবার ভয়ে আমি ঐ দামেই ক্রয় করিলাম। তখন সে চিত্রগুলির ঐতিহাসিক বা নগদ মূল্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইল যে, লণ্ডন ও প্যারিসের চিত্রশালাগুলি ঐ তেরটি চিত্রের জন্য পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। কেন-না, ঐ সংগ্রহে বারটি ঐতিহাসিক পুরুষের (প্রথম হইতে সপ্তম দলাই লামা, প্রথম তিব্বত-সম্রাট্ চোঙ-খ-পা প্রভৃতির) চিত্র আছে, এবং ত্রয়োদশ ছবিখানিও অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের সুন্দর চিত্র। চিত্রগুলির মধ্যে একটির পৃষ্ঠের লিখন হইতে প্রকাশ পাইল যে, এই সকল চিত্রই সপ্তম দলাই লামার সময় (খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) অঙ্কিত হইয়াছিল। আমি সবসুদ্ধ প্রায় দেড় শত চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে তিন-চারিখানি মারবুর্গ ধার্ম্মিক-সংগ্রহালয়ে বন্ধুবর প্রফেসর রুদল্ফ্ আটো মারফৎ পাঠাইয়াছিলাম, আরও দুই-চারিটি প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী অন্য বন্ধুবান্ধবকে দিয়াছিলাম, বাকি ১৪০ খানি চিত্রপট পাটনা ম্যুজিয়মকে দান করি, সেগুলি সেখানেই সুরক্ষিত। পুস্তকের মধ্যে খম্ (পূর্ব্ব-তিব্বত), মঙ্গোলিয়া ও সাইবিরিয়ায় ছাপা পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

* * *

১৬৪১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি পঞ্চম দলাইলামা সুমতিসাগর মঙ্গোল-রাজ গুশি খাঁ

•কর্ত্তৃক তিব্বতের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে পঞ্চম দলাই লামা ডে-পুঙ বিহারের এক ড-ছঙে খন্‌-পো অর্থাৎ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চম দলাই লামা নিজের মঠের খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য প্রতিবর্ষে নববর্ষ-প্রারম্ভে ২৪ দিন পর্য্যন্ত লাসায় ডে-পুঙ মঠের ভিক্ষুদিগের রাজত্বের অধিকার দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, এবং অদ্যাবধি সেই নিয়ম বর্ত্তমান আছে। শাসনের জন্য দুইজন অধ্যক্ষ, একজন ব্যাখ্যাতা এবং অন্য লোকজন নিযুক্ত হয়। ঐ ২৪ দিন লাসায় সরকারী পুলিশ, আদালত প্রভৃতির অধিকার থাকে না এবং নেপালী ভিন্ন অন্য সকল দোকানদারকে কিছু শুল্ক দিয়া লাইসেন্স লইতে হয় এবং এই ব্যাপারে ভুলভ্রান্তি হইলেই জরিমানার অন্ত থাকে না। জরিমানা এদেশে সর্ব্বঘটে আছে, লোকে বলে এখানে জেল-দণ্ড হয় না, কেন-না তাহাতে সরকারের কোন অর্থাগম নাই। সরকারী সকল উচ্চপদই তো অর্থবলে ক্রয় করিতে হয়।

অধিমাস (মলমাস) এক সময় না হওয়ায় ভোট ও ভারতীয় চান্দ্র-বর্ষ একসঙ্গে আরম্ভ হয় না। এইবার ভোট-বৎসর পয়লা মার্চ্চে পড়ে এবং এই বৎসরে দুইটি নবম (শূকর) মাস ছিল। ডে-পুঙ মঠ হইতে ভারপ্রাপ্ত শাসকবর্গকে দলাই লামার নিকটে ২৪ দিন লাসা শাসন করিবার পরওয়ানা লইতে হয়। ২রা মার্চ্চ দেখিলাম রাস্তাঘাট শুধু পরিষ্কার নহে, উপরন্তু প্রত্যেককে নিজ গৃহের বা দোকানের সম্মুখস্থ অংশে শ্বেত মৃত্তিকায় "চৌকা" কাটিয়া সাজাইতে হইয়াছে। সেই দিনই লাসার অস্থায়ী শাসকদ্বয় ঘোড়ায় চড়িয়া সদলে লাসায় আসিয়া, আমার বাসস্থানের পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে এক চত্বরে, নাগরিকদিগকে আহ্বান করিয়া ২৪ দিনের জন্য নূতন শাসনপদ্ধতি ঘোষণা করিয়া পোতলার প্রাচীন জো-খঙ মন্দিরে গেলেন। শাসক-নির্ব্বাচনে বোধ হয় মানসিক অপেক্ষা দৈহিক বিস্তৃতির উপরই অধিক লক্ষ্য রাখা হয়, কেন-না, ইঁহারা দুইজনেই ছিলেন বিরাটকায় পুরুষ। ইঁহাদের সঙ্গের রক্ষীবর্গ সাড়ে-চার হাত লম্বা ও তিন-চার ইঞ্চি ব্যাসের একটি লগুড় লইয়া "ফা ক্যু কো। পী কো মা শমো" (হটে যাও! টুপি খোলো) বলিয়া চীৎকার করিয়া চলিতেছে। কাহারও যদি ভুলক্রমে আজ্ঞাপালনে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল তো তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে উক্ত প্রচণ্ড "দুঃখভঞ্জন ঔষধ" সশব্দে গিয়া পড়িল।

দলাই লামার "পোতলা" প্রাসাদে এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। দর্শকগণ সমতলভূমির অভাবে অলিগলি, সিঁড়ি, ছাদ ইত্যাদি সকল স্থানেই ভিড় করিয়া থাকে। চা-রুটি ও খাবারের দোকানও অনেক বসে। আমরা দেখিলাম, একটি বিষ-পঁচিশ হাত উঁচু থামের উপর একজন বাজীকর খেলা দেখাইতেছে, চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, এবং স্বয়ং মহাগুরু তাঁহার বৈঠকের খিড়কিতে দূরবীন-হস্তে বসিয়া আছেন। ফিরিবার সময় দেখিলাম ডে-পুঙ মঠের সহস্রাধিক ভিক্ষু

পিপীলিকার মত সারিবন্দীভাবে মোটঘাট লইয়া পোতলার সম্মুখ দিয়া লাসায় আসিতেছে। শুনিলাম, ইহারা চব্বিশ দিন লাসায় থাকিবে। এই নববর্ষ-উৎসবে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক ও তীর্থযাত্রী লাসায় আসে, সুতরাং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা ছাড়াও অনেক ব্যবস্থা করিতে হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা অতি



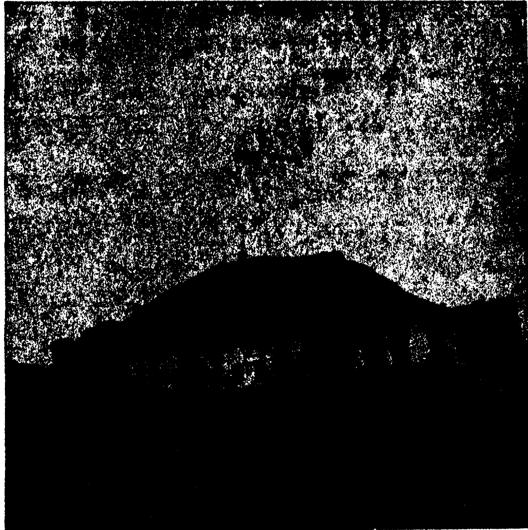
পাহাড়ের উচ্চদেশে দলাই লামার 'পোতলা'-প্রাসাদ

অপরূপভাবে করা হয়। নববর্ষের কয়দিন পূর্ব্ব হইতেই জল-সরবরাহের নালীর জল দিয়া সহরের যত গর্ত্ত পূর্ণ করা হয়, যাহাতে সাধারণ কূপগুলি জলশূন্য না হয়। ব্যবস্থা উত্তম, কিন্তু দুঃখের বিষয় জল ভর্ত্তি করার পূর্ব্বে সেই গর্ত্তগুলি পরিষ্কার করা হয় না, সুতরাং মৃত পশুর গলিত দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার মল-

আবর্জ্জনাই ঐ জলে ভাসিয়া চতুর্দ্দিক দুর্গন্ধে পূর্ণ করে এবং সেই জল মাটির ভিতর দিয়া চুঁইয়া সহরের সাধারণ ব্যবহার্য্য অগভীর কাঁচা কূপগুলিতে যাওয়ায় নানা প্রকার ব্যাধিরও প্রকোপ বাড়ে। এই সময় লাসায় প্রায় বিশ হাজার আগন্তুক ভিক্ষুর আগমন হয় এবং তাহাদের সেবার জন্য চায়ের সদাব্রতে দিনে তিন-চারিবার মাখনযুক্ত চা ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

* * * * *

১লা মার্চ্চ আমি তের শত বৎসরের পুরাতন জো-খঙ্ মন্দির দেখিতে গেলাম। জো-খঙ্ শব্দের অর্থ "স্বামিগৃহ"। এখানে স্বামী বলিতে সেই প্রাচীন চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তিকে বুঝায়, যাহা মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত হইতে চীনদেশে গিয়াছিল এবং যাহা লাসা-সংস্থাপক সম্রাট্ স্রোঙ্-বর্চন্-সৃগন্-বো কর্তৃক ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে বিজয়-অভিযানের ফলে চীনরাজদুহিতার সঙ্গে যৌতুক হিসাবে তিব্বতে আনীত হইয়াছিল। সম্রাট লাসা নগরের কেন্দ্রে নিজ প্রাসাদ ও রাজকার্য্যালয়ের সঙ্গে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন, সুতরাং এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এই মূর্ত্তির সঙ্গে আসিয়াছিল বলা যায়। ইহার প্রতিপত্তি এদেশে এখনও এতই প্রবল যে, লাসার আধুনিক অবনত অবস্থায়ও এখানকার ব্যাপারীরা পর্য্যন্ত 'জো-বো' নাম ধরিয়া সহজে শপথ করিতে চাহে না—যদিও কথায় কথায় ত্রি-রত্ন শপথ করিতে তাহারা প্রস্তুত—এবং করিলে সে কথা তাহারা নিশ্চয় রাখে। জো-খঙ্ মন্দিরের উত্তর-দ্বারের এক দেওয়ালে ছোট ছোট সুন্দর অক্ষরে আঙ্গিনার অভ্যন্তরস্থ ছোট-বড় সকল মন্দিরের ইতিহাস লিখিত আছে। এইরূপ ইতিহাস-লেখা এদেশের বহু সুপ্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরের দ্বারদেশে থাকে।



জো-খঙ্ মন্দিরের দৃশ্য

ভারতের প্রধান তীর্থ ও মন্দিরে এইরূপ থাকিলে যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা হইত।*

মন্দিরের পরিক্রমায় ও দেওয়ালের গায়ে অনেক সুন্দর চিত্রাবলী রহিয়াছে, কোনটা কোন প্রসিদ্ধ মঠের প্রাচীন দৃশ্য, কোনটায় স্বর্ণরঞ্জিত বুদ্ধ নিজের পূর্ব্বজন্মের আখ্যান বলিতেছেন। কোথাও ভগবান বুদ্ধের অন্তিম জীবনের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত আছে, কোথাও বা ভারতের অশোক অথবা ভোটের স্রোঙ্-বর্চন্ সৃগম্-বো চিত্রে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সমস্ত চিত্রই সুন্দর এবং যদিও সকল মূর্ত্তিই সহস্রাধিক বৎসরের মলিনতার স্তরে ভূষিত, কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মান, তাঁহাদের মুখ-মুদ্রা এবং রেখার লালিত্য অনুপম। প্রত্যেক দেবগৃহে অসংখ্য স্বর্ণরৌপ্যময় দীপ অবিরাম জ্বলিতেছে, রৌপ্যদীপের মধ্যে একটির ওজন আট শত ভরি, সেটি গত বৎসর ভুটান-রাজ পাঠাইয়াছেন। বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতু তো চতুর্দ্দিকে ছড়ানো আছে। ভগবান বুদ্ধের এই প্রধান মূর্ত্তি ভিন্ন চন্দন ও অন্যান্য কাষ্ঠের বহু মূর্ত্তি আশপাশের দেবালয়ে রহিয়াছে। প্রাচীন ভোটের কয়েকজন সম্রাটের মূর্ত্তিও এখানে আছে, তাহার মধ্যে প্রধান দেবালয়ের দ্বিতলে সম্রাট্ স্রোঙ্-বর্চন্ ও তাঁহার নেপাল ও চীন দেশীয়া মহিষীদ্বয়ের মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ এই মন্দিরের প্রতি অণুপরমাণুতে ত্রয়োদশ শত বৎসরের ঐতিহাসিক কীর্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।



ফো-বং-এর লামা ও ধর্ম্মগ্রন্থ হস্তে অপর একজন লামা

মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম এক প্রশস্ত আগারে তিন চারি শত

*সুবিধা হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলে নানা প্রকার রূপকথার বিলোপে পাণ্ডাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইত। —অনুবাদক।

ভিক্ষু উচ্চাসনে বসিয়া খব-স্ববে সূত্র পাঠ কবিতেছেন। ইহাদেব বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ এবং প্রত্যেকেব সম্মুখে লৌহময় ভিক্ষা-পাত্র। শুনিলাম, ইঁহাবা লাসাব সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মনিষ্ঠ ভিক্ষু এবং ইঁহাবা ম্যুক ও ব-মো-ছে বিহাবে থাকেন।

৪ঠা মার্চ্চ শুনিলাম ম্যুরু মঠে ফো-বংএব লামা ধর্ম্মোপদেশ দিবেন এবং দেখিলাম বহু লোক আগ্রহেব সহিত তাহা শুনিতে যাইতেছে। এই ফো-বং এব লামা অতি বিদ্বান এবং তিব্বতেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। লোকে ইঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা কবিয়া ইঁহাব মনোহব শিক্ষাপ্রদ উপদেশেব সহিত নববর্ষেব ২৪ দিনেব জন্য নিযুক্ত সবকাবী উপদেশক মহাশযেব ব্যাখ্যানেব তুলনা কবিতেছিল। সবকাবী উপদেশক বেচাবাব দোষ কি? তিনি তো অনেক ভেট, অনেক তোষামোদেব ফলে এই পদ লাভ কবিয়াছেন। যাহা হউক, কৌতূহলেব বশে একদিন তাহাব উপদেশ শুনিতে গেলাম। শুনিলাম, উপদেশক মহাশয় বলিতেছেন, “ডাকিনী মাতাব অদ্ভুত শক্তি, তাঁহাকে প্রণাম কবা উচিত, তাঁহাব পূজা দেওয়া উচিত। বজ্রযোগিনী মাতাব অদ্ভুত ক্ষমতা ও প্রভাব, উঁহাকে পূজা ও নমস্কাব কবা উচিত।” ইহাই তাঁহাব উপদেশেব মূল কথা।

* * * * *



সম্ভ্রান্ত তিব্বতী পবিবাবেব ব্যক্তিগণ

নূতন বাজত্বেব নূতন লাইসেন্স লওযাব দরুণ কযদিন বাজাব এবং দোকানপাট বন্ধ ছিল, সেগুলি খোলাব পব ৫ই মার্চ্চ সাবা শহব পবিষ্কাব কবিবাব ও সাজাইবাব ঘটা পডিয়া গেল। শুনিলাম পবদিন সকাল সাতটায় মাহাগুরু দলাই লামাব শোভাযাত্রা বাহিব হইবে। পবদিন শোভাযাত্রা দেখিতে গিয়া দেখি, পথেব দুই ধাবে ভিড কবিয়া লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং কডা

পাহারাও বসিয়াছে। শোভাযাত্রায় সর্ব্বপ্রথমে ছত্রাকার লাল টুপি পরিয়া মন্ত্রীদের অনুচরবর্গ আসিল, তাহার পর আসিলেন মন্ত্রিগণ, তাহার পরে পরে চলিলেন চি-টুঙ (ভিক্ষু-অফিসর), কুট (গৃহস্থ-অফিসর), নাগরিক বেশে সেনাপতি, সেনাপতির বেশে ছ-রু মন্ত্রী, দুইজন ফৌজী জেনারেল (সূদে-দ্পোন), সৈনিক অফিসর বেশে সর্দ্দার বাহাদুর লে-দন্-লা এবং তাহার পর রেশমী পর্দ্দায় ঘেরা পালকীতে মহাগুরু (বলা বাহুল্য, অন্য সকলেই প্রায় ঘোড়ায় সওয়ার ছিল) এবং সঙ্গে নেপালী, মোঙ্গল ও চৈনিক-বেশে বহু সৈন্যসামন্ত।

সিংহলে ফিরিবার আয়োজন করিতে হইল, পুঁথি পুস্তক প্রভৃতি কেনা চলিতেছিল, কিন্তু পথে সৈনিক পাহারা তখনও ছিল এবং নেপালের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কাও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তনের সকল ব্যবস্থা ঠিক করা যাইতেছিল না। সেইজন্য ৭ই মার্চ্চ ডংরী-রেন পোছের নিকট গিয়া তাঁহাকে চারিটি বিষয় দলাই লামার নিকট নিবেদন করিতে অনুরোধ করিলাম, যথা—(১) সম্-য়ে যাইবার অনুমতি, (২) পোতলার যে-সকল পুস্তক মহাগুরুর অনুমতি ব্যতীত ছাপা হয় না, সে সকল ছাপাইয়া দিতে অনুমতি, (৩) গ্‌তে গির ছাপা একটি করিয়া সম্পূর্ণ কঞ্জুর ও তঞ্জুর এবং (৪) ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য একটি ছাড়পত্র। তিনি বলিলেন, প্রথম দুইটি বিষয়ে আদেশ পাওয়া সহজ, তবে শেষের দুইটির সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

এই সময় লাসায় তুষারপাত চলিতেছিল। সেখানে তুষারপাত বেশী হয় না, কিন্তু মাটির ছাদ, সুতরাং রোদ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই তুষাররাশি ছাদ হইতে সরাইতে হয়। ২৪ দিনের রাজত্বের মধ্যে ছাদের বরফ পথে ফেলিলে জরিমানার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং লোকে তাহা উঠাইয়া কোণে অলিগলিতে ফেলিল। ২৫শে মার্চ্চ, পুরাতন শাসন যেদিন ফিরিয়া আসিল সেইদিন, প্রায় ১৬ আঙুল পরিমাণ বরফ পড়িল। লোকে বলিল সৌভাগ্যের বিষয় ২৪ দিনের রাজত্ব নাই এবং পথে-ঘাটে ছাদের বরফ স্তূপাকার করিয়া ফেলিয়া রাখিল।

* * *

নববর্ষের সময় শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ তর্কযুদ্ধ হইয়া থাকে। ১০ই মার্চ্চ জো-খঙ্ মন্দিরে শাস্ত্রার্থ দেখিতে গেলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে পণ্ডিতগণ শিষ্যমণ্ডলী লইয়া বসিয়াছিলেন, দুইজন বৃদ্ধ উচ্চাসনে বসিয়া মধ্যস্থরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রশ্নকর্ত্তা নিজ আসন হইতে উঠিয়া ঐ দুই বৃদ্ধকে বন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিবার জন্য অনুমতি লইল এবং পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণ-বার্ত্তিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রশ্ন করিবার ধরন বিচিত্র ছিল। প্রশ্ন করিতে করিতে সে কখনও অগ্রে কখনও পশ্চাতে পদক্ষেপ করিয়া, প্রতি

প্রশ্নের শেষে সজোরে হাতে হাত চাপড়াইতেছিল এবং এক একপ্রশ্নমালা শেষ হইলে তাহার জপমালা লইয়া ধনুক হইতে বাণ মোচনের ন্যায় নাট্যমুদ্রায় অঙ্গভঙ্গী করিতেছিল। তাহার স্ব-পক্ষের বিদ্যার্থী ও পণ্ডিত অতিপ্রসন্নমুখে তাহার তর্কযুক্তি শুনিতেছিল, উত্তর-পক্ষীয় ছাত্রবর্গ বিদ্যার্থীদিগের বিচিত্র টুপি পরিয়া শান্ত ও স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। এক পক্ষের ছাত্রের তর্ক অবতারণা শেষ হইলে, বিপক্ষের ছাত্রও মধ্যস্থকে বন্দনা করিয়া তর্ক খণ্ডন করিয়া পূর্ব্ব-পক্ষকে তর্কে আক্রমণ আরম্ভ করিল। আক্রমণের সময় ঠিক পূর্ব্ববৎ যুদ্ধের অনুকরণে পদক্ষেপ, বাণক্ষেপ-ইত্যাদি চলিল। এইরূপ তর্কের মধ্যে নাট্যাভিনয় কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করায় এক বন্ধু বলিলেন, "ইহা নালন্দা বিক্রমশিলা হইতে আসিয়াছে, সুতরাং ইহার জন্য দায়ী তোমরা।" আমি মানিতে রাজী হইলাম না, ইহা সত্য হইলে ভারতে কাশী ও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ প্রথার কোনরূপ চিহ্নাবশেষ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

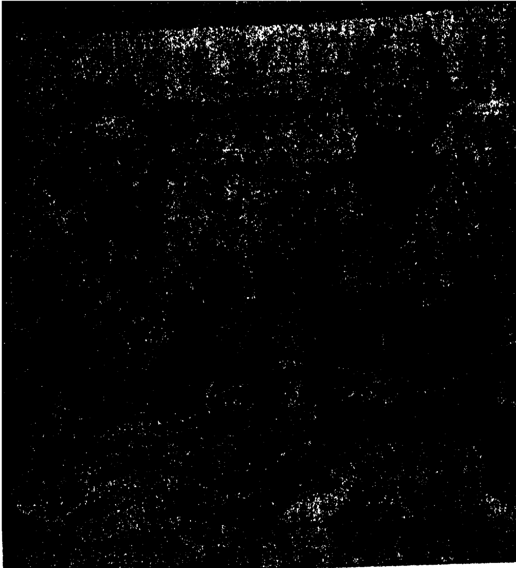
১২ই মার্চ্চ লাসার পঞ্চক্রোশী আরম্ভ হইলে আমিও গেলাম। এই পঞ্চক্রোশীতে নগরের অতিরিক্ত পোতলা প্রাসাদ, মহাগুরুর উদ্যান-গৃহ নোর্বুলিং-কা এবং অন্য অনেক অট্টালিকা আদি আছে, সুতরাং পরিক্রমা প্রায় পাঁচ মাইল পথের। দেখিলাম, কেহ কেহ (এক নেপালী সওদাগরও ছিল) দণ্ডবৎ হইয়া পরিক্রমা করিতেছে। পরিক্রমা শেষ হইলে র-মো-ছে-কে মন্দির দেখিতে গেলাম। ইহা জো-খঙ্ মন্দিরের সমসাময়িক। সাধারণতঃ তিব্বতে দেবমূর্ত্তি মৃত্তিকার উপর কঠিন প্রলেপ (প্লাষ্টার) দিয়া করা হয়। এখানে কিছু প্রস্তরের কাজও দেখিলাম। আরও দেখিলাম বুদ্ধমূর্ত্তিকে মুকুটে ভূষিত করা হইয়াছে। শুনিলাম মহান্ সংস্কারক চোঙ-খ-পা এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। বস্তুতঃ এই প্রথা চোঙ-খ-পা ভুলক্রমে প্রচলিত করেন। কারণ বুদ্ধদেব ভিক্ষু, তাই তিনি স্বয়ং ভিক্ষুদের ভূষণাদি ধারণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তবে এই প্রথা ভারত-নেপালেও বহু শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছে।

১৪ই মার্চ্চ প্রাতে নগর-পরিক্রমার পথে বিশেষ আয়োজন চলিতেছে দেখিলাম। পথের পাশে কাঠের স্তম্ভ বসাইয়া তাহার উপর আড়ভাবে তক্তা লাগানো হইতেছে। সারাদিন স্তম্ভগুলি পর্দ্দায় ঢাকা থাকায় সেখানে কি হইতেছে জানা গেল না। সূর্য্যাস্তের অল্প পূর্ব্বে পর্দ্দাগুলি সরাইলে দেখিলাম, প্রত্যেকটি স্তম্ভের উপর সুন্দর দ্বিতল মন্দির-বিমান তৈয়ারী হইয়াছে এবং সেগুলির গবাক্ষ ও অলিন্দে মাখনের তৈরী সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত পরিক্রমা-পথ এইরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বোধহয় ললিতকলাকে ভূমিসাৎ করার মত ঈশ্বরভক্তি ভারতে প্রবল হইবার পূর্ব্বে সেই পুণ্যভূমিতেও ভোটদেশের

ন্যায় সার্ব্বজনীন কলানুরাগ ছিল। এখন তিব্বতের তুলনায় ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশেও ললিতকলার আসন এত উচ্চে নহে, ভারতের কথায় কাজ কি?

বস্তুতঃ এদেশে কলাশিল্প অতি সুব্যবস্থিত। একটি পিত্তলমূর্ত্তি-নির্ম্মাণে তিনজন দক্ষ কারিগরের কলাকৌশলের প্রয়োজন—প্রথম ব্যক্তি ছাঁচ প্রস্তুত করে, দ্বিতীয়টি ঢালাই করে এবং শেষ ব্যক্তি মূর্ত্তি খোদাই, পালিশ ইত্যাদি করে।

১৫ই মার্চ্চ, আসল নববর্ষের দিনে লাসার লোকে পরস্পরের মঙ্গলকামনায় মঙ্গলগীতি গাহিয়া ও উপহার পাঠাইয়া উৎসব করিতেছিল। তবে দ্বিপ্রহরের পরে পান ও গান দুইয়েরই মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া গেল। আজ আমার সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অখু (খুড়া) মহাশয়ও কিশোরের ন্যায় কিশোর-কিশোরীদিগের মধ্যে মহা উল্লাসে নৃত্য করিয়া দিন কাটাইলেন। এক দিকে হাতধরাধরি করিয়া সারি-বন্দী ছয়-সাতটি স্ত্রীলোক এবং তাহাদের সম্মুখে ঐরূপ এক সারি-পুরুষ, সারির উভয় প্রান্তে স্ত্রী ও পুরুষ আবার হাত ধরিয়া দুই সারি যুক্ত করিয়া দুইটি চন্দ্রাকার অর্দ্ধবৃত্ত করিয়া গানের তালে তালে নাচিতে থাকে। নৃত্যকলা দেখা সমাপ্ত হইল, এইবার



মাতব্বরায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা

চিত্রকলার পালা। ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও সিদ্ধপুরুষের কয়েকখানি চিত্র আমার প্রয়োজন ছিল। একজন তরুণ রাজ-চিত্রকর নিকটেই আছে জানিতে পারিয়া তাহার নিকট চলিলাম। দেখিলাম, তাহার হাত ভাল এবং সেই কারণেই সে মাত্র বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে পাঁচজন রাজ-চিত্রকরের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শহরে আরও অনেক চিত্রকর আছে-ট্যাক্সের বদলে তাহাদের এই রাজ-চিত্রকরগণকে কাগজ কাপড় রং ইত্যাদি চিত্রণের সরঞ্জাম জোগাইতে হয়। পাঁচজন রাজ-চিত্রকরের মধ্যে দুইজন বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ কেবল তত্ত্বাবধান করে। অন্যদের তিন বৎসর অন্তর চব্বিশটি চিত্র

মহাগুরুকে দিতে হয়। ইহার জন্য তাহাদের জায়গীর নির্দ্দিষ্ট আছে যাহাতে ভরণপোষণের ভাবনা না থাকে। ভিক্ষু-চিত্রকরদিগের জন্য এরূপ ব্যবস্থা বা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কিছুই নাই। তরুণ চিত্রকর কুশলা, কিন্তু ভোট দেশের চিত্রকলার কঠিন বিধিবিধানে তাহার প্রতিভা জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩শে মার্চ্চ সপ্তদশ শতাব্দীর সৈনিকদের মিছিল বাহির হইল। প্রথমে সাঁজোয়া পোষাক পরিহিত ধনুর্ব্বাণ ও তূণীরযুক্ত, টুপিতে পালক, ঘোড়সওয়ারের দল চলিল, পরে বিচিত্র পোষাকে পলিতাযুক্ত-গাদা-বন্দুক-সজ্জিত পদাতিকশ্রেণী। রাস্তা দেশী বারুদের গন্ধে ও গাদা-বন্দুকের শব্দে আমোদিত ও মুখরিত হইয়া গেল। এই সকল ধনুর্দ্ধারী ও খড়্গধারীর পিছনে প্রাচীন রাজবেশে সজ্জিত কয়েকজন লোককে দেখা গেল। কথিত আছে ভোট দেশের সকলে সামন্তরাজকে হারাইয়া দিবার পরে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের এই তারিখে মোঙ্গল-বিজেতা গু-শি খাঁ পঞ্চম দলাই লামাকে তিব্বৎ রাজ্য প্রদান করেন।



তরুণ ভদ্রলোকের পুত্রকন্যাগণ

২৪শে মার্চ্চ অস্থায়ী রাজত্বের শেষ দিন, অতি প্রত্যূষে মৈত্রেয়র রথযাত্রা হইল। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে শঙ্খ ঝাঁঝর লইয়া টুপি-পরিহিত ছাত্র-ভিক্ষুর দল চলিল, পরে চারিচক্রের রথে আরূঢ় মৈত্রেয়র সুন্দর প্রতিমা, পিছনে দুইটি হাতী। এই হাতী দুইটি শৈশবে এদেশে আসিয়াছে, শীতের দেশে ইহাদের কষ্ট নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু বড়ই তোয়াজে ইহাদের রাখা হয়।

* * * * *

যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইল ৩০শে মার্চ্চ। পথঘাট ও খুলিল। আমি আমার চিত্রপট

পুঁথি সব দ্রুত জড়ো করিয়া দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। মোঙ্গল ভিক্ষু ধর্ম্ম-কীর্ত্তি আমায় সকল কাজে অনেক সাহায্য করিলেন। ইনি ছয়-সাত বৎসর যাবৎ সে-রা মঠে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। দৃঢ়শরীর এবং অধ্যয়নে মেধাবী এই ভিক্ষুকে আমি সিংহল লইয়া যাইব স্বীকার করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহার সঙ্গে আচার্য্য শান্তরক্ষিত-স্থাপিত (৮২৬ খ্রীঃ, সম্রাট্ ঠি-স্রোঙ-দে-চন-এর সাহায্যে) এদেশের প্রথম বৌদ্ধ বিহার সম্-য়ে দেখিতে যাইব স্থির হইল। লাসা হইতে সম্-য়ে স্থলপথে তো যাওয়া যায়ই, জলপথে চামড়ার নৌকায় লাসার নদী উ-ই-ছু দিয়া চাঙ-ছুর (চাঙ্-স-পো = ব্রহ্মপুত্র) সঙ্গমে এবং ব্রহ্মপুত্রের ক্রোড়ে সম্-য়ে হইতে তিন চার মাইল দূরের ঘাটে যাওয়া যায়। আমরা জলপথে যাওয়াই স্থির করিলাম। প্রত্যেক দিন নৌকা পাওয়া যায় না। ৫ই এপ্রিল খবর পাইয়া আমরা দুইজন নৌকার ঘাটে গিয়া একটি কা (চামড়ার নৌকা) আরোহণ করিলাম। সঙ্গে এক বৃদ্ধা সহযাত্রিণী এবং একজন তেইশ-চব্বিশ বৎসরের যুবক। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম ইহারা মাতাপুত্র, কিন্তু সৌভাগের বিষয় ঐরূপ কোন কথা প্রকাশ্যে বলি নাই, কেন-না যাত্রার দ্বিতীয় দিনে ধর্মকীর্ত্তি বলিলেন, এদেশে এই দুইটির মত অনেক স্বামী-স্ত্রী আছে, কারণ ধনী বৃদ্ধা বিধবার যুবক পতির অভাব হয় না।

এদেশের নৌকা উজানে চলে না, স্রোতের সঙ্গেই চলে এবং ফিরিবার সময় নৌকার কাঠ ও চামড়ার খোল পৃথক করিয়া গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া আনা হয়। এইরূপ চামড়ার নৌকা শুধু হাল্কা নহে, নদীগর্ভস্থ পাথরে ঠেকিয়া বানচাল হওয়ার ভয়ও ইহাতে কম। আমরা যাইতে যাইতে কয়েকবার ঐরূপ প্রস্তরের ঘর্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম। নৌকার মাঝি ও লস্করের প্রধান কাজ নৌকাকে নদীর খরস্রোত স্থানের উচ্ছল জল ও প্রস্তররাজি হইতে তফাতে রাখা।

পথে প্রখর শীত-বাতাসে এবং কাঠ-ফাটা রৌদ্রে কষ্ট যথেষ্ট ছিল। আমার ও ধর্ম্মকীর্ত্তির সঙ্গে দুইটি পিস্তল থাকায় অন্য ভয় ছিল না। আমাদের প্রতি-সন্ধ্যায় তীরের নিকটস্থ কোনও গ্রামে রাত্রিযাপন করিতে হইত। এক গ্রামে এইরূপ রাত্রিযাপনের সময় শুনিলাম বৃদ্ধার যুবক পতির উপর দেবতার আবেশ হইয়াছে। শুনিলাম, ইহাদের পেশা তাই এবং পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম স্বামী-স্ত্রী বিলক্ষণ উপহার ও ভেট লইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত আসিতেছেন। তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে তিব্বতের প্রাচীনতম বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিগ্-মা-পা দিগের অন্যতম মঠ 'দোর্জে-ডক' দেখা দিল। ইহা ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বে একটি পর্ব্বতশিখরে স্থাপিত।

ব্রহ্মপুত্রের স্রোত সেরূপ প্রখর নহে, উপত্যকাও বিস্তৃত। দুই ধারে অনেক গ্রাম ও উদ্যান দেখা গেল। সন্ধ্যার সময় একটি শিলাময় পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলাম।

সকলে সশ্রদ্ধভাবে বলিল এই পাহাড় ভোট দেশের নহে, অতি পবিত্রজ্ঞানে ইহাকে ভারত হইতে আনা হইয়াছে। বাম দিকে নদীগর্ভে তিনটি ছোট-বড় শিলা ছিল, শুনিলাম সেগুলি সো-নম, ফুন ও সুম্ (মাতা-পিতা-পুত্র এবং কিংবদন্তী আছে যে, সেগুলিও ভারত হইতে আগত ! তবে ইহা তো সত্যই যে, এসকলের নিকটেই সম্-য়ে বিহার যাহা ভারতের পণ্ডিতেরা স্বদেশের অনুকরণে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অবস্থিত। রাত্রে নদীর মধ্যের এক দ্বীপে আমরা নৌকা বাঁধিলাম, সে দ্বীপের উপর ঐরূপ আর একটি বিশাল শিলা রহিয়াছে যাহা উচ্চতায় প্রায় ১৫০ ফুট হইবে। এদেশে উৎসবের সময় বিহারের কোন উচ্চ ও বিস্তৃত দেওয়ালে বিশাল চিত্রপট বিলম্বিত করা হয়। এই শিলাটির সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, সম্-য়ে বিহার নির্ম্মাণের সময় ঐরূপ চিত্রপট টাঙাই-বার স্থান প্রয়োজন হইলে এই মহাশিলা ভারত হইতে আনা হয়। জুন-জুলাই মাসের প্লাবনে যখন এই দ্বীপটি ডুবিয়া যায়, তখন ঐ বিরাট ত্রিকোণাকার শিলাটি মাত্র জাগিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া আমরা জম্-লিঙ গ্রামে পৌঁছিলাম। কিছু দূরে এক নালার কাছে নেপালের বৌদ্ধস্তূপের মত একটি স্তূপ দেখা গেল। ব্রহ্মপুত্রের এই উপত্যকা অঞ্চল যথেষ্ট গরম এবং এখানে বহু আখরোটের বৃক্ষ আছে। চেষ্টা করিলে আরও অনেক ফল এখানে অনায়াসেই উৎপাদন করা যায়, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের কৃপায় তাহা হওয়া সম্ভব নহে। নৌকার মাঝি বলিয়াছিল এখান হইতে সম্-য়ে লইয়া যাইবার লোক জোগাড় করিয়া দিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কোনও লক্ষণ না দেখায় আমরা স্থির করিলাম যে, তিন মাইল পথ মাত্র ব্যবধান পার হইয়া বিহারেই আশ্রয় লইব।

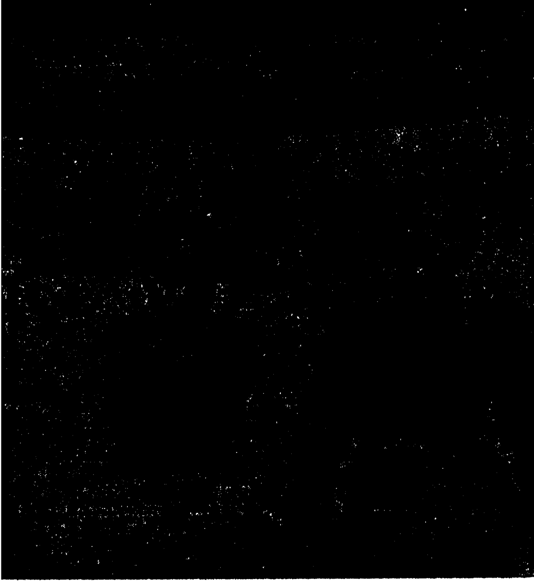
ব্রহ্মপুত্র ও উই-ছু নদীর ত্রিবেণীর উত্তরের অঞ্চলকে এদেশে উই-যুল (মধ্যদেশ) ও দক্ষিণে ছু-শরের নিকট ত্রিবেণীর নীচের অঞ্চলকে ল্হো-খা (দক্ষিণ দেশ) বলে। ব্রহ্মপুত্রের উপর পশ্চিম অঞ্চলে টশী লামার চাঙ প্রদেশ ও পূর্ব্ব দিকে ল্হো-খা প্রদেশ। বর্তমান (এখন গত) দলাই লামা ও টশী লামা উভয়েই এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নৌকা হইতে নামিয়া পাহাড়ের ধার দিয়া সম্-য়ে'র দিকে চলিলাম। পথে পর্ব্বতগাত্র হইতে খোদিত ছোট ছোট স্তূপ দেখিলাম, যেরূপ আমাদের দেশের গুহা বিহারে আছে। এই সব দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টা চলিবার পর সম্-য়ে বিহার দেখা দিল। সমতলভূমির উপর চারি দিকে দেওয়াল-ঘেরা এই বিহার বস্তুতই ভোট অপেক্ষা ভারতেরই কথা মনে করাইয়া দেয়। বিহারের চতুর্দ্দিকে ফলহীন বৃক্ষের বাগানও আছে।

পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পরিক্রমায় চীনদেশের কালোচশমাযুক্ত এক ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হইল। ইনি সিকিম দেশের লোক এবং উর্গ্যেন-কুশো নামে পরিচিত।

তিনি কিছুক্ষণ অতিশয় প্রীতির সহিত কথাবার্তা কহিবার পর তাঁহার লোককে সঙ্গে দিয়া আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেদিন কেবলমাত্র আরামে শ্রান্তি দূর করিলাম।

ভোট দেশের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্-য়ে বিহার আচার্য্য শান্তরক্ষিত উডন্তপুরী বিহারের অনুকরণে করাইয়াছিলেন। উডন্তপুরী নির্ম্মাণ করেন মহারাজ ধর্ম্মপাল, তাঁহার শাসনকাল ৭৬১-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সম্-য়েনির্ম্মাতা সম্রাট ঠি-সোঙ দে-চন্ ভোট শাসন করিয়াছিলেন ৭৩০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, এবং সম্-য়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ৭৫১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভিতরের চারি কোণের চারি ইষ্টকময় স্তূপ (স্তূপ-শিখরে এখনও প্রাচীন ভারতের স্তূপের ন্যায় ছত্র বিরাজ করিতেছে) নিশ্চয়ই নবম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আশেপাশে বহু চন্দ্র-সূর্য্য যুক্ত বজ্রযানী স্তূপ রহিয়াছে, এবং সকলের মধ্যে গ্‌ চুগ্‌ -লগ্‌-খঙ্‌ বিহার রহিয়াছে। একবার এখানের প্রায় সকল অট্টালিকাই অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়, পরে একাদশ শতাব্দীতে র-লোচ-ব পুনঃনির্ম্মাণ করেন। বিহার প্রায় চতুষ্কোণ এবং ছয়-সাত হাত উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা, ইহার চার প্রধান দিক-কোণে চারটি দ্বার আছে। মধ্যস্থলে প্রধান বিহার যাহার চারি দিকের পরিক্রমায় ভিক্ষুদিগের জন্য দ্বিতল আবাস আছে। মূল বিহার প্রায় সমস্তই দারুময় ও ত্রিতল, নীচের তলায় বুদ্ধমূর্ত্তিই প্রধান। বাহিরে আচার্য্য শান্তরক্ষিতের বৃদ্ধাবস্থার মূর্ত্তি আছে, সঙ্গে তাঁহার ভোট দেশীয় ভিক্ষু শিষ্য বৈরাচন ও গৃহস্থ শিষ্য সম্রাট ঠি-স্রোঙ-দে-চন্ এই দুইজনেরও মূর্ত্তি আছে। শত বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করার পর বিহারের পূর্ব্বদিকের এক পাহাড়ের এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার দেহ না আলাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। সার্দ্ধ-দশ শতাব্দার



তিব্বতী মহিলাদের কেশবিন্যাস

উপর ঐ স্তূপ হইতে তিনি নিজহস্তে রোপিত এই ক্ষেত্র দর্শন করিবার পর, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ জীর্ণ স্তূপ ভাঙিয়া যায়। স্তূপের ভিতর হইতে তাঁহার কঙ্কাল ও করোটি বাহির হইয়া পড়িলে, এখানেব লোকে তাহা সযত্নে আনিয়া এক কাচময় আধারে স্থাপন করিয়া বিহাবের প্রধান বুদ্ধমূর্ত্তিব সম্মুখে রাখিয়া দেয়। যখন আমি সেই আধারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাব সেই বৃহৎ করোটি দেখিলাম, তখন আমার মনেব অবস্থা অবর্ণনীয়। ৭৫ বৎসর পাব হইবার পব দুর্গম হিমালয় পার হইয়া ধর্ম্মবিজয়, এবং তদুপবি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রেব উজ্জ্বল দর্পণ নির্ম্মাণ (বরোদার ছাপাখানার কৃপায় ইহা এতদিন পবে আবার জগতে প্রচার হইতেছে) এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

বিহারের দ্বিতীয় তলে অমিতায়ু মূর্ত্তি বহিয়াছে দেখিলাম, তৃতীয় তল শূন্য। তাহাব পর "দ্বীপ-" গুলি দেখিতে গেলাম। প্রথমে জম্বুদ্বীপ, এখানে অবলোকিতেশ্বব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাব নিকট দ্বীপ-নির্ম্মাতা বাণী নেতুঙ-নচু—মো চন্দনকাষ্ঠে বিবাজ কবিতেছেন। তাহাবপব গ্যা-গর্-গ্লিঙ (ভাবতদ্বীপ)। এইখানে সেই সর্ব্বজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিতগণ থাকিতেন—যাঁহাদের



তিনজন ধার্ম্মিক ভিক্ষুক

পরিশ্রমের ফলে সহস্র ভোট-গ্রন্থে এখনও মানব-দানব ও কালের অত্যাচারে ভারত হইতে লুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় রত্নরাজি ভোটভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইঁহাদের সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ দেখিয়া ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দেও আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—এখানে অনেক পুস্তক দেখিতেছি যাহা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও দুষ্প্রাপ্য। দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী নির্ব্বোধদিগের সময় ঐ অমূল্য গ্রন্থরাজি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। এখন যাঁহারা এই বিহারের রক্ষক তাঁহাদের কথা না বলাই ভাল।

আমার পক্ষে এদেশের তাম্রমুদ্রার ভার লইয়া চলাচল করা দুরূহ ছিল, সুতরাং কয়েকখানি চিত্র ও পুস্তক এখানে সংগৃহীত হইল। কিছু বেশী অর্থ সঙ্গে থাকিলে আরও অনেক জিনিষ পাইতে পারিতাম।

উর্গ্যেন কুশো ঘোড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১১ই এপ্রিল আচার্য্য শান্তরক্ষিতের কীর্ত্তি সম্-য়ে বিহারের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম। চার-পাঁচ মাইল যাইবার পর হং-গো-চং-গং গ্রামের একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইল, সে আমাদের ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিল যে, পথ-খরচের টাকা সে দিবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে পথ চড়াইয়ের এবং রাস্তা ভাল। দুই-তিন ঘণ্টা চলিবার পর নির্জ্জন স্থানে একটি এক-কক্ষযুক্ত গৃহ পাইলাম। এই গৃহে সম্-য়ে বিহার নির্ম্মাতা সম্রাট ঠি-স্রোঙ্-দে-চন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও চলিবার পর একটি ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম এবং তাহার পর হং-গো-চং-গং গ্রাম পাইলাম। শেষোক্ত গ্রামে রাত্রিযাপন করা হইল। কয়দিন স্নান হয় নাই, পরদিন প্রাতে গ্রামের সেচ-নালায় স্নান করিয়া গ্রামকর্ত্তার সৌজন্যে প্রাপ্ত দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা রওয়ানা হইলাম। পথে চড়াই কম এবং পনর হাজার ফুট উচ্চতার হিসাবে ঠাণ্ডাও কম। কিছু দূর যাইবার পর রাস্তার ডাহিনে একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম, শুনিলাম, ইহা তিব্বত-বিজেতা গু-শি খাঁর মঙ্গোল-সেনার কার্য্য। সন্ধ্যা ৭টায় আমরা লাসার নদী উই-ছু তটে দে-ছেন-জোঙ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রাম চীন ও মঙ্গোলিয়ার সহিত তিব্বতের ব্যাপারিক মার্গে স্থিত।

এখান হইতে গং-দন্ মঠ এক দিনের পথ। প্রসিদ্ধ সংস্কারক চোং-খ-পা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মঠকে নিজ পীঠস্থান করেন এবং এখানেই ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। তিব্বতের সংস্কারপন্থী পীতটুপিধারী সম্প্রদায় (টশী লামা ও দলাই লামা এই সম্প্রদায়ভুক্ত) এই মঠের নামে গং-দন্-পা বলিয়া খ্যাত। গং-দন্ মঠ দর্শন আমাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে ছিল, সুতরাং ১৩ই এপ্রিল ধর্ম্মকীর্ত্তি পদব্রজে এবং আমি ঘোড়ায় চড়িয়া সেদিকে রওয়ানা হইলাম। আমার সঙ্গের পুস্তকাদি বস্তাবন্দী করিয়া সীলমোহর লাগাইয়া রাখিয়া গেলাম। গং-দন্ মঠ পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত, কাছে ঝর্ণা বা নদী নাই, সুতরাং জলের কষ্ট খুবই, পথেও যথেষ্ট চড়াই। চারিদিকে নগ্ন পাহাড়ের সারি।

মঠে পৌঁছিয়া প্রথমেই যে মন্দিরের ভিতর এক স্তূপে চোং-খপার দেহাবশেষ রক্ষিত আছে তাহা দর্শন করিতে চলিলাম। স্তূপের উপর মঙ্গোল-সর্দ্দার প্রদত্ত শামিয়ানা বিস্তারিত। সঙ্গী বলিলেন, এখানে জে-রেন্-পোছের শির আছে। পরে যে কক্ষে মহান্ সংস্কারক থাকিতেন সেখানে তাঁহার কাষ্ঠাসন ও যে-সিন্দুকে তাঁহার

স্বহস্তলিখিত গ্রন্থরাজি আছে তাহাও দেখিলাম। এ মন্দিরেও স্বর্ণ-রৌপ্যের ছড়াছড়ি। পরে নীচে ১০৮ স্তম্ভে সজ্জিত এক বিরাট উপসোথাগার দেখিলাম, সেখানে চোং-খ-পার সিংহাসন রহিয়াছে! অন্য আর এক স্থলে দেখিলাম এক সিংহাসনের উপর বর্ত্তমান দলাই লামার পুরুষ-প্রমাণ মূর্ত্তি আসীন। আজকাল এই মঠে তিন হাজার ভিক্ষু থাকে। যে মঙ্গোল ভিক্ষু আমাদের স্থান দিয়াছেন, শুনিলাম, তিনি গু-শি খাঁর বংশজ। চঙ্গেজ খানের বংশোদ্ভব বলিয়া তাঁহার সমাদরও অধিক।

১৪ই এপ্রিল গং-দন হইতে দে-ছেন-জোঙে ফিরিলাম। পথে ধর্ম্মকীর্ত্তির পরিচিত এক মঙ্গোল ও তাহার সঙ্গিনী এক খম-দেশবাসিনীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমরা স্থির করিলাম এখান হইতে লাসা কা-যোগে (চামড়ার নৌকা) যাইব। অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিব বলিয়া রাত্রিটা নৌকার মাঝির কুটিরেই কাটাইলাম। এদেশে যত কুটির দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা জীর্ণ ও দারিদ্র্যপূর্ণ; কিন্তু ইহাতেও তিন-চারিখানি চিত্রপট ও দুই-তিনটি সুন্দর মূর্ত্তি আছে এবং মূর্ত্তিগুলি আমাদের দেশের অনেক বড় মন্দিরের জয়পুরী মর্ম্মরের তৈরী বাজে মূর্ত্তি অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর। যথেষ্ট যাত্রী পায় নাই বলিয়া সকালে মাঝি নৌকা ছাড়িতে চাহিল না। শেষে ভাড়া দ্বিগুণের উপর কবুল করায় অনেক বেলায় নৌকা ছাড়িল। নদী-পথে দুই পাশের গ্রাম ও পাহাড়ের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। দুই ঘণ্টা চলিবার পর আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চরণধূলিপূত হের্-বা পাহাড় দেখা দিল। দ্বিপ্রহরে লাসা পৌঁছিলাম।

৫ই এপ্রিল লাসা ছাড়িয়াছিলাম, তখনও শীত আছে। ১৫ই এপ্রিল ফিরিয়া দেখিলাম গরম পড়িয়াছে। আরও দেখিলাম টাকার দাম চড়িয়াছে। আমার পক্ষে ইহা সুসংবাদ, কেননা টাকার বদলে তিব্বতীয় টঙ্কা অধিক পাওয়ায় পুস্তকাদি খরিদ করা সহজ হইল। এখন প্রত্যাবর্ত্তনের মুখ, মালপত্র বাঁধিতে লাগিলাম। দামী চিত্রপট ও পুস্তকাদি মোম-জামায় মুড়িয়া কাঠের বাক্সে প্যাক করাইলাম। বাক্স প্রথমে চটে মুড়িয়া তাহার উপর য়াকের চামড়া ঢাকিয়া সেলাই করাইলাম। ইহার ফলে আমার কোনও জিনিষ নষ্ট হয় নাই '

প্রত্যাবর্ত্তন পর্ব্ব

২৩শে এপ্রিল প্রাতে লাসা হইতে বিদায় লইলাম। সওয়া-নয় মাস একত্রে থাকার ফলে ছুঁ-শিঙ-শা কুঠির স্বামী জ্ঞানমান সাহু, তাঁহার পত্নী, তাঁহার সহকারী গুভাজু ধীরেন্দ্র বজ্র প্রভৃতি সকলের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে গৃহ যেন নিজের বলিয়া মনে হইত। তাঁহারা সকলে বিদায় দিতে সহরের বাহির পর্য্যন্ত আসিলেন। বিদায়ের কথা আর কি বলিব!

পথের জন্য দুইটি অশ্বতর চৌদ্দ দোর্জে মূল্যে কিনিয়াছিলাম। বন্ধুগণ বলিয়াছিলেন ইহাতে পথ-চলার সুবিধা হইবে, উপরন্তু কালিম্পং বাজারে দাম যা পাওয়া যাইবে, তাহাতে মায় পথের খরচ সবই আদায় হইয়া যাইবে। বন্ধুদের কাছে বিদায় লইবার পর পোতলা প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া আমাদের সওয়ারী চলিল। এই পোতলা একদিন স্বপ্নের মত মনে হইত, কয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত দর্শনে ইহার মাহাত্ম্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। খাওয়া পরা শোওয়ার ইত্যাদির সরঞ্জাম বাদে আমরা প্রত্যেকে এক একটি পিস্তল লইয়াছিলাম। ধর্ম্মকীর্ত্তি পিস্তল ঝুলাইয়া কার্ত্তুজের মালার উপবীত পরিয়া চলিতেন, আমিও প্রায় তাহাই। এদেশে ডাকাতের উৎপাত খুবই বেশী এবং আমরা দুইজন মাত্র লোক, সেই জন্যই এত সজ্জা। আমাদের ইচ্ছা ছিল সোঁ-থঙ গিয়া যেখানে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেখানকার সেই তারা-মন্দির দর্শন করিব। দ্বিপ্রহরে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া যে-গৃহে লাসা যাইবার পথে ঠাঁই পাইয়াছিলাম সেখানেই উঠিলাম। গৃহস্বামী আমাকে চিনিতে পারিল না, যদিও তাহার বেশ মনে ছিল যে, এই পথে কিছুদিন পূর্ব্বে এক লদাখী ভিখারীর বেশে লাসা গিয়াছিল।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তারা-মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম তাহা নিকটেই, সুতরাং অশ্বতরে চড়িয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মকীর্ত্তি অশ্বতরগুলির দানাপানির ব্যবস্থায় রহিলেন, পথপ্রদর্শিকারূপে একটি বালিকাকে সঙ্গে লইয়া আমি মন্দির দর্শনে চলিলাম। গ্রামের পরই একটি টিলা, তাহার উপর হইতে অদূরে মন্দির দেখা দিল। বস্তুতঃ মন্দির প্রায় দুই মাইল দূরে, কিন্তু তিব্বতের স্বচ্ছ নির্ম্মল বায়ুতে এইরূপ নৈকট্য-ভ্রম হয়। এই মন্দিরও অন্য অনেক মহত্ত্বপূর্ণ স্থানের ন্যায় উপেক্ষিত ও জীর্ণ। ভিতরে তারা-দেবালয়, বাহিরে বিরাট রক্তচন্দন-কাষ্ঠের স্তম্ভাবলী, তাহাদের শুষ্ক কর্কশ রূপ আট-নয় শত বৎসরের প্রাচীনত্বের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। এখানকার সাধুমণ্ডলীর সকলেই বালক। পূজারী

বালক ও তাহার সহায়কবর্গও বালক। আমি দুই-চারি আনা পয়সা বিতরণ করিতে তাহারা মহা উৎসাহে আমাকে সকল দ্রষ্টব্য দেখাইতে লাগিল। মন্দিরের ভিতরে



তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের খেয়া-ঘাট

দীপঙ্করের ইষ্ট ২১টি তারাদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি রহিয়াছে। সেই মন্দিরেই বাম দিকে দলাই লামার সীলমোহরযুক্ত বদ্ধ লৌহপিঞ্জরে দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, দণ্ড ও তাম্র-

জলাধার (লোটা) রক্ষিত, সেই সঙ্গে কিছু রৌপ্যমুদ্রা ও শস্যও রাখা হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে তিনটি পিত্তলের স্তূপে যথাক্রমে দীপঙ্করের পাত্র, সিদ্ধ কারোপার হৃদয় ও দীপঙ্করের প্রিয় শিষ্য ডোম-তোন-পার বস্ত্র রক্ষিত। বামভাগের অমিতায়ুয়ের মন্দিরের বাহিরের দুইটি জীর্ণ পুরাতন স্তূপ দেখিতে গিয়া বোধ হইল সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সুতরাং গৃহের দিকে ফিরিয়া আসিলাম।

২৫শে এপ্রিল রওয়ানা হইলাম। অশ্বতর নিজের এবং সেগুলি বলিষ্ঠ, সুতরাং চার-পাঁচ দিনে গ্যাঙ্গা পৌঁছানো সম্ভব মনে হইল। এ-অঞ্চলে লাল উলের গুচ্ছে শোভিত চমরীর (য়াক) দ্বারা চাষ চলিতেছিল। দ্বিপ্রহরে ছু-শরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ক্ষেতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখানে গাছের পাতাও খুব বড় হইয়াছে দেখিলাম। এখন আমার আর ভিখারী-বেশ নাই, পরনে পোস্তীনের চোগা, মাথায় ফেল্ট হ্যাট। ছু-শরের শ্রেষ্ঠ বাড়ীর সর্ব্বোত্তম কক্ষে উঠিলাম, ঘরের অধিকারী মহা যত্নে সেবা করিতে লাগিল। গৃহকর্ত্রী এক অর্দ্ধ-চীনার স্ত্রী। বহুদিন পতির কোনও সংবাদ সে পায় নাই, সুতরাং যখন শুনিল আমরা কালিম্পং যাইব তখন অশ্রুসিক্ত মুখে আমাদের বলিল যে সে শুনিয়াছে তাহার স্বামী সেখানে আছে এবং আমরা সেখানে কোনও খবর পাইলে যেন তাহাকে জানাই।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্রের খেয়াঘাটে পৌঁছিলাম। এখানে স্রোতের বেগও অধিক নহে, নদীর বিস্তারও কম। নৌকায় উঠিতে উঠিতে আরও তিনটি সওয়ার আসিয়া জুটিল এবং পার হইয়া আমরা পাঁচজনে একত্রে চলিলাম। সঙ্গীদের তাড়াতাড়ি থাকায় দ্রুত চলিতে চলিতে থন্-বো-লা চড়াই পার হইলে পরে দেখিলাম একদিকে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণ ধারা দেখা যাইতেছে এবং অন্যদিকে ন-গ-চের বিশাল ঝিল। উৎরাইয়ের সময় অশ্বতর ছাড়িয়া পদব্রজে চলিয়া হন্-লুঙ্ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গীরা সওদাগর, এ-পথে তাহাদের সবই পরিচিত, সুতরাং রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা সহজেই হইল। পরদিন ঝিলের পাশ দিয়া পথ চলিতে তীব্র শীত-বাতাসে বড়ই কষ্ট হইল। ১৩ হাজার ফুট উচ্চ এই ঝিলের কিনারায় ও জলনালীতে বরফের চাপ বাঁধিয়া আছে। পথ চলা দুরূহ দেখিয়া আমরা পথের ধারে এক গ্রামে আশ্রয় লইয়া আহারাদির পর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। কিন্তু হাওয়া সমান তীব্র। আজ কোন উঁচু "লা" চড়াই নাই জানায় আমি মুখে হাতে ভেসেলিনের প্রলেপ দিই নাই, ফলে শরীরের সকল উন্মুক্ত স্থানের চামড়া শীতে জমিয়া কালো হইয়া গেল। ধর্ম্মকীর্ত্তির সেরূপ কিছু হয় নাই। যাহা হউক, কোন গতিকে বেলা সাড়ে তিনটায় আমরা ন-গা-চে গ্রামে পৌঁছিলাম। এখানকার ভেড়ার পশম অতি মোলায়েম হয় শুনিয়া আমি একটি কালো রঙের চুকটু কিনিলাম। শীতের আধিক্যে এখানে চাষ আরম্ভই হয় নাই।

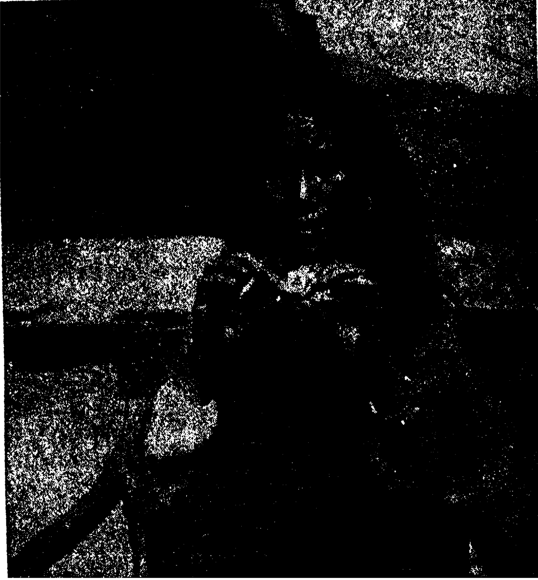
২৮শে এপ্রিল অতি প্রত্যূষের অন্ধকারে আমরা যাত্রারম্ভ করিলাম। চারি দিক তুষারাচ্ছন্ন, আমার সঙ্গীগণও শীতে আড়ষ্ট। দ্রুত চলিয়া সেদিন রাত্রে লোঙ-মর গ্রামের প্রধান ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লইলাম। পরদিনও প্রাতে শীতের মধ্যে রওয়ানা হইলাম। তখন ২৯শে এপ্রিল, কিন্তু এ-অঞ্চলের প্রখর-শীতে গাছের পাতা জন্মায় নাই এবং সকালে সব জল-প্রণালী জমিয়া বরফ হইয়া আছে। লাসা হইতে যাত্রা করার সাড়ে পাঁচ দিন পরে সেদিন দ্বিপ্রহরে গ্যাঞ্চীতে পৌঁছিলাম। এখানে ছু-শিঙ-শা কুঠির ব্রাঞ্চ দোকান গ্যা-লিঙ-ছোম্পাতে উঠিলাম এবং দুই রাত্রি সেখানেই বিশ্রাম করা গেল।

গ্যাঞ্চীতে ইংরেজ-সরকারের ট্রেড-এজেন্সীর গৃহকে এখানে কেল্লা বলে। বিরাট পুরু দেওয়াল, শতাধিক সৈন্য, উপরন্তু ইংরেজ-দূতাবাসের জমিতে চাষ করার জন্য বহু গুর্খা আছে যাহারা পূর্ব্বে সৈনিক ছিল। তিব্বতের সহিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে এদেশে ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল এজেন্ট থাকিতে পারে না। সেই জন্য এই ট্রেড-এজেন্ট তাঁহার সহকারী এজেন্ট এবং একজন ইংরেজ ডাক্তার এখানে আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশে কি ভারতীয়, কি ব্রিটিশ কাহারও বাণিজ্যের অধিকার নাই। একজন মাড়বারী সজ্জন—সৈন্যদের রসদাদির ঠিকা লওয়ায় এখানে থাকেন, তিনিই একমাত্র ভারতীয় "ট্রেড"কারী। এখানকার খরচ কি ভারতবর্ষ দেয়? ব্রিটিশ ডাক ও তার-ঘর কেল্লার ভিতর। ডাক একদিন অন্তর আসিয়া থাকে।

১লা মে আমরা দুইজন টশী-লুন্-পো রওনা হইলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথ কুয়াশায় ঢাকা, এবং তুষারপাত হইতেছিল। রাস্তা তো বিশেষ কিছু ছিল না, সুতরাং ক্ষেতের মধ্যে দিয়া পথ খুঁজিয়া চলিতেছিলাম। দিগ্‌ভ্রম হইবার বেশী ভয় ছিল না, কেন-না, দক্ষিণে নদী ও বামে পর্ব্বতমালা পথরোধ করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে এক গ্রামে পৌঁছিলাম। এখন আমি কুশোক (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি), ভিখারী নহি; সুতরাং আশ্রয় খুঁজিতে হয় না। একটি বড় বাড়ীতে চা, ডিমসিদ্ধ ইত্যাদি খাইয়া, সেখানে ভৃত্যবর্গকে কিছু ছঙ-রিঙ (মদ্যপানের পয়সা=বখশিস) দিয়া পুনর্ব্বার চলিলাম। বেলা তিনটায় বরফ পড়া বাড়িল, বাতাসের বেগও তীব্র হইল, আমরা তো-সা গ্রামে আশ্রয় লইলাম। যাইবার সময় এই এক দিনের পথ তিন দিনে গিয়াছিলাম।

২রা মে প্রত্যূষে চলিয়া, রৌদ্র-প্রকাশের দুই ঘণ্টার মধ্যে পাতলা কুয়াশার চাদরে ঘেরা টশী-লুন্-পো মহা-বিহার দেখিতে পাইলাম। আগের বারের যাত্রায় পথের দুই পাশে শ্যামল শস্যের ক্ষেত দেখিয়াছিলাম। এবার দেখিলাম ক্ষেতে লাঙ্গল দিবার উদ্যোগ হইতেছে মাত্র। বেলা একটায় শীগর্চী পৌঁছিলাম। আমার পূর্ব্ব-পরিচিত ঢাকবা সাহু দোকান বন্ধ করিয়া নেপাল চলিয়া গিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে

মণিরত্ন সাহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই তিনি এক গৃহে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইলে পরে, যাহার মনিবের নিকট হইতে আমি আদেশ-পত্র আনিয়াছি সেই খম্-পা সওদাগরের সন্ধানে চলিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, আমার আবশ্যকমত টাকা-পয়সা এই কুঠি হইতে লইতে পারি। সওদাগরকে তো খুঁজিয়া পাইলাম, কিন্তু সে পয়সাকড়ি দিতে ইতস্ততঃ করিল। সেদিন আমি বিশেষ পীড়াপীড়ি করি নাই, যদিও ব্যাপার দেখিয়া আমি চিন্তিত হইলাম, কেন-না, এখানে টাকা না পাইলে গ্যাঞ্চী ফিরিয়া টাকার জন্য টেলিগ্রাম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনেও তাহার ঐরূপই ব্যবস্থা দেখিয়া আমি মণিরত্ন সাহুকে বলিলাম যে, আমার পুস্তক-ক্রয়, তঞ্জুর ছাপানো সবই বন্ধ হইয়া আছে, স্নুতরাং আজই উহার নিকট হইতে "হাঁ" বা "না" জবাব আনিতে হইবে। তিনি প্রশ্ন করায় সে বলিল, "পত্র ও সীলমোহর আমার মনিবের, কিন্তু অত টাকা দিতে সাহস হয় না। আচ্ছা, আমি টাকা দিব।" আমার মন প্রসন্ন হইল, কাজের ব্যবস্থা আরম্ভ হইল। কাগজ কালি ইত্যাদি ক্রয় করিয়া ছাপার আয়োজন করিলাম।


তিব্বতীয় রমণী

স্নর-থঙ বিহারে ছাপার খরচ ইত্যাদি স্থির করিয়া এক সপ্তাহ সময় দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে ছাপা শেষ করিতে হইবে। মণিরত্ন সাহুর ভোটীয়া স্ত্রীর ভাই ঐ বিহারে ভিক্ষু, স্নুতরাং আশা ছিল যে, কাজ সময়মত হইবে। পাঁচদিন পরে খবর লইয়া জানিলাম কাজ আরম্ভই হয় নাই। কাজেই আমি সেখানে গিয়া চাপিয়া বসিলাম। কাজ আরম্ভ হইল। এই বিহার আজকাল টশী-লুন্-পো বিহারের অধীন, কিন্তু ইহা ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এবং টশী-লুন্-পো বিহার ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সংস্কারের যুগে এই বিহারের ভিক্ষুগণ সংস্কারবাদ মানিয়া লওয়ায়

এইরূপ অধীনতা আসে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পিত্তল ও চন্দনকাষ্ঠের মূর্ত্তি এখানে রহিয়াছে। ভারতীয় মূর্ত্তির আসনের নীচে মোটা পিত্তলের আংটা যুক্ত থাকে, তাহার ভিতরে বাঁশ গলাইয়া মূর্ত্তি বহন করিয়া দূরদেশে আনীত হইয়াছিল। থুব-বঙ ও খম্-স্থম্ মন্দিরে অনেক পুরাতন মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের বাহিরে প্রস্তরের পাটায় উৎকীর্ণ ৮৪ সিদ্ধের মূর্ত্তি আছে। পঞ্চম দলাই লামার অমাত্য মি-বঙ এই বিহারের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এখানকার গ্রন্থসংগ্রহও বিরাট। সম্প্রতি টশী লামা প্রবাসে দীর্ঘকাল থাকায় এ অঞ্চলের সকল ব্যাপারেই অনাচার পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে।

আমরা লাসা হইতে এখানে পৌছিবার পরেও যুদ্ধভয় দূরীভূত হওয়ার খবর এখানে ঠিকমত প্রচারিত হয় নাই। এদেশের খবরাখবর এইরূপ গুজব-গল্পের মধ্যেই চলে, এমন কি দেশের শাসন, কর-আদায় প্রভৃতির ব্যবস্থাও এইরূপ ঢিলা। এখানের এক লামা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ইত্যাদির বিষয় শুনিয়া আমাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গন্-তী মহারাজা লোবন রিম্পোছের (ভোট দেশে সর্ব্বত্র পূজিত এক ঘোর তান্ত্রিক লামার) অবতার।" তাহাতে আমি বলিলাম, "লোবোন রিম্পোছে মদ্যের সমুদ্র পান করিতেন এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও স্বচ্ছন্দবাদী ছিলেন, গন্-তী মহারাজা ঐ বিষয়ে তো সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পোষণ করেন।" লামা মহাশয় এই কথায় একটু থামিয়া পরে বলিলেন, "জন্মান্তরে লোবোন রিম্পোছের মতান্তর হইয়াছে।" ইহার আর উত্তর কি? এখানে সিপাহীরা যুদ্ধের নামে যথেচ্ছাচার লাসার সিপাহী অপেক্ষা বহুগুণ বেশী করিয়াছে শুনিলাম। আমার নিজের কাজ কোনমতেই অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তিকে রাখিয়া ১২ই মে আমি শীগর্চী ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে শুনিলাম, সরকারী কর বাকী থাকায় টশী-ল্হুন্-পোর এক খম-জন (বিদ্যালয়) জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছে। অধিকারিগণ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে টাকা তুলিতেছেন। আমি সুবিধা দরে ২১টি অতি মূল্যবান চিত্রপট এই সুযোগে ক্রয় করিলাম। টাকা থাকিলে আরও ক্রয় করিতে পারিতাম। ১৬ই মে এক স্থানীয় লামা একটি তালপত্রের পুঁথি বিক্রয়ার্থে পাঠাইলেন। পুঁথির "কুটিল" অক্ষর দৃষ্টে বুঝিলাম, ইহা খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের মহামূল্য গ্রন্থ। লামা ইহা আমাকে দান করিলেন। আমি পূর্ব্বেই লদাখে সন্ধান পাইয়াছিলাম যে টশী-ল্হুন্ পোর নিকটস্থ এক বিহারে বহু তালপত্রের পুঁথি আছে। এবার তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও পাইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিক অনুসন্ধান এ-যাত্রায় সম্ভব হইল না। ১৫ই মে আমার পুস্তক (তঞ্জুর) ছাপিয়া আসিল। সেগুলি ও অন্যান্য পুস্তকাদি উত্তমরূপে বাঁধিয়া প্যাক করাইয়া গাধার পিঠে চাপাইয়া

ফ-রী জোঙ রওয়ানা করাইয়া দিলাম। এখান হইতে ফ-রী যাইবার সোজা পথ আছে।

২১শে মে আমি ও ধর্ম্মকীর্ত্তি যাত্রা স্বরু করিলাম। আমাদের পথের দুই-আড়াই মাইল অন্তরে প্রাচীন ভারতের নকলে নির্ম্মিত শা-লু বিহার আছে। আমরা সেখানে যাইয়া বহু প্রাচীন পুঁথি এবং অসংখ্য চন্দনকাষ্ঠের এবং পিত্তলের মূর্ত্তি দেখিলাম, সেগুলি পূর্ব্বকালে ভারত হইতে গিয়াছে। একটি মূর্ত্তি ব্রহ্মদেশের ধরণে চীবর-পরিহিত। বিহার-দর্শনের পর যাত্রা করিয়া সেই রাত্রে এক গ্রামে থাকিয়া ২২ মে সকাল ১১টায় গ্যাঞ্চী পৌঁছিলাম। এক সপ্তাহের স্থলে বাইশ দিন শীগর্চীতে থাকায় ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনে দেরি হইল। আমার কোনও খবর না পাওয়ায় সিংহল হইতে ভদন্ত আনন্দ চিঠিপত্রে খোঁজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবার সিংহলে ফিরিয়া আমাকে ভিক্ষুব্রত লইতে হইবে। এইরূপ ভিক্ষু-দীক্ষা দেওয়া সঙ্ঘের নিয়মানুসারে দুই-একবার মাত্র হয়। সে সময়েরও দেরি নাই, সুতরাং আমাকে দ্রুত ফিরিতে হইবে। একটি অশ্বতর পীড়িত হওয়ায় আরও একদিন দেরি হইল। ২৩শে মে দ্বিপ্রহরে প্রত্যাবর্ত্তনের যাত্রা আরম্ভ হইল।

গ্যাঞ্চী হইতে ভারতের পথ ইংরেজ-সরকারের দেখাশুনার ফলে ভাল মেরামত থাকে। পথে পুল ও ডাকবাংলা আদি আছে, টেলিফোনের ব্যবস্থাও আছে। পথের গ্রামগুলি অত্যন্ত দরিদ্র। ২৪শে মে নদীর পাশে পাশে চড়াইয়ের পথে চলিলাম, পাহাড় বৃক্ষগুল্মশূন্য। পাহাড়ের স্তর দেখিতে আশ্চর্য্যপ্রায় মনে হয়। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে মূল্যবান খনিজ আছে। এইসব দেখিতে দেখিতে ও ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত বাক্যালাপ ও ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে ৩০।৩১ মাইল পথ চলিয়া সন্-দা গ্রামে পৌঁছিলাম। এ-গ্রামটি অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। ইহার পর পথে গ্রাম বসতি অতি অল্পই দেখিলাম। অধিকাংশ গ্রামই পতনোন্মুখ, ক্ষেতগুলিও পরিত্যক্ত। যত উপরে যাইতেছিলাম শীত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। পথে একটি প্রাকৃতিক সরোবর দেখা দিল। গ্যাঞ্চী হইতে ৬৪ মাইল এইরূপে চলিবার পর হিমালয়ের হিমাচ্ছাদিত ধবল শিখর দর্শনে বুঝিলাম ভারতমাতার নিকটেই আসিয়াছি। সম্মুখের এক বিশাল সরোবর নয়ন তৃপ্ত করিতেছিল, যদিও বৃক্ষপত্রে শ্যামলিমার কোনও চিহ্ন ছিল না। ৭০ মাইল অঙ্কিত প্রস্তরের কাছে দোজিঙ গ্রাম এবং তাহার নিকট শুষ্ক জলাভূমি আছে। দোজিঙ গ্রামে আশ্রয় লওয়া গেল।

গ্রামে যে-গৃহে ছিলাম সেখানে দুই ভগ্নী এক পতির সহিত বাস করে। এদেশে বহুভর্তৃকাই অধিক, কিন্তু কয়েক স্থলে দেখিলাম কয়েক ভগ্নীর এক পতি। শুনিলাম, পুরুষ বা স্ত্রী যে নিজে পিত্রালয় ছাড়িয়া অন্যের ঘরে বাস করিতে রাজী হয়, তাহার

পারিতোষিক হিসাবে এইরূপ বহু পতি বা পত্নী জোটে। এইরূপ ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক অর্থ এই যে এদেশের ন্যায় অনুর্ব্বর স্থানে সম্পত্তি-বিভাগ রোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য, সুতরাং পরিবার যাহাতে পৃথক না হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। চারি ভ্রাতার এক স্ত্রী বা দুই ভগ্নীর এক পতি হওয়ায় পরিবার একই থাকিয়া যায়, সম্পত্তি বিভাগের প্রয়োজন হয় না।

এদিকে চাষ অপেক্ষা পশুপালনের চেষ্টাই অধিক। এখানে ছোট ছোট ছাগলও দেখা গেল কিন্তু লোকে তাহা বেশী রাখে না, কেন-না, একে তো পশম হয় না, তার উপর ছাগলের মাংসে চর্ব্বি কম।

২৬শে মে সকালে রওয়ানা হইলাম। কিছুদূর চলিবার পর মহাসরোবরের শেষ দেখা গেল। তাহার পর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে তুষারাচ্ছাদিত শৈলমালা, নিকটের পর্ব্বত নগ্ন ও শুষ্ক। পথে দেখিলাম তারের থামের উপরে চীনামাটির ইন্সুলেটর প্রায় সবই ঢিল ছুড়িয়া ভাঙিয়া দিয়াছে। এ-পথে প্রত্যেক ঘরই লাসা-কালিম্পংযাত্রী ব্যাপারীদিগের চটি বা সরাই। সম্মুখে এক বিশাল প্রান্তর, পথ তাহার মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। অল্পস্বল্প ঘাসযুক্ত ময়দানে ভেড়া চরিতেছে দেখিলাম। বামের অত্যুচ্চ ধবল শিখর দেখিয়া মনে হইল যদি তাহার উপর উঠিতে পারা যাইত তবে ভারত ও তিব্বতের দৃশ্য এক সঙ্গে দেখিতে পাইতাম। আরও আগে ডাকবাহীদিগের ঘর ছাড়াইয়া একটি ছোট নালা পার হইলাম, তাহার পর একটি শুষ্ক খালের পাশ দিয়া দক্ষিণ ভাগে সমকোণে ঘুরিয়া একঘণ্টা চলিবার পর উৎরাই আরম্ভ হইল।



তিব্বতী রমণী সুতা কাটিতেছে

এখন পাহাড়ের রং বদল হইল, ঘাসও অধিক হওয়ায় অনেক ভেড়ার পাল ও দুই-দশটি চমরীও দেখা গেল, কিন্তু বৃক্ষের চিহ্ন এখনও নাই। এই জনশূন্য দেশ ছাড়িয়া

ফ-রী প্রদেশে (ফগ্-রী=বরাহ প্রদেশ) প্রবেশ করিয়া বেলা সাড়ে তিন টায় আমরা ফ-রী জোঙ পৌঁছিলাম।

এখানেও ছু-শিঙ-শার একটি শাখা আছে এবং সম্প্রতি গুভাজু ধীরেন বজ্র এখানে রহিয়াছেন, সুতরাং মহাসমাদরে অভ্যর্থনা হইল। এখানকার প্রায় সকল ঘরের মেজেই বাহিরের জমি হইতে নীচু এবং নিকটেই জঙ্গল থাকায় গৃহনির্ম্মাণে কাষ্ঠই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নিকটস্থ বরাহাকৃতি পাহাড়ের জন্য এখানকার নাম ফ-রী। পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর দুর্গও ছিল, কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ অভিযানের ফলে তাহার ধ্বংস হয়। এখান হইতে ভুটান বাম দিকের পাহাডের পারে অর্দ্ধদিনের পথ, তাই প্রত্যহই ভুটানীর দল শাকশব্জী আনাজ ফল ইত্যাদি লইয়া একটি অত্যন্ত নীচু-ছাদের অন্ধকার বাড়ীতে হাট বসাইয়া যায়। খবর পাইলাম, আমার মালপত্রের গাঁট প্রায় সবই আসিয়াছে। সতরটি অশ্বতর ভাড়া লইয়া কালিম্পং যাত্রার আয়োজন করিলাম। আমার অশ্বতরগুলির জন্য ২৭০৲ টাকা দর পাইয়াছিলাম, কিন্তু কালিম্পঙে আরও অধিক পাইবার আশায় বিক্রয় না-করায় শেষে কালিম্পং পৌঁছিয়া ২৪০৲ টাকায় বেচিতে হয়। নূতন ব্যবসায়ের এইরূপই ফল হয়! ফ-রী উপত্যকায় বর্ষা যথেষ্ট হয়, ঘাসও প্রচুর, কিন্তু শীতের প্রকোপে কৃষি সুবিধার হয় না।

২৯শে মে আমি যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ছু-শিঙ-শার ফ-রী শাখার অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং স্বত্বাধিকারীর ভাগিনেয় কাঞ্ছা আমার সঙ্গে চলিল। ইহার বয়স মাত্র আঠার-উনিশ ছিল, বুদ্ধি বিবেচনাও বিশেষ ছিল না। এদিকে তিব্বত, ভুটান ও ভারতের যত ধূর্ত্তের মিলনস্থল ফ-রীতে তাহাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করা হইয়াছিল। নেপালী কারবারের ধরণ অনুযায়ী হিসাব-কিতাবের কোন কড়াক্কড়ি ছিল না, যখন হিসাব লওয়া হইল তখন দেখা গেল বহু সহস্র টাকা লোকসান। সকলে বলিল, জুয়া, মদ্য ও স্ত্রীলোকে সব গিয়াছে। এদেশের মদ্যের বিশেষ দাম নাই, স্ত্রীলোকও তথৈবচ; উপরন্তু কাঞ্ছার ভোটীয়ানী স্ত্রী বলিল, সে বিশেষ কিছুই লয় নাই, কেন-না সে বয়সে বড় এবং এই ছোকরার উপর তাহার অত্যন্ত টান ছিল। তখন সকলে বলিল, টাকা জুয়াতেই গিয়াছে। আমি বলিলাম, "দোষ তোমাদের। এইরূপ অপরিণত-বয়স্কের হাতে এত টাকা ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রলোভন ও কুপ্রবৃত্তির পথ তোমরাই পরিষ্কার করিয়াছ। সে যদি টাকা উড়াইয়া থাকে, তবে মামার টাকা ভাগিনেয় উড়াইয়াছে, সুতরাং কাহার কি বলিবার আছে?"

যাত্রার পথ প্রথম খানিকটা সমতল, তার পর উৎরাই। এবার ঝর্ণা ও নির্ঝরের ধারার সংখ্যা বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল তৃণময় উপত্যকা। তাহার পর উৎরাই দ্রুত নামিতে লাগিল এবং ক্রমে ঘণ্টা দুই-তিন পরে আমরা বনস্পতির

রাজ্যে আসিলাম। মনে হইল আমরা যেন অন্য এক লোকে আসিয়াছি। পূর্ণ বৎসরাধিক পরে শ্যাম বনশ্রেণীর শোভা দেখিয়া এবং কাননবিহারী নানা বর্ণের পাখীর কলকূজন শুনিয়া চিত্ত পুলকিত হইল। দেবদারুর শ্রেণীতে প্রথমে ছোট ছোট গাছ পরে বিরাট বনস্পতি দেখা দিতে লাগিল। এখানের লোকজনের চেহারাও সুন্দর এবং তাহাদের শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার। বনের হরিৎ শোভা, বিহঙ্গের কাকলী ও পুষ্পের সুগন্ধে আনন্দিত মন লইয়া সন্ধ্যার সময়ে আমরা কলিঙ-খা গ্রামে পৌঁছিলাম। এই গ্রামে শতাধিক ঘর, এবং গৃহগুলির ছাদ, দেওয়াল এবং মেজে—সর্ব্বত্রই দেবদারু কাষ্ঠ প্রযোজিত হইয়াছে। কাষ্ঠের অভাব নাই, সুতরাং দিবারাত্র আগুন জ্বলিতেছে। অধিকাংশ ঘরই দ্বিতল। নিম্নতলে পশু-রক্ষা এবং দ্বিতলে লোকজনের অবস্থান, দেবতা-স্থান ও ভাণ্ডার রাখাই নিয়ম। তিব্বতের তুলনায় এখানের লোক বহু গুণে পরিষ্কার। এখানের নারীরা গঢ়বাল ও কিনৌরের স্ত্রীলোকদিগের মত শাড়ী পরে। তাহারা সুন্দরী, রক্তিমগৌরবর্ণা এবং সুগঠন। হিমালয়ের তিন অঞ্চলের নিবাসিগণ দেবার বরে সৌন্দর্য্য পাইয়াছে। আমি সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, কিন্তু আমার মনে হয় ঐ তিন অঞ্চলে বাসভূমি ও অধিবাসী উভয়কেই প্রকৃতিদেবী মুক্তহস্তে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আমার মতে কনৌরের* স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাহার পর এই ডোমো প্রদেশের নারী এবং যল্মোবাসিনা। বর্ণ-গৌরবে যল্মোবাসিনী শ্রেষ্ঠা, কিন্তু কিন্নরীদের মুখশ্রী অতি মনোরম।

এই ডোমো উপত্যকাও অতি মনোহর। যদিও অশ্বতরের সাহায্যে জিনিষ সরবরাহ করা এখানকার প্রধান পেশা, এখানে কৃষিকার্য্য খুবই প্রচলিত। এই অঞ্চল ভারত ও তিব্বতের মিলনকেন্দ্র। লোকের মুখাবয়বে আর্য্য ও মঙ্গোল-রক্তের মিশ্রণ সুস্পষ্ট দেখা যায়। ভারতের কাক (তিব্বতের কাক বৃহৎ চিলের মত পাখী), কোয়েল ইত্যাদি এখানে দেখা দিল।

নদীর পাশ দিয়া পথ চলিয়াছে। এক ঘণ্টা পরে স্যাসিমা পৌঁছিলাম। এখানে ইংরেজের কুঠি, তার ও ডাকঘর বাজার ও কিছু সৈন্য আছে। ১৯০৪ সালের অভিযানের পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরেজ এই প্রদেশ দখল করেন, কিন্তু চীন দেশ সেই ক্ষতিপূরণ টাকায় গণিয়া দিলে পরে ইহা তিব্বতকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। স্যাসিমার পর ছেমা গ্রামও সুন্দর, বড় বড় ঘরে ও বিশাল বনস্পতিতে পূর্ণ, তাহার পরের গ্রাম রিন্-ছেন-গঙ ও বৃহৎ গণ্ডগ্রাম। খরচের হিসাবেও তিব্বত অপেক্ষা

---

* প্রাচীন কিন্নর দেশই এখন কিনৌর বা কনৌর নামে পরিচিত।

এখানে বেশী টাকা লাগে। এ-অঞ্চলের পোষাক—নেপালী কালো টুপী, নেপালী পায়জামা ও কোট। আজ রাত্রিবাস হইল থ্যু-গঙ্ সরাইয়ে। পথে ধর্ম্মকীর্ত্তি অশ্বতরের দল লইয়া আমাদের দলের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

এই সরাইয়ে এক "দেববাহিনী" (যাহার উপর দেবতা আবিষ্ট হন) স্ত্রীলোক দেখিলাম। আমরা যে কক্ষে ছিলাম, সেখানে এক দম্পতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সরাই-অধিকারিণী বৃদ্ধা তন্মধ্যে অতি সম্ভ্রমের সহিত স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করায় বুঝিলাম ইহারা সাধারণ লোক নহে। সারাদিন ইহারা চা-পান, ভোজন ইত্যাদিতে কাটাইল, আমি জিজ্ঞাসা করায় বলিল তাহারা ফ-রী-বাসী, সম্প্রতি কালিম্পঙে ডো-মো-গে-শে লামার দর্শনে চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম স্ত্রীলোকটি সর্ব্বাঙ্গ আড়ামোড়া দিতেছে। পুরুষটি কখনও তাহার হাত ধরিয়া শোয়াইবার চেষ্টা



তিব্বতে দেববাহিনী স্ত্রীলোক

করিতেছে, কখনও তাহার মাথায় দেবমূর্ত্তি ঠেকাইতেছে, কখনও বা হাত জোড় করিয়া বলিতেছে, "আজ ক্ষমা করুন।" বুঝিলাম স্ত্রীলোকটি পেশাদার দেববাহিনী এবং সম্প্রতি দেবতা আসিবার উপক্রম হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে পুরুষটিকে ঝটিতি সরাইয়া দিয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল। আমার কৌতূহল হওয়ায় পরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে সুন্দর আসনে সেই স্ত্রীলোকটি আপাদমস্তক বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে পাঁচ-সাতটি ঘৃতদীপ জ্বলিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে পুরুষটি একটি চামড়ায়-মোড়া ভোটীয়া ডমরু তাহার সামনে ধরিলে সে ধনুকাকৃতি কাষ্ঠের দ্বারা তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিল। তাহার জিহ্বায় যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন। সে ক্রমাগত পদ্যে নানা কথা বলিতে লাগিল। প্রথম পদ্যে দেবতা নিজের পরিচয় দিলেন। তাহার পর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। প্রশ্নকর্ত্তা দুই-এক আনা পয়সা রাখিয়া হাত জোড় করিয়া নিজ সমস্যা নিবেদন করিলে তাহার উত্তর পদ্যে আসিল, অধিকাংশই ভূতপ্রেতশান্তির ব্যবস্থা, মধ্যে মধ্যে ছঙ-পানও চলিল। আমি কাঞ্ছাকে বলিলাম, "প্রশ্ন কর তোমার ছেলের অসুখ, কি করা কর্ত্তব্য?" দুই আনা পয়সা নিবেদন করিয়া "উকিল" মারফৎ প্রশ্ন হইতে উত্তর হইল, "নগরদেবতা রুষ্ট, অন্য দেবতাকে পূজায় সন্তুষ্ট করিয়া সালিশ মান, তিনি নগরদেবতাকে ক্ষান্ত করিলে ছেলেব অসুখ সারিয়া যাইবে।" কাঞ্ছার বিবাহই হয় নাই, সুতরাং পুত্রের ব্যবস্থা কি করিবে? তবে যেখানে ভক্তের অভাব নাই সেখানে দৈবজ্ঞ-দেববাহীরও অভাব হয় না।

১লা জুন সিকিমের দিকে চড়াই আরম্ভ হইল। চড়াই কঠোর এবং জে-লপ-লা গিরিসঙ্কটে বরফ পাইলাম। ইহাই ব্রিটিশ সীমান্ত, সুতরাং ১লা জুনের শেষে আমি পুনর্ব্বার ব্রিটিশরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। উৎরাই আরম্ভ হইল। এবার সিকিম-রাজ্যে আসিয়াছি, কিন্তু কৃষক প্রায় সবই প্রবাসী গোর্খা, চা-রুটির অধিকাংশ দোকানও নেপালীর। পথের বৃক্ষশ্রেণীর শোভা অবর্ণনীয়, এবং মাছির উৎপাতও সেইরূপ। কু-পুক, তু-কো-লা, ডেংলা, পদম-চেঙ হইয়া ৩রা জুন দ্বিপ্রহরে রো-লিঙ-ছু-গঙ পৌঁছিলাম। এখানে অনেক দোকান আছে যাহার মধ্যে একটিতে বহুদিন পরে ভোজপুরী ভাষায় মধুর স্বর শুনিলাম। এখন দ্রুত যাইতে হইবে, সুতরাং পরিচয় দিতে পারিলাম না।

লোহার সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া চড়াই ভাঙিতে লাগিলাম। দেখিলাম এদেশে সিকিমী অপেক্ষা আগন্তুক গোর্খাই বেশী। ৪ঠা জুন কঠিন উৎরাই পার হইয়া সিকিম ও দার্জ্জিলিঙের সীমানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে ভীম-লক্ষ্মী কন্যাবিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড দেখিলাম। আবার চড়াই আরম্ভ হইল, তাহার পরই পে-দোঙ বাজার ও খ্রীষ্টান মিশনের বিদ্যালয়। পথ চলিতে কষ্ট হইতেছিল, কারণ নাল খুলিয়া যাওয়ায় আমার অশ্বতর বেচারা খোঁড়া হইয়াছিল, সুতরাং হাঁটিয়াই চলিতেছিলাম। দ্বিপ্রহরের পর অল-গর-হা গ্রামে পৌঁছিয়া এক দোকানে ভোজপুরী ভাষায় জল চাহিলাম। দোকানদার ভাবিয়াছিল আমি নেপালী, পরিচয় পাইয়া মহা আগ্রহে চা প্রস্তুত করিয়া অন্যদের খবর দিতে গেল। আমার জেলার এক মিশ্র মহারাজ এখানে ছিলেন, তাঁহার মিশ্রাইন আমার পাশের গ্রামের মেয়ে।

সুতরাং পান-ভোজনের কিরূপ ব্যবস্থা হইল বলা বাহুল্য! রাত্রিযাপনের অনুরোধ কাটাইয়া পুনর্ব্বার রওয়ানা হইয়া সূর্য্যাস্তের সময় কালিম্পং পৌঁছিলাম। সেখানে শ্রীধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্যের কাছে উঠিলাম। মালপত্র পুনর্ব্বার প্যাক করাইয়া অধিকাংশ ছু-শিঙ-শা মারফৎ পাঠাইবার ও কিছু সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করা গেল। ধর্ম্মকীর্ত্তি এখানকার গরমেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। ৬ই জুন ট্যাক্সি-যোগে শিলিগুড়ি পৌঁছিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম জুনের গরম তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ক্ষুণ্ণমনে তাঁহাকে কালিম্পং ফেরৎ পাঠাইয়া দিলাম।

* * * * *

কলিকাতায় ছু-শিঙ-শার শাখায় গিয়া শুনিলাম, লঙ্কা হইতে আমার জন্য চারিশত টাকা আসিয়াছে। লাসায় তিন হাজার পাইয়াছিলাম। কলিকাতায় তখন সত্যাগ্রহের কল্প চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে পাটনা ও কাশী গিয়া বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিলাম। সেখান হইতে পুস্তকাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া ১৬ই জুন রওয়ানা হইয়া ২০শে জুন সিংহলে উপস্থিত হইলাম।

* * * * *

২২শে জুন আমার ও ভদন্ত আনন্দের শ্রমণের প্রব্রজ্যার দিন ছিল। গুরুজনের আদেশে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাহুল ও গোত্রানুসারে সাংকৃত্যায়ন যোগ করিলাম। ২৮শে জুন কাণ্ডিনগরে সঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার উপসম্পদা (ভিক্ষুকরণ) পূর্ণ হইল।